স্ফোটবাদ বিচার

শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

স্ফোটবাদ বিচার

বর্ণ ও শব্দের অর্থপ্রকাশ শক্তি, উৎপত্তির মূল, তত্ত্ব, সিদ্ধান্ত, বিভিন্ন প্রকাশ বিচিত্রতা, শব্দ-ব্রহ্মের প্রকাশ বৈচিত্র্য ও মহাশক্তিমত্তত্ত্ব, শ্রীনাম ভজনের মৌলিকত্ব এবং মহাপ্রকাশ-মাহাত্ম্য ও উপায় সুবৈজ্ঞানিক ও সুদার্শনিক বিধানে প্রকাশিত গ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণলীলার অপ্রাকৃতত্ব ও গূঢ় সিদ্ধান্ত বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ও দার্শনিক-গণের মহা উৎকণ্ঠা বৃদ্ধিকারী ও মীমাংসা গ্রন্থ। শুদ্ধ নাম-ভজনকারীর যে-সকল বিষয় না জানিলে বহু সাধনেও শ্রীনাম-প্রভুর কৃপালাভ হইতে পারে না, তাহার বিস্তৃত বিবরণ ও প্রণালী-বিধানে একমাত্র সহায়ক। সঙ্গীত বিষয়ক সকল তথ্য, প্রকার-ভেদ ও মাহাত্ম্য সম্বলিত গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ-পার্ষদপ্রবর ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামি ঠাকুরের কৃপাকণাধারী
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ
কর্ত্তৃক সংগৃহীত, সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

আনুকূল্য—[illegible] টাকা মাত্র

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম—পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড,
কলিকাতা—৫৩।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড,
কলিকাতা—২৬।

শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম—পোঃ শ্রীমায়াপুর, ঈশোদ্যান,
হুলোর ঘাট, নদীয়া।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার—৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬।

মহেশ লাইব্রেরী—২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ
স্কোয়ার) কলিকাতা-১২।

তাং—উত্থানৈকাদশী তিথি।
১৫ই কার্ত্তিক শুক্রবার, ১৩৭৫। ইং ১লা নভেম্বর ১৯৬৮।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম, পি, এন, মিত্র, ব্রিকফিল্ড রোড, কলিকাতা—৫৩ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমদন মোহন চৌধুরী কর্ত্তৃক "শ্রীদামোদর প্রেস" ৫২এ, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

স্ফোটবাদ বিচার

প্রস্থ বোধন

যাঁহার প্রকাশে ও কৃপায় আমাদের চিত্তদর্পণ আবিলতা নির্ম্মুক্ত হইবে, ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে, তখন আমাদের শ্রেয়ঃ-কুমুদ-জ্যোৎস্না প্রকাশিত হইবে, বিদ্যাপ্রতিভা বিকশিত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত হইয়া সেবা করিতে থাকিবে, আমাদের প্রসুপ্ত নিত্যানন্দ-সমুদ্র প্রবৃদ্ধ হইবে, প্রতিপদে পূর্ণ-সেবামৃত লাভ করিয়া আমাদের ইতর প্রসঙ্গের ঔজ্জ্বল্য-দর্শনে অনাদর হইবে এবং সর্ব্বাত্মা পরিস্নাত হইবে। আমাদের পরম-পূজ্য, পরম-বিশুদ্ধ শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যকাল যে বিস্ফুরিত মহাশক্তি "স্ফোটশক্তি" ধারণ করত নিত্য জীব-কল্যাণব্রতে মহাদাতৃশিরোমণিস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, তদীয় পদপৃষ্ঠ নীরে আমাদিগকে নিত্যকাল স্নিগ্ধ করুন। যে স্ফোটের স্ফুলিঙ্গ-শক্তির প্রকাশে ভক্তিবিরোধী কর্ম্মকাণ্ড-রত, অন্যাভিলাষ-প্রিয়, মায়াবাদী জনগণও জীবন্মুক্ত হইয়া, আনন্দরসামৃত সমুদ্রের রসাস্বাদন-লোলুপ হওয়ত নিরন্তর তৎপর হইলেই তাঁহাদের নিজ নিজ বিকৃত শ্রেয়ঃ-পথে ভ্রমণ কার্য্যে নিশ্চয়ই ঔদাসীন্য লাভ ঘটিবে। এবং তাঁহারা কোটি-চন্দ্রসুশীতল শ্রীরূপানুগগণের পদকমলের সৌন্দর্য্য দর্শন, সুরভিগ্রহণ, শ্রবণপুটে হৃৎকর্ণরসায়ণ শ্রীরূপ কথামৃতের পানাদি অপ্রাকৃত পঞ্চরসের আস্বাদন তারতম্য গ্রহণ এবং সপ্তরসের

তাৎকালিক আগমনের বিচার পরিদর্শন করিয়া ত্রিতাপদগ্ধ জীবনে নিত্য পরশান্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

এই গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীল প্রভুপাদের 'গৌড়ীয়-দর্শনে' প্রকাশিত 'স্ফোটবাদ-বিচার' উদ্ধার করত তদনুগত্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের, শ্রীল জীবগোস্বামিপ্রভুর, শ্রীল রূপ-সনাতন প্রভুর, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুর শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের—প্রভৃতি মহাজনগণের প্রকাশিত গ্রন্থ প্রমাণ হইতে সুবৈজ্ঞানিক উপায়ে স্ফোটবাদের প্রকৃত সুগুপ্ত সিদ্ধান্ত-সকল প্রকাশিত হইয়াছে। স্ফোটের মহাশক্তির প্রকাশ, মূলতত্ত্ব নিরূপণ, প্রকাশ তারতম্য ও বৈশিষ্ট্য সুবৈজ্ঞানিক উপায়ে শ্রীরূপানুগ-গুরুবর্গের কৃপায় তাঁহাদের শক্তিসঞ্চারে সংগৃহীত হইয়াছে। পরিশেষে স্ফোটের সঙ্গীতে প্রকাশ বর্ণন করিয়া অপ্রাকৃত শ্রীগৌরকৃষ্ণ সুখানুসন্ধানমূলক সংকীর্ত্তনাঙ্গরূপ সেবার কথা প্রকাশ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ দার্শনিক, তার্কিক, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভক্ত ইত্যাদি সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই পরমাদরের গ্রন্থ। ইহাতে কাহাকেও আক্রমণ বা কটাক্ষ না করিয়া সুবৈজ্ঞানিক উপায়ে সত্য নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। জগতের সর্ব্ব ব্যাপারেই যে স্ফোটের শক্তি কি ভাবে কার্য্যকরী হইতেছে, তাহা সুবৈজ্ঞানিক উপায়ে সুযুক্তিদ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐহিক, পারত্রিক ও পারমার্থিক সকল প্রকার ব্যক্তিরই অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীনামভজনকারীর যে বিষয় না জানিলে নামের

কৃপা ও শক্তি লাভ করিতে পারিবে না তাহাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

সুধী পাঠকবর্গ এই গ্রন্থ আলোচনা করিলে যে, সকল তত্ত্বের মৌলিকত্ব ও সম্যক সম্প্রকাশিত চরম ও পরম পরাৎপরতত্ত্বের সন্ধান পাইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণলীলার গূঢ় তাৎপর্য্য-সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও তদীয় ভজন তাৎপর্য্যের রহস্য অবগত হইয়া কৃষ্ণভজনে দৃঢ়নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া ভজনোন্নতি লাভ করিতে পারিবেন। অযোগ্যতা নিবন্ধন দোষ ত্রুটী অবশ্যই মার্জ্জনীয়। অজ্ঞ, মূর্খ, নীচ, পতিত হইলেও যাঁহাদের কৃপাদেশ ও শক্তি সম্বল করিয়া এই দুরূহ ব্যাপার সমাধানে ব্রতী হইয়াছি তাঁহাদের কৃপা শক্তিই আমার চালক ও পালক হইয়া নিত্যকাল রক্ষা করুণ ইহাই, বিনীত নিবেদন।

ভগবদ্দাসানুদাস অকিঞ্চন
শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী।

প্রকাশিত বিষয়ের নির্দ্দেশ

প্রথম ক্রম—১—২৬। স্ফোটের প্রভাববিস্তার ক্ষেত্র, শব্দ, স্ফোট শব্দের অর্থ, বিভিন্ন দার্শনিকের স্ফোটের বিচার, শ্রীমদ্ভাগবতে স্ফোটের বিচার ১—৮। আন্তর ও বহিঃ স্ফোট, শ্রীজীবগোস্বামীর বিচার, বিদ্বৎ তাৎপর্য্য, ত্রিবিধ রূঢ়ি। শ্রৌতপন্থা ও স্ফোটের কদর্থ, গৌড়ীয়াচার্য্য ও মহাপ্রভুর স্ফোটের বিচার ৮—১৮। কর্ম্ম ও লীলা প্রবেশ, গৌড়ীয়-দর্শনে সর্ব্ব-সমন্বয়, শ্রবণানুগ্রহে দর্শন, ১৮—২৬। **দ্বিতীয় ক্রম** ২৬—

মুদ্রণ ভ্রম নিদর্শন—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১৬	পরব্যোমাতীর্ণ	পরব্যোমাবতীর্ণ
১০	৪	অসন্তব	অসম্ভব
২৬	৯	কৃপাদশীর্ব্বাদ	কৃপাশীর্ব্বাদ
৪১	১৭	ধেনুকানুর	ধেনুকাসুর
৫৫	১২	সদাসুর	মদাসুর
৫৫	১৮	সম্মৃদ্ধি	সমৃদ্ধি
৬৩	৯	বিভূত	বিভূতি
৬৩	২০	সান্বন্ধিকী	সাম্বন্ধিকী
৭৫	১৯	স্বল্ল	স্বল্প
৮৩	২২	বিষয়	বিষয়ী

৯৪	১১	মিনিত্ত	নিমিত্ত
৯৯	১	দ্বারকালীলা	শ্রীচৈতন্যদেব ও স্ফোটবাদ
৯৯	৬	সিদ্ধান্ধ	সিদ্ধান্ত
১০৯	১৩	এবৎ	এবং
১১০	৮	পৃথিথীতে	পৃথিবীতে
১১১	৯	সুকুঠিন	সুকঠিন
১১২	১৬	চতুর্থক্রম	ষষ্ঠক্রম
১১২	২২	আত্মত্বের	আত্মতত্ত্বের
১১৩	”	ষেহেতু	যেহেতু
১৩৭	১	কৃষ্ণবণং	কৃষ্ণবর্ণং
১৫১	২০	গোপলননা	গোপললনা
১৬৫	৮	আরণকে	আবরণকে
১৬৮	২৩	গ্রহণের	গ্রহণে
১৭০	৮	মমতা	সমতা
১৭২	১	নাই	পাই
১৭৩	১৪	শ্রীকৃষ্ণমাদিনান	শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন
১৭৫	১৩	Onthropo	Anthropo
১৭৬	৯	স্বষ্ট	সৃষ্টি
১৮৩	১	অষ্টম	দশম
২১৩	২০	দশম ক্রম	একাদশ ক্রম
২১৮	৬	নামিকা	নাসিকা
২৩৪	২০	সক	সকল

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

স্ফোটবাদ-বিচার

প্রথম ক্রম

শ্রীগুরুচরণান বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্লাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মনীন্ ॥
অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্।
শ্রীচৈতন্যং লিখত্যেহস্য স্ফোটবাদ বিনির্ণয়ঃ।
যদি তব থাকে মন পঙ্গু নাচাইতে।
শক্তি সঞ্চারিতে পদ ধরহ শিরেতে।

শ্রীগৌড়ীয়-দার্শনিকগণ শ্রীগুরুদেব ও শ্রীকৃষ্ণে নিত্য-অভিন্ন-বুদ্ধিতে শ্রীগুরুদেবে পরভক্তিযুক্ত। এই পরভক্তি-বৃত্তি যাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, তাঁহারই হৃদয়ে পূর্ণ স্ফোটশক্তি সম্পূর্ণ-ভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। হরিসেবারহিত চেষ্টা, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যাদির আবরণ-আবর্জ্জনার কর্ণ-মলে কর্ণপুট অবরুদ্ধ থাকিলে তাহাতে স্ফোটশক্তি সঞ্চারিত হইতে পারে না। সেবোন্মুখ কর্ণে প্রবিষ্টমান পরব্যোমাতীর্ণ নিত্য-শক্তিসমন্বিত অর্থ-প্রতীতি-সমুৎপাদক শব্দ 'স্ফোট'-পদ বাচ্য। ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টয়যুক্ত বিষয় দর্শন-দোষে দুষ্ট জ্ঞানের পরিবর্ত্তে দোষাতীত আম্নায়-পন্থীর কর্ণদ্বারে স্ফোটের বিচার প্রবেশিত হয়।

শব্দ :—শব্দ দুই প্রকার—নিত্য ও অনিত্য। মহর্ষি

পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ স্ফোটাত্মকরূপে শব্দের নিত্যত্ব এবং বর্ণাত্মকরূপে শব্দের অনিত্যত্ব বিচার করেন। পতঞ্জলীর মতও—পাণিনির অনুরূপ। পাণিনি স্ফোটকে জগন্নিদান-স্বরূপ নিরবয়ব শব্দই সাক্ষাদ ব্রহ্ম বলিয়াছেন—"জগন্নিদানং স্ফোটাখ্যো নিরবয়বো নিত্যঃ শব্দো ব্রহ্মৈবেতি।" ব্রহ্মকাণ্ডে—"অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্। নিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥" শ্রীহরি স্বয়ং ব্রহ্মকাণ্ডে বলিয়াছেন—শব্দতত্ত্ব অনাদিনিধন ও অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ। ইহা হইতেই জগতের প্রক্রিয়া হইয়া থাকে। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—অর্থ-প্রত্যয় সমুৎপাদন করে কে? ব্যস্ত (বিভক্ত বা পৃথক্কৃত) বর্ণ অথবা সমস্ত (সমুদায়) বর্ণ? মহর্ষি পাণিনি, বলেন,—ব্যস্তবর্ণ অথবা সমস্তবর্ণ কোনটীই অর্থ-প্রতীতি-উৎপাদনে সমর্থ নহে। কেন না, ব্যস্ত (পৃথক্কৃত) বর্ণ হইতে অর্থ-প্রত্যয় সম্ভবপরই হইতে পারে না। যেমন 'ভক্ষণ'—এস্থানে 'ভ', 'ক', 'ষ' ও 'ণ' দ্বারা পৃথগ্‌রূপে ভক্ষণ-ক্রিয়া-বিষয়ক কিছুমাত্র অর্থ-প্রতীতি হয় না। আর বর্ণসকল যখন ক্ষণিক, তখন তাহাদের সমূহও অসম্ভব; 'ভ', 'ক', 'ষ' এবং 'ণ'—এই বর্ণ-চতুষ্টয়ের নাদ একটীর পর আর একটী লয় প্রাপ্ত হইয়া যাওয়ায় উহাদের চারিটীর একত্র অবস্থান হইয়া কমল-পত্র-শতবেধন্যায়-বিচারে অর্থবোধ-জন্মান অসম্ভব। আবার ব্যাস ও সমাস উভয়ের দ্বারা অন্য প্রকারও সাধিত হইতে পারে না। একারণে বর্ণসকলের স্ফোটবিচ্ছিন্ন স্বতঃসিদ্ধ-বাচকত্ব অনুপপন্ন হয়। সুতরাং যাহার বলে অর্থ-প্রতীতি

সমুৎপন্ন হয়, তাহাকেই 'স্ফোট' বলে,—তস্মাদ্বর্ণানাং বাচকত্বানুপপত্তৌ যদ্ বলার্থপ্রতিপত্তিঃ স স্ফোট ইতি বর্ণাতিরিক্তো বর্ণাভিব্যঙ্গোঽর্থপ্রত্যায়কো নিত্যঃ শব্দঃ স্ফোট ইতি তদ্বিদো বদন্তি। অতএব স্ফুটাতে ব্যঞ্জাতে বর্ণৈরিতি স্ফোটো বর্ণাভিব্যঙ্গঃ স্ফুটীভবত্যস্মাদর্থ ইতি স্ফোটোঽর্থ প্রত্যায়ক ইতি স্ফোটশব্দার্থমুভয়থা নিরাহুঃ॥ অর্থাৎ বর্ণসকলের বাচকত্ব অনুপপন্ন হওয়ায় যাহার বলে অর্থ-প্রতীতি সমুৎপাদিত হয়, তাহাকেই 'স্ফোট' বলে তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, বর্ণাতিরিক্ত বর্ণাভিব্যঙ্গ অর্থ-প্রত্যয়-সমুদ্ভাবক নিত্যশব্দই 'স্ফোট'-পদবাচ্য। বর্ণাভিব্যঙ্গ—'বর্ণের দ্বারা অভিব্যঙ্গ অর্থাৎ 'অভি' সর্ব্বতোভাবে ব্যক্ত বা স্ফুটিত হয় বলিয়া ইহার নাম 'স্ফোট'। আর ইহা হইতে অর্থ স্ফুটিত হয় বলিয়া ইহাকে অর্থ-প্রত্যয়-সমুদ্ভাবক 'স্ফোট' বলা হয়। এইরূপে উভয় প্রকারে স্ফোট-শব্দার্থ নিরুক্ত হইয়াছে।

পতঞ্জলি, কৈয়ট প্রভৃতিও স্ফোটের বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। মীমাংসা-শ্লোকবার্ত্তিকের ভট্টাচার্য্যগণও স্ফোটবাদের আলোচনা করিয়াছেন। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার স্ফোটবাদের যে আলোচনা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে যে, পাণিনিপ্রমুখ বৈয়াকরণ-স্ফোটবাদিগণ বলিতেছেন, স্ফোট না থাকিলে কেবল বর্ণাত্মক শব্দের দ্বারা অর্থ বোধ হইত না। যেমন 'অ', 'গ', 'ন' ও 'ই'—এই চারিটী বর্ণস্বরূপ যে 'অগ্নি' শব্দ, তদ্দ্বারা বহ্নির বোধ হয়; কিন্তু ঐ বোধ কেবল চারিটী বর্ণের দ্বারা সম্পাদিত হইতে

পারে না। যদি এই চারিটী বর্ণের প্রত্যেক বর্ণের দ্বারাই বহ্নির বোধ হইত, তাহা হইলে কেবল অকার কিম্বা গকার উচ্চারণ করিলেও বহ্নির বোধ হয় না কেন? যদি কেহ বলেন, ঐ চারিটী বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারিত হইলে তাহা বহ্নিবোধক না হইলেও ঐ চারিটী বর্ণ একত্রিত হইয়া বহ্নির বোধ জন্মাইয়া দেয়। এখানে স্ফোটবাদিগণ বলেন যে, এরূপ যুক্তি একটা বাল-কোলাহল মাত্র; কেন না, বর্ণসকল আশু-বিনাশী। পর পর বর্ণের উৎপত্তিকালে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণসকল বিনষ্ট হইয়া যায়; কাজেই অর্থবোধের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের একত্র অবস্থানই সম্ভবপর হয় না। অতএব ঐ চারিটী বর্ণের দ্বারা প্রথমতঃ স্ফোটের অভিব্যক্তি অর্থাৎ স্ফুটতা জন্মে, পরে স্ফুট স্ফোট দ্বারা বহ্নির বোধ হয়। এস্থানে কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত রীতিক্রমে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া থাকেন, প্রত্যেক বর্ণের দ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি স্বীকার করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক বর্ণের দ্বারা অর্থবোধস্থলীয় দোষ ঘটে। আর সমুদয় বর্ণের দ্বারা স্ফোটের অভিব্যক্তি স্বীকার করিলে সেই দোষই উপপন্ন হয়। কাজেই উভয়পক্ষেই যখন এরূপ দোষ জাগরূক রহিয়াছে, তখন স্ফোটবাদ-আবাহনের আবশ্যক কি?

স্ফোটবাদিগণ এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলেন, যেমন একবারমাত্র পাঠের দ্বারাই স্বাধ্যায় অবধারিত হয় না, কিন্তু বারংবার আলোচনা বা অভ্যাসের দ্বারাই পাঠ্যগ্রন্থের তাৎপর্য্য দৃঢ়রূপে অবধারিত হয়, তেমনি প্রথমবর্ণ 'অ' কার দ্বারা স্ফোটের কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুটতা জন্মাইলেও পরে দ্বিতীয়, তৃতীয়

প্রভৃতি বর্ণের দ্বারা ক্রমশঃ স্ফুটতর ও স্ফুটতম হইয়া স্ফোট বহ্নির বোধক হয়। কিঞ্চিন্মাত্র স্ফুট হইলেই যে স্ফোট অর্থ বোধক হইবে, এরূপ নহে। যেমন, রত্নতত্ত্ব প্রথম প্রতীতিতে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না, কিন্তু চরমে চিত্তে যথাবৎ অভিব্যক্ত হয়, তেমনি প্রথমে নাদ দ্বারা বীজ আহিত হয়, পরে অন্ত্য-ধ্বনির সঙ্গে আবৃত্তির পরিপাক হইলে বুদ্ধিতে শব্দ অবধারিত হইয়া থাকে।

পতঞ্জলী বলেন,—শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্॥ (পাতঞ্জল সূত্র ৩য় অঃ ১৭ সূত্র)।

ভাষ্যতাৎপর্য্য—বর্ণসমূহ এককালে উৎপত্তিশীল না হওয়ায় অর্থ-প্রতিপাদনে পরস্পর পরস্পরের সহায়ক হইতে পারে না। তাহারা পদকে স্পর্শ না করিয়া, তাহাকে প্রকাশিত না করিয়াই (অর্থাৎ তাহার প্রকাশের পূর্ব্বেই) আবির্ভূত ও তিরোহিত হইয়া থাকে, অতএব তাহারা প্রত্যেকে পদ-স্বরূপে গণ্য হয় না। পরন্তু তাহারা প্রত্যেকেই পদাত্মক এবং যাবতীয় অর্থপ্রকাশক শক্তিবিশিষ্ট বলিয়া সহকারী অন্যান্য বর্ণ-সমূহের সহিত বিভিন্নক্রমে সংযুক্ত ও বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হইয়া বিভিন্নার্থ-প্রতিপাদক হইলেও পূর্ব্ববর্ণ পরবর্ত্তী বর্ণের দ্বারা এবং পরবর্ত্তী বর্ণ পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণ দ্বারা কোন নিয়তরূপে নিয়তার্থ-বিশেষেই স্থাপিত রহিয়াছে। এইরূপে ক্রমানুরোধে মিলিত বহুবর্ণ কোন বিশেষ-অর্থের সূচকরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন 'গ' কার, 'ঔ' কার এবং বিসর্গ বর্ণ প্রত্যেকে

সর্ব্বার্থপ্রকাশ-শক্তিসম্পন্ন হইয়াই কোন নির্দ্দিষ্ট-ক্রমে সজ্জিত হইয়া 'গৌঃ' ইত্যাকার পদরূপে সাস্নাদিবিশিষ্ট (গলকম্বলাদিযুক্ত) প্রাণিবিশেষেরই প্রকাশক হইয়া থাকে। অতএব ঐ বর্ণসকলের উচ্চারণের পর (বিনাশ হইলেও) অর্থ-প্রকাশকরূপে নিয়ত ঐ বর্ণসকলের উচ্চারণ-ক্রমসমূহ স্মৃতিবলে একত্র সংগৃহীত হইলে যে একটী বুদ্ধির প্রকাশ পায়, উহাই 'পদ' (স্ফোট) নামে অভিহিত এবং উহাই বাচ্যবস্তুর বাচকরূপে নিয়ত হইয়া থাকে।

স্ফোটবিচারে জৈমিনী :—জৈমিনী শব্দের নিত্যত্ব-স্থাপনের যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন ;—"নিত্যস্তু স্যাদ্দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ।" (১।১।১৮)। শব্দের কেন নিত্যত্ব স্বীকৃত হইবে ? জৈমিনী তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন—শব্দকে 'নিত্য' বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে ; কেন না, উচ্চারণের দ্বারা পূর্ব্বাবগত শব্দই পরের বোধ জন্মাইবার হেতুস্বরূপ হয়। শব্দ ত' পূর্ব্ব হইতেই আছে। শব্দ পূর্ব্বাবধি বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কোন একটী বিশেষ অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। বক্তার বুদ্ধিতে প্রথমে তাহা দৃষ্ট হইলে তদ্‌ব্যঞ্জক ধ্বনি বক্তার দ্বারা উচ্চারিত হয়। পরে শ্রোতাও সেই ধ্বনি দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া সেই স্ফোট হইতে শব্দের অর্থ বোধ করেন। কাজেই 'স্ফোট'-শব্দটী ধ্বনি হইতে ব্যতিরিক্ত। উদাহরণ-স্বরূপে বলা যাইতে পারে,—আলোক ও দৃষ্টিশক্তিসাহায্যে একটী বস্তু এখন আমার দর্শনের বিষয় হইয়াছে বলিয়া সেই বস্তুটীকে তৎকালেই যেমন

আলোকের দ্বারা উৎপন্ন বস্তু বলা যাইবে না, তেমনি শব্দও উচ্চারণ-ক্রিয়াসাহায্যে এখন বুদ্ধিতে আরূঢ় হইল বলিয়া শব্দকে উচ্চারণোৎপন্ন ধ্বনি বলা যাইবে না; উহা ধ্বনি-নিরপেক্ষ একটী সদ্‌বস্তু, কাজেই শব্দ—নিত্য।

সাংখ্যের বিচারঃ—সাংখ্য বৈয়াকরণগণের স্ফোটবাদ নিরাস করিয়াছেন;—"প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ॥" (৫। ৭)। অর্থাৎ বর্ণসমূহ উচ্চারণের পর তৃতীয় ক্ষণেই বিনাশশীল বলিয়া তাহাদের মিলিতভাবে শব্দরূপে কোন অর্থ-প্রতিপাদনের সামর্থ্য না থাকায় পতঞ্জলি প্রভৃতি শাস্ত্র-কারগণ শব্দকে বর্ণাত্মকরূপে স্বীকার করেন না। পরন্তু ঐ বর্ণসমূহের উচ্চারণ-প্রকাশিত 'স্ফোট' নামক কোন অতিরিক্ত পদার্থই—শব্দের স্বরূপ এবং উহাকেই তাঁহারা অর্থপ্রতিপাদক-রূপে কল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উক্ত মত-খণ্ডনের জন্য সাংখ্যকার এই সূত্রে বলিতেছেন যে,—তোমরা অর্থের প্রতীতি জনকরূপে যে স্ফোট পদার্থের স্বীকার করিতেছ, উহা স্বয়ং প্রতীত হয় কি না? যদি বল প্রতীত হয়, তাহা হইলে যে সকল বর্ণের উচ্চারণ হইতে তাহার প্রতীতি হয়, সেইসকল বর্ণের উচ্চারণ হইতে অর্থের প্রতীতিও জন্মিতে পারে, মধ্যবর্ত্তী 'স্ফোট' নামক অতিরিক্ত পদার্থের কল্পনা আবশ্যক হয় না। পক্ষান্তরে, যদি বল, স্ফোট-পদার্থ স্বয়ং প্রতীত না হইয়াই অর্থের প্রতীতিজনক হয়, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, কোন বস্তু স্বয়ং অপ্রতীত হইয়া অপরের প্রতীতি-জননে সমর্থ হয়

না। অতএব প্রতীতি এবং অপ্রতীতি—উভয়কল্প-বিচারেই স্ফোটের সাধন অসম্ভবপর বলিয়া শব্দ স্ফোটাত্মক নহে।

আন্তরস্ফোট ও বহিঃস্ফোট :—কোন কোন আচার্য্য আন্তর-স্ফোটও বহিঃস্ফোট বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—

"ততোঽভূত্ত্রিবৃদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্।
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥"

অর্থাৎ অনন্তর সেই নাদ হইতে অব্যক্তপ্রভব স্বতঃ হৃদয়ে প্রকাশমান ত্রিমাত্র অর্থাৎ কণ্ঠ-ওষ্ঠাদি দ্বারা উচ্চার্য্যমান অথবা 'ত্রিবৃৎ' শব্দে 'অ'কার, 'উ' কার ও 'ম' কারাত্মক ওঁ-কার উৎপন্ন হইল। এই ওঁকার—পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবানের বোধদ্বার অবয়বস্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই প্রমাণানুসারে প্রণবাত্মক বর্ণ-সমূহের নিত্যত্ব প্রমাণিত হইতেছে। আকাশের নিত্যদ্রব্যত্বহেতু তদ্‌গুণস্বরূপ শব্দের ও নিত্যত্ব যুক্তিসিদ্ধ। বায়ুর প্রেরণ ও অপ্রেরণ-বশতঃই যখন শব্দের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তখন শব্দ—নিত্য পদার্থ। অন্তঃকরণে উপলভ্যমান এই নিত্যবর্ণই আন্তরস্ফোট। শব্দার্থ যদি অন্তরে উপলভ্যমান হয়, তাহা হইলে তাহা আন্তর-স্ফোটবাচ্য। সেখানে যে শব্দস্ফোট, তাহাই শব্দব্রহ্ম। এই আন্তর-স্ফোট—নিরংশ, বর্ণের সহিত অভিন্ন নিত্যজ্ঞানস্বরূপ ও শব্দার্থময়। এই মতে প্রণব হইতেই নিখিল বেদের আবির্ভাব। অন্তরে উপলভ্যমানত্ব হেতু সেই প্রণব আন্তরস্ফোট অর্থাৎ অব্যক্ত।

উদাহরণস্বরূপ ইহারা বলেন,—"জাতান্ধমূকবধিরস্যান্তঃস্বীয়-পরামৃশি। স্ববাক্‌শব্দার্থয়োর্বোধ আন্তরস্ফোট এব সঃ॥" অর্থাৎ যাহারা জন্মাবধি অন্ধ, মূক বা বধির, তাহাদের চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অভাব থাকার দরুণ অন্তঃকরণে স্বতঃই শব্দার্থের পরামর্শ ঘটে এবং তাহাদের বাক্য ও শব্দার্থের বোধও জন্মিয়া থাকে, ইহাই আন্তরস্ফোট।

বৈয়াকরণগণ শাব্দবোধের প্রতি বহিঃস্ফোটকেই কারণরূপে নির্দ্দেশ করেন। তাঁহাদিগের বিচারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণোচ্চারণে যে সংস্কার অভিব্যক্ত হয়, তত্তৎ সংস্কার-সহকৃত যে চরম বর্ণ-সংস্কার, সেই সংস্কারনিষ্ঠ পদজন্য একপদার্থ-বোধজনকতাই 'পদস্ফোট'। এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদের উচ্চারণে যে সংস্কার অভিব্যক্ত হয়, তত্তৎ-সংস্কার-সহকৃত আবার যে চরম পদ-সংস্কার, তৎসংস্কারনিষ্ঠ-বাক্য জন্য একবাক্য-বোধকতাই বাক্যস্ফোট। অদ্বিতীয়, নিত্য, পদাভিব্যঙ্গ্য, বাক্যাভিব্যঙ্গ্য, অখণ্ড এবং তাদৃশ অনেক পদঘটিত মহাবাক্যস্ফোটই— 'জাতিস্ফোট'-পদবাচ্য। এই ব্যক্তিস্ফোটের সহিত জাতি-স্ফোটই মহাবাক্য জন্য শব্দবোধের কারণ। ইহাই বৈয়াকরণ-গণের মত। তাঁহারা বলেন, পদব্যুৎপাদন-সময়ে স্ফোটদ্বারাই শাব্দ-বোধ হইয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অর্থাপত্তি, উভয় প্রমাণের সম্ভাবনা আছে। যেমন 'গৌঃ' উচ্চারণ করিলে 'গ' কার, 'ঔ' কার ও বিসর্গ প্রতীত হয় না, গলকম্বলাদি-বিশিষ্ট কোন পদার্থই প্রতীত হইয়া থাকে, ইহাই প্রত্যক্ষ। আর 'গো' কারাদি বর্ণসমূহ ব্যস্তভাবে ও সমস্তভাবে অর্থবোধ-

জনক হয় না, ইহার কারণও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অর্থাৎ বৈয়াকরণগণ বলেন, একটী বর্ণ দ্বারাই অর্থ-প্রতীতি হইলে অপরাপর বর্ণোচ্চারণের ব্যর্থতা হয়। আর বর্ণ যখন উৎপন্ন হইয়াই বিনষ্ট হয়, তখন বর্ণসমূহেরও সমস্তজ্ঞান অসম্ভব। এইরূপে স্ফোটেই অর্থাপত্তি প্রমাণসিদ্ধ।

'পৃথগ্‌সম্বন্ধানাং সংস্কারাণাং ক্রমেণ পরস্পরসম্বন্ধকারিত্বং স্ফোটত্বম্।" অর্থাৎ আনুপূর্ব্বীরহিত সংস্কার-সমূহের প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণের ক্রমানুসার পরস্পর আনুপূর্ব্বীরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট চরমবর্ণের জ্ঞানে শাব্দ-বোধের জনকতাই স্ফোটত্ব। এইরূপ স্ফোট স্বীকার না করিয়া তত্তদ্‌বর্ণজ্ঞানের জন্য শাব্দবোধ-স্বীকারে 'রস' স্থানে 'সর' বা 'নদী' স্থানে 'দীন' এইরূপ প্রতি-লোম-পাঠেও রেফ-স-কারাদি বর্ণ-জন্য সংস্কারের বিদ্যমানতা-হেতু 'সর' ও 'নদী' বস্তুদ্বয়ের শব্দ বোধ হইতে পারে। অনু-লোম-(অনুকূল, সোজা) সংস্কারবশে যাদৃশার্থবিশিষ্ট পদ ব্যুৎপাদিত হইবে, প্রতি-লোমোচ্চারিত সে-সকল বর্ণ কখনই তাদৃশ পদের ব্যুৎপাদক হইতে পারে না। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে অনুলোম ও প্রতিলোম-পদের কোন ভেদই থাকে না।

শ্রীল-শ্রীজীব গোস্বামীঃ—গৌড়ীয়-দার্শনিকগুরু সর্ব্ব-সম্বাদিনীকার শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ সাধারণ স্ফোটবাদ নিরাস করিয়া বর্ণরূপ 'বেদ'-শব্দের নিত্যত্ব ও অর্থপ্রত্যায়কত্ব স্থাপন করিয়াছেন,—তদেব সর্ব্বস্মিন্নপি বেদাত্মকে সর্ব্বস্বার্থং

প্রতিপ্রামাণ্য—মুপলব্ধে স কথমর্থং প্রসূত ইতি বিক্রিয়তে; —তত্র বর্ণানামাশুবিনাশিত্বান্নার্থং জানয়িতুং শক্তিঃ সম্ভবতি। ততশ্চপূর্ব্ব - পূর্ব্বাক্ষর-জন্য-সংস্কারবদন্ত্যাক্ষরস্যৈবার্থপ্রত্যায়কত্বং মন্যন্তে। তে চ সংস্কারাঃ কার্য্য-মাত্রপ্রত্যায়িতাঃ অপ্রত্যক্ষত্বাৎ, সংস্কার-কার্য্যস্য স্মরণস্য ক্রমবর্ত্তিত্বাৎ সমুদায়প্রত্যয়াভাবান্নান্ত্যবর্ণস্যাপ্যর্থপ্রত্যায়কত্বমিত্যভিপ্রেত্যাপরে তু স্ফোটমেব তৎপ্রত্যায়কমাহুঃ—"স চ বর্ণানামনেকত্বেনৈকপ্রত্যয়ানুপপত্তেরেকৈক-বর্ণ প্রত্যয়াহিতসংস্কার-বীজেঽন্ত্যবর্ণ-প্রত্যয়জনিত-পরিপাকে প্রত্যয়িনি একপ্রত্যয়বিষয়তয়া ঝটিতি প্রত্যবভাসতে।" (ব্রহ্মসূত্র ১।৩।২৮ সূত্রীয় শঙ্করভাষ্যে)

অতএব স্ফোটরূপত্বাদ্বেদস্য নিত্যত্বং তস্য প্রত্যচ্চারণং প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ। বেদান্তিনস্তু "বর্ণা এব তু শব্দ ইতি ভগবানুপবর্ষ" ইত্যেতং ন্যায়মনুসৃত্য 'দ্বির্গো' শব্দোঽয়মুচ্চারিতঃ, —ন তু দ্বৌ গোশব্দাবিত্যেকত্বৈব সর্ব্বৈঃ প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ বর্ণাত্মকানমেব শব্দানাং নিত্যত্বমঙ্গীকৃত্য তে চ বর্ণাঃ পিপীলিকাপংক্তিবৎ ক্রমাদ্যনুগৃহীতার্থবিশেষসংবন্ধাঃ সন্তঃ স্বব্যবহারেঽপ্যেকৈক-বর্ণগ্রহণানন্তরং সমস্ত-বর্ণ-প্রত্যয়দর্শিন্যাং বুদ্ধৌ তাদৃশমেব প্রত্যবভাসমানাস্তং তমর্থমব্যভিচারেণ প্রত্যায়য়িষ্যন্তীত্যতে বর্ণবাদিনাং লঘীয়সী কল্পনা স্যাৎ; স্ফোটবাদিনাং তু দৃষ্টহানিরদৃষ্টকল্পনা চ; তথা বর্ণাশ্চেমে ক্রমেণ গৃহ্যমাণাঃ স্ফোটং ব্যঞ্জয়ন্তি, স স্ফোটোঽর্থং ব্যনক্তীতি গরীয়সী কল্পনা স্যাদিতি মন্যন্তে। তদেবং বর্ণরূপাণামেব বেদশব্দানাং নিত্যত্বমর্থপ্রত্যায়কত্বং চাঙ্গীকৃতম্।"

এইরূপে বেদাত্মক যাবতীয় শব্দই সমস্ত স্বার্থ-বিষয়ে প্রামাণ্য লাভ করায় ঐ শব্দ কিরূপে অর্থপ্রকাশক হয়, তাহা বিবৃত হইতেছে। প্রথমতঃ, আপত্তি এই যে, বর্ণসমূহ শীঘ্র বিনাশশীল অর্থাৎ তৃতীয়ক্ষণবিধ্বংসী বলিয়া অর্থ-প্রতিপাদনে তাহাদের শক্তি সম্ভবপর হয় না। অতএব কেহ কেহ শব্দস্থিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব অক্ষরসমূহের উচ্চারণজনিত সংস্কারের সহিত সংযুক্ত অন্ত্য অক্ষরই অর্থ প্রকাশক হয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের উচ্চারণজনিত সংস্কার অপ্রত্যক্ষ পদার্থ বলিয়া কেবলমাত্র অর্থপ্রকাশরূপ কার্য্যদ্বারাই প্রতীতির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। অপর কেহ কেহ বলেন, —পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণ যেরূপ ক্রমশঃ উচ্চারিত হয়, সেইরূপ তাহাদের উচ্চারণজনিত সংস্কারের কার্য্যস্বরূপ স্মরণও ক্রমশঃই হয়, পরন্তু এককালে হয় না। অতএব এককালে সমুদয়ের প্রতীতি না হওয়ায় তৎসহকৃত অন্ত্যবর্ণও অর্থপ্রতীতিজনক হইতে পারে না। এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা 'স্ফোট' নামক পদার্থ-বিশেষকেই অর্থপ্রতীতিজনকরূপে বলিয়া থাকেন।

"বর্ণ-সমূহের অনেকত্বনিবন্ধন এক প্রতীতি অসম্ভব বলিয়া এক একটী বর্ণের যে প্রতীতি, উক্ত প্রতীতিসমূহ দ্বারা যে সংস্কার উপস্থাপিত হয়, উক্ত সংস্কাররূপ বীজযুক্ত এবং অন্ত্য-বর্ণের প্রতীতিজনিত পরিপাকবিশিষ্ট পুরুষে এক প্রতীতির বিষয়রূপে উক্ত স্ফোট প্রতিভাসমান হইয়া থাকে।"

অতএব স্ফোটস্বরূপ বলিয়া বেদ নিত্য, যেহেতু প্রতি বর্ণের উচ্চারণেই তাহার প্রত্যভিজ্ঞ অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কার-জ্ঞান

বর্ত্তমান। বৈদান্তিকগণ বলেন,—"ভগবান্ উপবর্ষ-বর্ণ-সমূহকেই শব্দস্বরূপ বলিয়া থাকেন"—এই নীতির অনুসরণ পূর্ব্বক "দ্বিঃগৌ" এই স্থলে এক শব্দেরই উচ্চারণ, পরন্তু দুইটী 'গৌ' শব্দের উচ্চারণ হয় নাই, যেহেতু একত্বরূপেই সমস্তের প্রত্যভিজ্ঞান হইয়াছে। অতএব বর্ণাত্মকরূপেই শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত বর্ণসমূহ পংক্তিস্থিত পিপীলিকা-সমূহের ন্যায় ক্রমশঃ অনুগৃহীত অর্থবিশেষের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া নিজ-ব্যবহারে ও এক একটী বর্ণোচ্চারণের অনন্তর সমস্ত বর্ণের প্রতীতি-প্রকাশিনী বুদ্ধিতে অর্থবিশেষ সম্বন্ধরূপেই প্রতিভাসমান হইয়া নিয়মিতরূপে উক্ত অর্থের প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে। অতএব বর্ণবাদিগণের কল্পনার লাঘব হইয়া থাকে। স্ফোটবাদিগণের মতে অর্থ-প্রতীতিবিষয়ে দৃষ্টবর্ণসমূহের পরিহার-হেতু দৃষ্টহানি এবং অদৃষ্ট-স্ফোটের উপাদানহেতু অদৃষ্ট-কল্পনারূপ দোষদ্বয়ের উপস্থিতি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এই বর্ণসকলই একবার ক্রমশঃ উচ্চারিত হইয়া স্ফোটকে প্রকাশ করে, পুনরায় ঐ স্ফোট-পদার্থ অর্থকে প্রকাশ করে, এই কল্পনাপক্ষে কল্পনা-গৌরবরূপ দোষ ঘটিয়া থাকে। অতএব এইরূপে বর্ণাত্মক বৈদিক শব্দসমূহেরই নিত্যত্ব এবং অর্থ-প্রতীতিজনকত্ব অঙ্গীকৃত হইল।

শাঙ্করভাষ্যে রত্নপ্রভা-টীকা, আনন্দগিরি, ভামতী, জয়ন্তভট্ট-কৃত ন্যায়মঞ্জরী প্রভৃতিতে স্ফোটবাদের অনেক আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার অধ্যাপক-লীলায়, আচার্য্য-লীলায় যে অভূতপূর্ব্ব স্ফোটবাদের বিচার

প্রদর্শন করিয়াছিলেন সেই বিচার পরমার্থ-বিজ্ঞান-বিশ্বে আর ইতঃপূর্ব্বে এরূপ সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদ তত্ত্বসন্দর্ভীয় অনুব্যাখ্যায় সাধারণ স্ফোটবাদ নিরাস করিয়া যে বর্ণরূপ বেদশব্দের নিত্যত্ব ও অর্থপ্রত্যায়কত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহা দ্বারা, শ্রীমন্মহাপ্রভু অধ্যাপক-লীলায় যে স্ফোটবাদের বিদ্বদ্রূঢ়িগত বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের শ্রীহরি-নামামৃতব্যকরণের অবতারণা পাণিনীয় সাধারণ স্ফোটবাদ নিরাস করিয়া স্ফোটবাদের বিদ্বদ্রূঢ়ি-স্থাপনাভিপ্রায়েই হইয়াছিল। বিদ্বদ্রূঢ়িগত স্ফোটবাদ গৌড়ীয়-দর্শনের সার-শিক্ষা শ্রীনাম-ভজনেই পরিস্ফুট হইয়াছে। শিক্ষাষ্টকে যে বিদ্যাবধূজীবন-শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের বিজয়-দুন্দুভি ঘোষিত হইয়াছে, তাহাতে বিদ্বদ্রূঢ়িগত স্ফোটবাদই পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ণের উচ্চারণবোধক বেদাঙ্গশাস্ত্রকে 'শিক্ষা বলে। উদাত্ত, অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বরবিজ্ঞান শিক্ষা'-বেদাঙ্গের আলোচ্য বিষয় কিন্তু শিক্ষাষ্টক সেরূপ বেদাঙ্গমাত্র নহেন। শিক্ষাষ্টকের অন্তর্গতই নিখিল সাঙ্গবেদ। শিক্ষাষ্টকে যে শিক্ষা, তাহাতে বেদাঙ্গ-শাস্ত্রের বিদ্বদ্রূঢ়িগত বিচার বেদের অঙ্গমাত্রে আবদ্ধ না থেকে সাঙ্গবেদকে ক্রোড়ীভূত করিয়া ফেলিয়াছে। সেই শিক্ষাষ্টকে নামী হইতে অভিন্ন স্বরাট্ কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহ শ্রীনামচিন্তামণি স্ফোটব্রহ্মের কথা ব্যক্ত হইয়াছে।

বৈয়াকরণগণ বা শাব্দিকগণ স্ফোটকে বর্ণাতিরিক্ত বা

বর্ণ হইতে ভিন্ন বিচার করিয়া নানাপ্রকার সাম্প্রদায়িক বাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ীয়-দর্শনের শ্রীনামের বিচারে সাধারণ স্ফোটবাদের যাবতীয় সাম্প্রদায়িক বিবাদ প্রশমিত হইয়াছে। সাধারণ স্ফোটবাদে বর্ণ ও বর্ণীতে ভেদ, কেন না, তাহাদের বর্ণ বা শব্দের বিচার প্রকৃতি বা ইতর-ব্যোমের অন্তর্গত; কিন্তু বিদ্বদ্রূঢ়িগত স্ফোটবাদের বিচারে কোন প্রকার মায়ার ব্যবধান নাই। সেখানে বর্ণ ও বর্ণীতে, শব্দ ও শব্দীতে, বাচ্য ও বাচকত্বে কোন ভেদ নাই। সেখানে বর্ণসকলের বাচকত্ব অসম্ভাবিত নহে। কারণ, সেখানকার বর্ণ ও বর্ণী, শব্দ ও শব্দী, বাচ্য ও বাচক, উভয়েই পরব্যোমের বস্তু। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল সূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট এইরূপ বিদ্বদ্রূঢ়িগত স্ফোটবাদের কথাই বলিয়াছিলেন,—"শৃণোতি য ইমং স্ফোটং সুপ্তশ্রোত্রে চ শূন্যদৃক্। যেন বাগ্ব্যজ্যতে যস্য ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ॥ স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনম্॥ (ভাঃ ১২।৬।৪০-৪১)

যে সময় আচ্ছাদনাদি হেতু শ্রবণেন্দ্রিয় বৃত্তিশূন্য হইয়া থাকে, সেই সময় ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্য ব্যতীত স্বাভাবিক জ্ঞানশালী যে-পুরুষ স্ফোট অর্থাৎ অব্যক্ত ওঁকারধ্বনি শ্রবণ করিয়া থাকেন, তিনিই পরমাত্মা। ঐ স্ফোট দ্বারাই বৃহতী-সংজ্ঞক বাক্যের প্রকাশ হয় এবং ঐ স্ফোট স্বয়ং হৃদয়াকাশে আত্মার নিকট হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ স্ফোট নিজের কারণস্বরূপ পরমাত্মা ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাদ্বাচক এবং

উহাই যাতীয় মন্ত্রসমূহের রহস্য ও বেদসমূহের সনাতন বীজস্বরূপ।

স্ফোটবাদের বিদ্বৎ-তাৎপর্য্য—স্ফোট—ব্রহ্ম-বস্তুর সাক্ষাৎ বাচক। সাধারণ বিচারে 'স্ফোট' শব্দে—ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ক্ষুদ্রত্বের পর পর বিচারে উন্নত দর্শনমাত্র। বৃহত্ত্ববোধক বিচার জ্ঞাপন করিবার জন্য 'ব্রহ্ম' বলা হইতেছে। ক্ষুদ্রতা পরিহার করিয়া 'ব্রহ্ম' শব্দের অবতারণায় বৃহত্ত্ববাচক স্ফোট-বাদের বিচার। হৈরণ্যগর্ভগণ বলেন,—সেই বিচারটী পরমাত্মাতে আবদ্ধ। সেইরূপ বিষয়টা এরূপভাবে বিচারগ্রাহ্য নহে। 'নব' ও 'বন' শব্দের সাম্য-বিচারে শব্দার্থের বিচার হয়। 'নদী', 'দীন', 'সর', 'রস' প্রভৃতি শব্দের বিন্যাসের বৈপরীত্যহিসাবে উদ্দিষ্ট বস্তুর ভেদ লক্ষিত হয়। সেই সকল শব্দের ন্যায় 'ব্রহ্ম'-শব্দ নহে। মনোধর্ম্মচালিত হইয়া 'ব্রহ্ম' শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গেলে শব্দের সত্যার্থ প্রকাশিত হয় না। গুরুপাদাশ্রিতের নিকট তাহা স্বয়ং প্রকাশিত হয়।

ত্রিবিধ রূঢ়ি—স্ফোটের বিচার সমৃদ্ধ হইয়া রূঢ়ি প্রকাশিত হয়। রূঢ়ি তিন প্রকার—অজ্ঞরূঢ়ি, সাধারণরূঢ়ি ও বিদ্বদ্রূঢ়ি। বিদ্বদ্রূঢ়ি অদ্বয়জ্ঞানকে লক্ষ্য করে, সাধারণ-রূঢ়ি ব্যবহারিক পরিভাষাগত বস্তুর ধারণায় বুদ্ধিবৃত্তিকে আবদ্ধ করে, অজ্ঞরূঢ়ি তাহা অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণতা পোষণ করিয়া ব্যবহারজগতে রজস্তমোগুণেরও মর্য্যাদা স্থাপন করে—জীবের বিভিন্ন প্রতীতির জন্য এই সকল কথা আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে স্ফোটবাদের বিদ্বদ্রূঢ়ি পরব্রহ্ম-

বস্তুকে লক্ষ্য করে। সেখানে স্ফোট কেবল বাচকমাত্র নহে, তাহাতে বাচ্যের বিচারও পরিস্ফুট, তখন আমরা জানি,—নামও নামী অভিন্ন।

শ্রৌতপন্থা ও স্ফোটের কদর্থঃ—যাহার প্রতিকূলে অপর কেহ তর্কবাদ অবলম্বন করিয়া তাহার বাস্তবতাকে প্রতিহত করিতে পারে না, তাহাই শ্রৌতপন্থা। স্থূলসূক্ষ্মাকারে যদি শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি চেতনের নিকট আবৃত হয়, তাহা হইলেই স্ফোটের কদর্থ হইয়া থাকে, তখন শব্দ ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন বস্তুর অভিজ্ঞান উপস্থিত করে। শব্দ গীত হইয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল বটে; কিন্তু চিদাকাশে বিচরণশীল বাস্তব-কর্ণে প্রবেশ করিবার অবকাশ পাইল না। তাহাতে শব্দের বাস্তব বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইতে না পারায় পরিচ্ছিন্ন, সঙ্কীর্ণ, বিকৃত ও বিবর্ত্তগ্রস্ত জ্ঞানে স্ফোটকে আবৃত করিয়া ফেলিল।

গৌড়ীয়াচার্য্য ও মহাপ্রভুর স্ফোটের বিচারঃ শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রভৃতি গৌড়ীয় দার্শনিক গুরুগণ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে এইরূপ স্ফোটের বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন;—মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক—স্ফোটবিচারেরই পরিস্ফুট বিজ্ঞান। মহাপ্রভু অতি অল্পাক্ষরে স্ফোটের বিচার বলিয়াছেন,—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" হরি সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয়। যাহাতে অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত হয়, সেরূপ শব্দ দ্বারা লোককে আচ্ছন্ন হওয়ার উপদেশ মহাপ্রভু দেন নাই। বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে প্রত্যেক শব্দ বিষ্ণু-বাচক—পরব্রহ্ম-বাচক। প্রত্যেক শব্দে স্ফোটধর্ম্ম হইতে বিদ্বদ্রূঢ়ি প্রকাশিত। মহান্ত

গুরুর দ্বারা কর্ণবেধসংস্কার হইলে—দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে স্ফোটধর্ম্মগত বিদ্বদ্‌রূঢ়ি প্রকাশিত হয়। রূঢ়িবৃত্তি শ্রীমূর্ত্তির প্রকাশ করে। অজ্ঞ ও সাধারণরূঢ়িতে বাচ্য-বাচক ও শব্দ-শব্দীতে ভেদ থাকায় সেখানে পৌত্তলিকতা বা প্রাকৃত-সাহজিকবাদ উপস্থিত হয়; কিন্তু বিদ্বদ্‌রূঢ়িতে বাচ্য-বাচকে আবরণ না থাকায় সেখানে পৌত্তলিকতার কোন স্থান নাই। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ষট্‌সন্দর্ভে, শ্রীল রূপ-সনাতন প্রভু ভাগবতামৃত প্রভৃতিতে এবং গৌড়ীয় দার্শনিকগণ সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত এই বিচার বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

জড়াকার, চিদাকার ও শব্দাচর্চ্চা—যখন কোন একটা বস্তু আকারবিশিষ্ট না হয়, তখন আমাদের দর্শনের বিষয় হয় না। কেবল নিরাকারের ধারণা অবাস্তব দার্শনিকগণের আকাশের পশ্চাদ্ভূমিকার কল্পনা মাত্র। যে বস্তু কিছুক্ষণ স্থূল-সূক্ষ্ম আকার সংরক্ষণ করিয়া নিত্য চিদাকর সংরক্ষণ করিতে পারে না, সে বস্তু অবাস্তব কল্পনামাত্র, তাহা কখনও সচ্চিদানন্দবস্তু নয়। গৌড়ীয়-দর্শনে যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বর-বস্তুর কথা বলা হইয়াছে, তাহা নিত্য চিদাকার-বিগ্রহ। তাহাই বাস্তব দার্শনিকগণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং তাহাই স্ফোটের বিদ্বদ্‌রূঢ়ি দ্বারা গুরুপাদাশ্রিত বিদ্বজ্জন-গণের শ্রুতিতে ও বাণীতে শব্দার্চ্চাকারে প্রকাশিত।

কর্ম্ম ও লীলা—গৌড়ীয়-দর্শনের গোড়ার কথা—'কর্ম্ম'

ও 'লীলা'তে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। কর্ম্ম—বহির্ম্মুখ-জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য, লীলা—সেবোন্মুখ-চিদিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা ভোগ্য জড়ের ন্যায় বুঝিয়া লইতে পারা যায়, লীলা এরূপ কোন কার্য্য প্রকাশ করে না। মনের দ্বারা জড়ের যে আকার ধারণা করিতে পারা যায়, তাহা বস্তুর বাস্তব আকারের সহিত ভেদ স্থাপন করে। কিন্তু শব্দ এই দুর্ভেদ্যদুর্গ দেহ ও মন ভেদ করিয়া চেতনের সন্ধিনীভূমিকায় প্রকাশিত হয়। বিদ্বদ্রূঢ়িতে সেই শব্দ সাক্ষাৎ বিগ্রহবান্ হরিরূপে গৌড়ীয়-দার্শনিকের দর্শনের বিষয় হয়। শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই এই হরির গান আছে। যে-সকলকে ইংরেজী পরিভাষায় Scripture বলা হয়—যাহাকে 'শাস্ত্র' বলা হয়—'বেদ', 'ভাগবত', 'পুরাণ' বলা হয়, সে-সকলের মধ্যেই হরির কথা বর্ণিত আছে,—"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥" লীলার ভাষায় বেদাদিতে 'হরি' শব্দের অবতারণা। গীতার উদ্দিষ্ট কৃষ্ণতত্ত্ব বিদ্বদ্রূঢ়িগত বিচারে না বুঝিতে পারিয়া অনেকে তাহাতে স্বকপোল-কল্পনা বা মনোধর্ম্মের আবরণ আনিয়া ফেলিয়াছে। উহাতে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থের উপলব্ধি হয় না। "কৃষ্ণতত্ত্ব কর্ম্মান্তর্গত নহে"। যাহা স্বরাট—যাহা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র—যাহা একমাত্র স্বেচ্ছাময়, তাহা কর্ম্মের অধীন হইতে পারে না। গৌড়ীয়-দর্শন এই চরম সত্য কথা—পরম সত্যের স্বেচ্ছাময়ত্ব, লীলাময়ত্ব দর্শন করিয়া থাকেন,—"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্ তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যং সূরয়ঃ॥ তেজোবারিমৃদাং

যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥" (ভাঃ ১।১।১)। শ্রীমদ্ভাগত এই গৌড়ীয়-দর্শনের ভাষ্যগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবতে যে নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা কর্ম্মবাদগর্হণকারী কেবলাদ্বৈতবাদমাত্রকে লক্ষ্য করে না। ভক্তির বিচার অবলম্বন না করা পর্য্যন্ত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির জাগতিক ও অসম্যক্ বিচারের হাত হইতে কিছুতেই অবসর পাওয়া যায় না। গৌড়ীয়-দর্শনিক না হওয়া পর্য্যন্ত কুদার্শনিক-বিচারের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া বাস্তব বিচারের পরিপূর্ণ পদবীতে উপনীত হওয়া যায় না। মনোধর্ম্ম ও দেহধর্ম্ম নানা প্রকার ধর্ম্মের আবাহন করিয়াছে। সেই সকল ধর্ম্মের ধারণা ও কর্ত্তব্যতা হৃদয়ে সমারূঢ় থাকা কাল পর্য্যন্ত গৌড়ীয়-দর্শনের অনাবিল সাম্রাজ্যে প্রবেশলাভ ঘটে না। সমস্ত জগৎ যে সকল কথায় ব্যস্ত রহিয়াছে, গৌড়ীয়-দার্শনিক সেই সকল কথার জন্য অধিক সময় দেন না,—"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

শব্দব্রহ্মের নিত্যারাধনাই কর্ত্তব্য—একমাত্র স্ফোটাকারে শব্দরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন যে অদ্বয়জ্ঞান—স্বতঃসিদ্ধ কথা, সদা তাহার আলোচনা করিতে হইবে। একবার নহে, দুইবার নহে, বিশ্রান্ত নহে, প্রতিহতভাবে নহে, নিত্যকাল অবিশ্রান্ত, অপ্রতিহতভাবে সেই স্ফোটব্রহ্মের—ভগবন্নামের আলোচনা করিতে হইবে—সর্ব্বেন্দ্রিয়ে নৃত্য করাইতে হইবে।

লীলা প্রবেশ—সেই শব্দ হৃদয়-কর্ণকে রসযুক্ত করে। অসাধুর সঙ্গে বা নিজে নিজে কিম্বা অন্যমনস্ক হইলে হৃদয়-কর্ণ রসযুক্ত হয় না। স্বরূপোপলব্ধিক্রমে সেবোন্মুখ কর্ণে সাধুর প্রসঙ্গযোগে হৃৎকর্ণ রসযুক্ত হয়। সাধুর সঙ্গ আরম্ভ করিলেন যাঁহারা, তাঁহারা অন্য কার্য্যে সময় দিতে পারেন না, সর্ব্ব-চিদিন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশকে আকর্ষণ করেন এবং নিজেও প্রকৃতির বাস্তব-বিষয় অপ্রাকৃত হৃষীকেশের আকর্ষণে আকৃষ্ট হন, ইহাই হইল - লীলায় প্রবেশ। 'সাধুসঙ্গই মূল'—মুক্তির পথে আবদ্ধ থাকিবার যে বিচার-প্রণালী, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া - কাল্পনিক মুক্তি—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া পরম মুক্ত-গণের উপাস্য লীলাপুরুষোত্তমের নাম-রূপ-গুণ-লীলায় প্রবেশ ঘটে সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে। তখন আর কর্ত্তৃসত্তাগত বা কর্ম্মসত্তাগত বিচারে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় না।

'শ্রদ্ধা' শব্দে—নির্ভরতা। জড়জগতের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান যাহা সত্য বলিয়া স্থির করিয়া দিয়াছে, তাহাতে নির্ভর করিয়া 'কর্ম্মবীর' বলিয়া যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন, তাঁহাদের সেই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান পরমুহূর্ত্তেই তাঁহাদিগের ছলনা করে। Phenomena তে যদি শ্রদ্ধা করি, তাহা হইলে তাহাতে কেবল কর্ম্মালানে বদ্ধ হইব। যখনই আমাদের এইরূপ শ্রেয়ো বিচার হয়—"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" তখনই শ্রুতিগত শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি আমাদের অধিগত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় দ্বারা—চক্ষু-নাসা-দ্বারা—মানসিক পর্য্যালোচনা

দ্বারা শব্দের যে অর্থ-বিচার, তাহা অচিদ্‌বিলাস। ঐসকল ইন্দ্রিয়-পরিচালনা—ভোগ মাত্র। বর্হির্জ্জগতের অর্থ আমাদিগকে শ্রৌতপথ হইতে বিচলিত করে—বাস্তব সত্য হইতে ভ্রষ্ট করে ; সে প্রণালীতে আমরা পরমেশ্বরের সন্ধান পাই না। ভূতাকাশের শব্দ স্ফোটাকার ধারণ করিয়াছে দেখিয়া সেই জিনিষটাকে যদি বলি 'ব্রহ্ম', তাহা হইলে সেইরূপ ধরণের Aualogy draw (সাদৃশ্য অনুমান) করিয়া সত্যবিষয়ের অভিজ্ঞান নাও হইতে পারে। কর্ম্মের বিচার কখনই সুষ্ঠু নহে। জ্ঞানও—খণ্ডজ্ঞান ও অখণ্ডজ্ঞান ; সমগ্র জ্ঞান নহে। কর্ম্মত্যাগ না করিলে জ্ঞানে প্রবেশ হয় না ; আবার জ্ঞানের দ্বারা অতন্নিরসনই হইতে পারে। কিন্তু ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে জীবের সেবাপথ আবিষ্কৃত হয়। অতন্নিরসনে 'তৎ' নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই তদ্বস্তু যখন আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন, তখনই সেই স্ফোটাকার 'ওঁতৎসৎ' এর স্বরূপ আমাদের নির্ম্মল চেতনবৃত্তিতে প্রকাশিত হয়,—"যাবানহংযথা-ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ"॥ ভগবানের কৃপা হইলে তিনি শব্দরূপে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি রূপধৃক্‌, গুণময়, লীলাময়, পরিজনপরিবেষ্টিত, তাঁহার ধাম আছে, এই জগৎ তাঁহারই নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পারকরবৈশিষ্ট্যের বিকৃত হেয় প্রতিফলন। সেই শ্রীহরিই কৃপা করিয়া—'তিনি কিরূপ আকারের হরি, কি রকম রংএর হরি',—সকলই চেতনের বৃত্তিতে প্রকাশিত করিয়া দেন।

গৌড়ীয়-দর্শনে পূর্ণবস্তু দর্শন করা যায়, আর অগৌড়ীয়-

দর্শনে বিকৃত, অসম্যক্ আংশিক দর্শনের প্রচেষ্টা আছে। গৌড়ীয়-দর্শনে নিত্য-দর্শনীয় বস্তুকে আমরা ভোগ্য বলিয়া জানি না। ভোক্তা—কর্ত্তৃত্বাভিমানে ব্যস্ত। কর্ত্তৃত্বাভিমান লইয়া যে-সকল দর্শনের প্রচেষ্টা, তাহাতে ভগবদ্দর্শন হয় না। শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত-বিচারে আমরা বিবর্ত্তবাদ ছাড়িয়া দিতে পারি। নির্ব্বিশেষ বিচারটা কিছু খারাপ নয়, কারণ, জড় বিশেষটা—পৌত্তলিকতা। জড়বিশেষরহিত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু জড়বিশেষরহিত অবস্থাটাই শেষ বা চরম কথা নহে। জড়বিশেষকে অতিক্রম করিয়া নিত্য চিদ্-বিশেষের রাজ্যে উপনীত হওয়াই—চেতনের স্বভাবে আগমন।

গৌড়ীয়-দর্শনে সর্ব্ব-সমন্বয়ঃ—গৌড়ীয়-দর্শন একদেশ-দর্শী জড়সাকার-বাদীকে সমর্থন করেন না, কিম্বা একদেশদর্শী নির্গুণবাদীকেও প্রশ্রয় দেন না। গৌড়ীয়-দর্শনের সাকারবাদ জড়সাকারবাদ নহে; কিন্তু গৌড়ীয়-দর্শন জড়সাকারবাদ নিরাস করিয়া অচিবিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন সচ্চিদানন্দবিগ্রহের নিরাকার আকার বা সূক্ষ্ম ভূতাকাশময় আকার কল্পনা করিয়া দ্বিতীয় প্রকার কপটতাময় জড়সাকারবাদরূপ ব্যুৎপরস্ত বা পাপের আবহান করেন না, কিম্বা অবিচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরের পারমৈশ্বর্য্যকে মানবীয় মস্তিষ্কের বা মনোধর্ম্মের ছাঁচে ঢালিয়া অপরাধময় আকার কল্পনা করিতে ধাবিত হন না, অথবা তথাকথিত নির্গুণবাদ আবাহনের নামে ত্রিগুণাতীত শুদ্ধ-সত্ত্বতনু কল্যাণবারিধিকে মানবীয় অকল্যাণময় চিন্তাস্রোতের দ্বারা বিচার করিয়া পরমেশ্বরকে শূন্যবাদের যূপকাষ্ঠে বলি

দিবার পাষণ্ডতাও করেন না। গৌড়ীয়-দর্শন চিদ্‌বিশেষ বা চিৎসাকারবাদ স্বীকার করেন। জড়সাকারবাদকে নিরাস করায় গৌড়ীয়-দর্শনে 'অতন্নিরসন' নামক নিরাকারবাদেরও সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু নিরাকারবাদের একদেশদর্শিতা ও হেয়তা নাই। গৌড়ীয়-দর্শন মিশ্রসত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই প্রাকৃত গুণসমূহে পূর্ণচেতন পরমেশ্বরের আরোপ করেন না বলিয়া এবং পরমেশ্বরকে শুদ্ধসত্ত্বতনু অখিল কল্যাণনিলয় বিচার করেন বলিয়া নির্গুণবাদেরও প্রকৃত তাৎপর্য্য গৌড়ীয়-দর্শনেই সমন্বিত হইয়াছে। যাঁহারা 'সাকারবাদ', 'নিরাকারবাদ' বা 'নির্গুণবাদ' কথাগুলি লইয়া মারামারি করিতেছেন, তাঁহারা যদি গৌড়ীয়-দর্শনের সুসম্যক্ বিচার পরিদর্শন করেন, তাহা হইলে ঐরূপ একদেশ-দর্শিতা ও সাম্প্রদায়িক বিবাদ হইতে নিরস্ত হইতে পারেন।

শ্রবণানুগ্রহে দর্শন—স্ফোট কাহাকে লক্ষ্য করিতেছে—কোন্ আকারকে লক্ষ্য করিতেছে? স্ফোট যখন স্ফুটিত, অভিব্যক্ত হয়, তখন সেই অভিব্যক্তি বা স্ফোটের লক্ষীভূত নাম-রূপ-গুণ-লীলার অভিজ্ঞানকে 'দর্শন' বলি। শ্রবণানুগ্রহে যখন সেই অভিজ্ঞানটী আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই তাহাকে 'দর্শন' বলিতে পারি, এটা যেন বালকদিগের kindergarden system এর মত। সাধুর মুখে স্ফোটের নাম-রূপ-গুণ-লীলা অর্থাৎ নামের নাম, নামের রূপ, নামের গুণ, নামের লীলার কথা শ্রবণকারীই স্ফোটবাদের যথার্থ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ। জীবস্বরূপে জ্ঞানস্বরূপতা

ও জ্ঞাতৃস্বরূপতা—উভয়ই আছে। যে-কাল পর্য্যন্ত আনন্দধর্ম্ম জীবে প্রস্ফুটিত না হয়, ততদিনই বদ্ধজীবাভিমান থাকে। সাধুর সঙ্গক্রমে ভগবানের কথা শ্রবণ করিবার সুযোগ যখন হয়, তখনই জীব বুঝিতে পারে, তাহাতে আনন্দ-ধর্ম্ম আছে। অপ্রাকৃত আনন্দানুসন্ধানে বিরত হইয়া জীব জ্ঞানপথে প্রধাবিত হয়,—"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্। স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ অক্ষজ চেষ্টা লইয়া বহির্জ্জগতের যে সমস্ত কথা আছে, তাহাকে ভূমিকা করিয়া অভিজ্ঞতার সিঁড়ি প্রস্তুত করিতে করিতে যদি রাবণের মত স্বর্গে উঠিতে থাকি, তাহা হইলে বাস্তব আনন্দলাভের সৌভাগ্য হইবে না—যে জিনিষটী আমাদের আত্মার অভীষ্ট, সেই জিনিষটি পাইব না। বহির্জ্জগৎ দর্শন করিয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সাহায্যে যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, সেই অভিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়া কখনও অধোক্ষজ-জ্ঞান-লাভের সম্ভাবনা থাকে না। যখন আমরা জাগতিক যাবতায় অভিজ্ঞতার অভিমান পরিত্যাগ করি, তখনই অধোক্ষজজ্ঞান জানিতে পারি। বহু বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি—সমস্ত পৃথিবী দর্শন করিয়াছি—লোককে অন্য প্রকার বুঝাইয়া দিতে পারি—এরূপ বিচার লইয়া পূর্ণজ্ঞান, শুদ্ধজ্ঞান বা মুক্তা-বস্থার জ্ঞান আমরা কখনই পাইতে পারি না। যেমন তলবকারোপনিষৎ বলিতেছেন,—নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ॥ অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম॥

দ্বিতীয় ক্রম

অনুগতি—চিন্ময় বিস্ময়রতি হইতে জাত চিন্ময় অদ্ভুতরসের আশ্রয় স্বরূপ শ্রীকূর্ম্মদেবের নিঃশ্বাস হইতে স্ফোটসংরক্ষিত হয় অর্থাৎ আধ্যক্ষিকতা-দ্বারা শুদ্ধ স্ফোটজ্ঞানেরঅপব্যবহার হইলে শ্রীকূর্ম্মদেব তাহা হইতে রক্ষা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহারে শ্রীসূত গোস্বামিপাদ দ্বাদশ রসের সর্ব্বরসেই বর্ত্তমান অদ্ভুত-রসের দৈবত শ্রীকূর্ম্মদেবের কৃপাদশীর্ব্বাদ যে অপ্রাকৃত স্ফোটব্রহ্মের প্রকাশক ও রক্ষকরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন, তদ্রূপ শ্রীলকবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপসংহারেও শ্রীল দাসগোস্বামিপাদের 'শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পবৃক্ষ' হইতে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া সেই পরম-মহানির্ব্বাচ্যতম, অচিন্ত্যাদপি অচিন্ত্য, অদ্ভুত হইতেও অদ্ভুত রসের অধিদেব শ্রীকূর্ম্মদেবরূপে আত্ম-প্রকাশকারী 'অদ্ভূত বদান্য' শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন-প্রকাশ স্ফোটের পরিপূর্ণতম প্রকাশপরাকাষ্ঠারূপে ইঙ্গিত প্রদান করিয়া জগজ্জীবকে আহ্বান করিয়াছেন। রসস্বরূপ ও রসরাজ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের রসাস্বাদ কামনারও বিস্ময়োৎপাদক যে অপ্রাকৃত রসস্ফোটের অভিব্যক্তি প্রকাশক ও আস্বাদক যে রস-চমৎকারিতা-বিশেষের পরাকাষ্ঠা অবিষ্কার ও বিস্ফারক বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ কমঠাকৃতি শ্রীগৌর-সুন্দরের মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য মহিমা গান করিয়াছেন। শ্রীকূর্ম্মদেবের কৃপা বৈচিত্র্য

সকলের পক্ষে অগম্য। তাঁহার শ্বাসবায়ুরাশি সংস্কার বশতঃ সেই অপ্রাকৃত বস্তুশক্তির স্ফূরণ হইলেও তৎকৃপায় তাহা জীবের উপযোগী হইতে পারে। তিনি যখন নিশ্বাস ফেলেন তাহাতে অপ্রাকৃত কৃষ্ণ সেবোপযোগী বস্তু ও বৃত্তি স্ফূটিত হইয়া জীবের লভ্য হয়, আবার ফিরিয়া যায়। সেই স্ফোটোৎপাদক ব্যাপার নিত্য। তদ্দ্বারা জীবের স্ফোটজ্ঞান ও তত্ত্ব উপলব্ধি হইতে পারে। এই প্রকারে শ্রীকূর্ম্মদেবের শ্বাস-প্রশ্বাস আমাদের মঙ্গল বিধান করিতেছেন। শ্রীকূর্ম্মদেবের শ্বাসানিল আমাদের রক্ষা ও কৃপা না করিলে জাগতিক সৌভাগ্য লাভ করিয়া সেবা-বিমুখ হইয়া স্ফোটের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া যাই, সেইটি আমাদের মহা অনর্থের কথা।

বিষ্ণুর স্ফোট প্রকাশেচ্ছা হইতে সমুদ্র-মন্থনের ব্যবস্থা হইল। তদ্দ্বারা দেব ও অসুর উভয় ভূতসর্গের অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যবস্থা আছে। দেবতারা দৈত্যগণের সহিত কৌশলে সন্ধি স্থাপন করিয়া দেবদানব মিলিয়া মন্দরপর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড ওবাসুকীকে বন্ধন রজ্জু করিয়া ক্ষীরসাগর মন্থন করিতে সঙ্কল্প করিয়া মন্দর পর্ব্বত আনিতে গেলেন। গুরুভার বহনে অক্ষম হইয়া অনেক দেব দানবের প্রাণ নষ্ট হইল। তখন পরমকারুণিক ভগবান্ কৃপাদৃষ্টি দ্বারা স্ফোট-শক্তি সঞ্চারিত করিয়া মৃতগণকে পুনর্জীবিত করিয় একহস্তে অবলীলাক্রমে স্ফোটশক্তিদ্বারা মন্দরপর্ব্বতকে সমুদ্রে স্থাপন করিলেন। পর্ব্বত আধারশূন্য হওয়ায় নিম্নগামী হইয়া সলিল-মগ্ন হইতে আরম্ভ করিলে কূর্ম্মদেব স্ফোটের ধারণীশক্তি প্রকাশে নিজ পৃষ্ঠে পর্ব্বত ধারণ

করিলেন। প্রথমেই স্ফোটের জড় সন্ধিনী-দ্রব্যরূপে হলাহল বিষ, ধ্বংসাত্মক শঙ্কর্ষণাবতার রুদ্রের প্রকাশরূপ উঠিল। তাহা হইতে ধ্বংসকার্য্য হইতে নিরস্ত হইবার জন্য তদীয় মূল অংশী সদাশিবের শরণাগত হইলেন। সদাশিব তখন স্ফোটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশরূপ অচ্যুত, অনন্ত, গোবিন্দাদি শ্রেষ্ঠ ভগবন্নামের সহিত আনুষ্টুপাদি ছন্দ ও প্রণব সংযুক্ত করিয়া শ্রীনাম প্রভুকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া শ্রীনামের অপ্রাকৃত রূপ প্রকাশক নীলকণ্ঠ নাম ধারণ করিয়া তৎপ্রভাবে বিষের বীর্য্যকে পরাভূত করিয়াছিলেন। বিষ তাঁহার নামস্ফোটের শক্তিতে কোনপ্রকার জড়ীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তাহা নীলকণ্ঠেই সম্ভব। স্ফোটের প্রকাশ নীলকণ্ঠ। তদ্ব্যতীত কল্পনা করিয়া নামের কৃপালাভ করিয়াছি ভাবিয়া বিষপান করিতে গেলে মৃত্যুই অবশ্যম্ভাবী। শ্রীকূর্ম্মদেবের শ্বাসানিল সম্ভূত বিস্ফারিত স্ফোট হইতে বহিরঙ্গা মায়াকৃত কয়েকটি দ্রব্য উত্থিত হইল। ঐরাবত, পারিজাত, অপ্সরা প্রভৃতি ইন্দ্র গ্রহণ করিলেন। উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব বলিকে প্রদান করিলেন। বারুণি-নাম্নী সুরা অসুরেরা গ্রহণ করিল। সুরভী গাভী ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যজ্ঞের হবির নিমিত্ত উহা গ্রহণ করিলেন। কৌস্তুভমণি ও লক্ষ্মীদেবীকে ভগবান্ বিষ্ণু গ্রহণ করিলেন। এ লক্ষ্মী চঞ্চলা, বিষ্ণু গ্রহণ করিয়া তদীয়স্বরূপশক্তির সেবায় নিযুক্ত করিলেন। পরিশেষে বিষ্ণু-অংশ-সম্ভূত-ধন্বন্তরী অমৃত কলস হস্তে লইয়া উঠিলেন। দেব দানব মধ্যে অমৃত লইয়া কলহ উপস্থিত হইলে ভগবান্ মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া অসুর

গণকে বঞ্চনা করিয়া দেবগণকে অমৃত বণ্টন করিয়া দিলেন। তাঁহাতে বিস্ময়রতি ও অদ্ভুত-রসের উদয় দেখা দিল। বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ত্তি বিস্ময় রতির কারণ। স্ফোটের বিকৃত সাধন জন্য বিষের ক্রিয়া বৃশ্চিক, সর্প, দন্দশূকাদি লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইল। ইহা মায়িক তমোগুণের সহিত বিজড়িত স্ফোটের জড়ীয় প্রকাশ। অসুরগণের প্রতি স্ফোটের রাজসিক ক্রিয়া এবং দেবগণের প্রতি স্ফোটের মায়িক সাত্ত্বিক ক্রিয়ার প্রকাশ। রাহু কেতুতে স্ফোটের সত্ত্ব ও রজো গুণের মিশ্র প্রকাশ। যে স্থানে শ্রীলক্ষ্মী পূজিতা হইয়া জাগতিক রত্নাদি ভোগ প্রদান করেন, তথায় শ্রীলক্ষ্মীদেবীর কপট কৃপা—চঞ্চলা লক্ষ্মীদেবীর কপটকৃপা, চঞ্চলালক্ষ্মীর কার্য্য। কারণ শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শ্রীনারায়ণের সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্যই নাই। অন্য কার্য্যগুলি ছায়াশক্তির কার্য্য। বিষ্ণু কামদেব, তাঁহার কাছ থেকে কিছু আকাঙ্ক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু বিমুখ ব্যক্তিগণের তাহাতেই প্রয়াস। রামচন্দ্র একটি পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাবণ তাঁহাকেও গ্রহণের জন্য সচেষ্ট ছিল। সেবা-বিমুখতা হইতে লক্ষ্মীহরণ পিপাসা আসে। তাহা হইতে রক্ষাকর্ত্তা শ্রীকূর্ম্মদেবের শ্বাসানিল স্ফূটিত শুদ্ধ স্ফোটের প্রকাশ। শ্রীকূর্ম্মদেবের লীলায় অদ্ভুতরসের পরিচয় পাওয়া যায়। কূর্ম্মদেব দেবতাদিগের ভোগের ইন্ধন যোগাইতেছেন। এটি সাত্ত্বিক প্রবৃত্তিকে কিছু স্বীকার করিয়া তদুপরি তাহাকে সংশোধিত করিয়া নির্গুণ বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক স্ফোটে প্রকৃত কৃপা করিবার উদ্দেশ্যেই। তাঁহার ঈষৎ কৃপাজন্য রক্ষিত দেবগণ

যাহা ভোগ করেন, সেটা স্বীকার করেন ভগবৎসেবাকে মুখ্য জ্ঞান করিয়া। দেবগণ লক্ষ্মীকে দেব-পূজ্যা নারায়ণভোগ্যা-জ্ঞানে নারায়ণকেই দান করিয়াছিলেন।

বেদরূপা স্ফোটের সম্বিৎ শক্তির প্রকাশ কূর্ম্মদেবের নিশ্বাস হইতে রক্ষিত। অতএব বহিরঙ্গার স্ফোটের ক্রিয়া সন্ধিনী, সম্বিৎ অর্থাৎ জড়ীয় জ্ঞান বিজ্ঞানাদি এবং লক্ষ্মীরূপা হ্লাদিনীর বহিঃপ্রকাশ সকল শ্রীকূর্ম্মদেবের স্ফোটের বঞ্চনাময়ী কপট কৃপাজাত বলিয়াই জানিতে হইবে।

স্ফোটের স্বাংশে প্রকাশ ঃ—মহাসঙ্কর্ষনাংশ প্রথম পুরুষাবতার কারণোদকশায়ী ভগবান্ মহাবিষ্ণুর স্ফোটের দ্বিবিধ প্রকাশ লক্ষিত হয় একটী নিমিত্তাংশ ও অপরটী উপদানাংশ তদ্দ্বারা নিজ বহিরঙ্গা মায়া বিরচিত পঞ্চভুত দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নির্ম্মাণ কার্য্যরূপ ঈক্ষণাদিরূপ মায়াকে ক্রিয়াবতী করেন এবং উপাদানাংশ দ্বারা সমস্ত সত্ত্বা প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় পুরুষাবতার প্রদ্যুম্নাংশ গর্ব্ভোদকশায়ী সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডগত অর্থাৎ সমষ্টি জীব বা হিরণ্যগর্ভের অন্তর্য্যামীতে স্ফোটের প্রকাশ দ্বারা বিশ্বের পালন, সৃষ্টি ও সংহারের শক্তিরূপ আবির্ভূত বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র—এই গুণাবতারত্রয় প্রকট করেন। তাঁহাদের মধ্যে সত্ত্ববিগ্রহ বিষ্ণু হইতেই শুভ ফলের উদয় হয়। ব্রহ্মা ও শিব হইতে হয় না। নিয়ামকতারূপে স্ফোটের অপ্রাকৃত গুণের সহিত সম্বন্ধকে 'যোগ' বলে। অতএব বিষ্ণু সেই গুণত্রয়ের সহিত কখনই যুক্ত

হন না। বিষ্ণুর দ্বারা জগৎ-পালন কার্য্য স্ফোটের প্রকাশ। ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য উপভোগকারী সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভ এবং সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত ও বেদ প্রচারার্থ ব্রহ্মাদ্বয় স্ফোটের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। শ্রীরুদ্র—অজৈকপাৎ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত—এই একাদশ ব্যূহযুক্ত এবং তাঁহারঁ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও সোমযাজী এই অষ্টমূর্ত্তি। কোন কল্পে বিধির ললাট হইতে, কোন কল্পে বিষ্ণুর ললাট হইতে এবং কল্পাবসানে সঙ্কর্ষণ হইতে কালাগ্নিরুদ্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইঁহারা স্ফোটের বিস্ফারিত শক্তি প্রভাবে সংহার কার্য্য করেন। বায়ু-পুরাণাদিতে বৈকুণ্ঠের অন্তর্বর্ত্তি শিবলোকে সর্ব্বকারণ স্বরূপও তমোগুণের সম্বন্ধ রহিত যে সদাশিব নাম্নী শিবমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তিনি স্বয়ং ভগবানের (শ্রীকৃষ্ণের) বিলাস। "সেই রমাশক্তি যিনি ভগবৎপ্রিয়া ও ভগবদ্‌বশবর্ত্তিনী স্বপ্রকাশরূপা স্বরূপভূতা ভগবচ্ছক্তি ; সৃষ্টিকালে শ্রীকৃষ্ণাংশ সংঙ্কর্ষণের স্বাংশ জ্যোতিরূপ কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন স্থানীয় জ্যোতিরূপ সনাতন যে অংশ, তিনিই ভগবান্ শম্ভু (শম্ভুরূপ ভগবল্লিঙ্গ অর্থাৎ প্রকটিত চিহ্ন বিশেষ) বলিয়া কথিত। সেই লিঙ্গ নিয়তির বশীভূত প্রপঞ্চোৎ-পাদকাংশ (উপাদান কারণ)। স্ফোটের নিয়তিশক্তি হইতে যে প্রসবিনী—শক্তির উদয় হয়, তাহাই অপরাশক্তির যোনিরূপা মায়ার স্বরূপ। সৃষ্টির সময় উপস্থিত হইলে সেই

গোবিন্দের অংশ কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের সৃষ্টির জন্য মায়ার প্রতি দর্শনরূপ ক্রিয়া দ্বারা প্রপঞ্চ ও জীবগণের সহিত মহত্তত্ত্বরূপ বীজ (কামবীজ) মায়াতে প্রদান করেন। তদুভয় সংযোগই হরির মহত্তত্ত্বরূপ প্রতিফলিত কামবীজ—এই কামবীজ স্ফোটোত্থ গোলোকস্থ বিশুদ্ধ চিন্ময় কামবীজের মায়াতে প্রতিফলিত ছায়াশক্তিগত কাল্যাদি-শক্তির-কামবীজ। "লীলাবতারে প্রকাশিত" স্ফোটের প্রকাশ—শ্রীচতুঃসন—গর্ভোদকশায়ী পুরুষ ব্রহ্মা হইতে শুদ্ধজ্ঞান ও ভক্তির প্রচারার্থ স্ফোটশক্তি সহ অবতীর্থ হন।

শ্রীনারদ :—সেই পুরুষ ঋষিস্বর্গলাভপূর্ব্বক শ্রীনারদত্ব প্রাপ্ত হইয়া, যাহা হইতে কর্ম্মের বন্ধহারিত্ব হয়, তাদৃশ সাত্বত-তন্ত্র অর্থাৎ 'নারদপঞ্চরাত্র' নামক আগম শাস্ত্ররূপ স্ফোটের সম্বিদ্ প্রকাশ প্রণয়ন করেন।

শ্রীবরাহ :—এই বিশ্বের মঙ্গলের নিনিত্ত রসাতলগতা পৃথিবীর উদ্ধারার্থে ভগবান্ যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরি স্ফোটশক্তি গ্রহণ করিয়া বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মকল্পে প্রথম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে এবং পরে ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ ও হিরণ্যাক্ষকে বধ নিমিত্ত জল হইতে আবির্ভূত হন। নৃবরাহ, যজ্ঞবরাহমূর্ত্তি—তিনি স্ফোটের যজ্ঞবিধির প্রবর্ত্তক। পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণ ও শ্বেত বরাহ মূর্ত্তি।

শ্রীমৎস্য :—সেই পুরুষ (ভগবান্) চাক্ষুষ মন্বন্তরের অবসানে সমুদ্র প্লাবনে মৎস্যরূপে আবির্ভূত হইয়া পৃথ্বিময়ী

নৌকাতে ভাবী বৈবস্বত মনু রাজা সত্যব্রতকে আরোহণ করাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন এবং স্ফোটোদ্গীত বেদমার্গ গ্রহণ করিয়া ভয়ানক প্রলয় জলে বিহার করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের অবসানে হয়গ্রীব নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া স্ফোটের অক্ষরাত্মক প্রকাশরূপ বেদ সকল আহরণ করেন। ইনিও দুইবার প্রকটিত হন।

শ্রীযজ্ঞঃ—সেই পুরুষ রুচি হইতে আকুতির গর্ভে যজ্ঞরূপে আবির্ভূত হইয়া স্বীয় পুত্র যমাদি দেবগণের সহিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন। ইনি স্ফোটের মহার্ত্তি-হরণ শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীনর নারায়ণঃ—মনের বিষয়োন্মুখতা বিনাশপূর্ব্বক পরব্রহ্মে নিষ্ঠাকারী তপোনুষ্ঠান প্রদানরূপ স্ফোটের প্রকাশক। "শ্রীকপিলদেব"—বিবেকপূর্ব্বক তত্ত্ববর্গের বিশেষ নির্ণয়ার্থ সর্ব্ববেদার্থ উপবর্দ্ধিত সাঙ্খ্যতত্ত্ব রূপ স্ফোটের তত্ত্ব প্রকাশ করেন।

শ্রীদত্তাত্রেয়ঃ—ভোগ ও মোক্ষরূপ যোগসিদ্ধি প্রদান-কারী স্ফোটের শক্তি প্রকাশক। "শ্রীহয়শীর্ষা"—সর্ব্ববেদ-মূর্ত্তি ও বেদবিহিত যজ্ঞধারী, যজ্ঞে যজনীয় দেবতাগণের আত্মা। তাঁহার শ্বাসবায়ু পরিত্যাগ করিলে তাঁহার নাশপুট হইতে স্ফোট স্ফুটিত মনোরম বেদবাণী সকলের আবির্ভাব হইয়াছিল। বাগীশ্বরীপতি এই হয়গ্রীব ব্রহ্মার যজ্ঞাগ্নি হইতে আবির্ভূত হইয়া মধু ও কৈটভ নামক বেদহরণকারী দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিয়া পুনর্ব্বার বেদ সকলকে প্রত্যানয়ন

করেন। "শ্রীহংস"—স্ফোটের প্রকাশক ভক্তি ও তদ্বিষয়ের উপদেশ এবং জীবতত্ত্বের স্বরূপ প্রকাশক জ্ঞানযোগ প্রকাশ করেন। "শ্রীধ্রুবপ্রিয়"—ইনিই :পৃশ্নিগর্ভ অবতার, স্ফোটের রস প্রকাশে বাৎসল্য রসের কিঞ্চিৎ প্রকাশক। "শ্রীঋষভ,"—স্ফোটের পারমহংসাশ্রম বিচার প্রকাশকারী। "পৃথু"—স্ফোটের পালনীশক্তি প্রকাশক।

ধন্বন্তরী ও মোহিনী:—স্ফোটের সুধা প্রকাশকারী আয়ুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তক ও অসুর মোহিনী বৃত্তি প্রকাশক অবতার দ্বয়। "শ্রীব্যাস"—স্ফোটের সম্বিৎ শক্তির আবিষ্ট অবতার পরে শ্রীনারদ কৃপায় স্ফোটের হ্লাদিনীআবিষ্ট সম্বিতের আন্তর-স্ফোটের উপলব্ধি করিয়া সহজ সমাধিলব্ধ অবস্থায় স্ফোটের বিক্রম উপলব্ধি করিয়া বহিঃস্ফোটের প্রকাশক। "শ্রীবামন"—বলির নিকট হইতে দ্বিপাদ বিভূতি গ্রহণ করিয়া স্ফোটের ত্রিপাদবিভূতি শরণাগতির দ্বারা প্রদর্শন প্রকাশক ও শিক্ষক।

মন্বন্তরাবতার:—১। যজ্ঞ, ২। বিভু, ৩। সত্যসেন, ৪। হরি, ৫। বৈকুণ্ঠ, ৬। অজিত, ৭। বামন, ৮। সার্ব্বভৌম, ৯। ঋষভ, ১০। বিষ্বক্‌সেন, ১১। ধর্ম্মসেতু, ১২। সুধামা, ১৩। যোগেশ্বর, ১৪। বৃহদ্ভানু ইহারা স্ফোটের পালনীশক্তি দ্বারা বিভিন্ন সময়োপযোগী শক্তি প্রকাশ দ্বারা মন্বন্তর কাল পালন করেন।

দশাবতারে স্ফোটের রস প্রকাশ:

১। মৎস্যদেব চিণ্ময়ী জুগুপ্সারতি হইতে জাত চিণ্ময়

বীভৎসরসের আশ্রয়স্বরূপ। ২। কূর্ম্মদেব চিণ্ময়ী বিস্ময়রতি হইতে জাত চিন্ময় অদ্ভুতরসের আশ্রয়স্বরূপ। ৩। বরাহদেব চিণ্ময়ী ভয়রতি হইতে জাত চিণ্ময় ভয়ানক রসের প্রকাশমূর্ত্তি। ৪। নৃসিংহদেব চিণ্ময়ী বাৎসল্যরতি হইতে জাত চিণ্ময় বাৎসল্যরসের প্রকাশমূর্ত্তি। ৫। বামনদেব চিণ্ময়ী সখ্যরতি হইতে জাত চিন্ময় সখ্যরসের প্রকাশমূর্ত্তি। ৬। পরশুরাম চিন্ময়ী ক্রোধরতি হইতে জাত চিণ্ময় রৌদ্র-রসের প্রাকাশমূর্ত্তি। ৭। শ্রীরামচন্দ্র চিন্ময়ী শোকরতি হইতে জাত চিন্ময় করুণরসের প্রকাশমূর্ত্তি। ৮। শ্রীবলদেব চিণ্ময়ী হাস্যরতি হইতে জাত চিণ্ময় হাস্য রসের প্রাকাশমূর্ত্তি। ৯। বুদ্ধদেব চিন্ময়ী শান্ত রতি হইতে জাত চিণ্ময় শান্তরসের প্রকাশমূর্ত্তি। ১০। কল্কিদেব চিণ্ময়ী উৎসাহ রতি হইতে জাত চিণ্ময় বীররসের প্রকাশমূর্ত্তি। এখানে স্ফোটের বিশুদ্ধ রসপ্রকাশে বিষয়াশ্রয়ের বিপর্য্যায় দেখা যায়, কিন্তু অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণে বিষয়াশ্রয়ের কোন প্রকার বিপর্য্যায় না থাকায় সুষ্ঠুভাবে রসবৈচিত্রী প্রকাশিত। তন্মধ্যে প্রকাশ তারতম্য বিচারে আশ্রয়ের ভাবকে লক্ষ্য করিয়া প্রকাশ তারতম্য লক্ষিত হয়।

বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণে আড়াইটী মূখ্য রসের প্রকাশ থাকায় তথা হইতে প্রকাশিত স্ফোটের নামাবতারেও আড়াইটী রস প্রকাশিত হইয়া সত্য-যুগের তারকব্রহ্ম নামরূপে প্রকটিত হন যথা—“নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাক্ষরাঃ। নারায়ণপরা মুক্তির্নারায়ণপরা

গতিঃ। ইহাতে স্ফোটের বহিঃস্ফোট প্রকাশক বেদ ও অক্ষর নারায়ণপর এবং তাহার ফলপ্রদায়িনী শক্তি ও মুক্তি ও পরাগতি নারায়ণ পর্য্যন্ত। তথায় ঐশ্বর্য্যগত পরব্রহ্মের এই অবস্থায় শুদ্ধ শান্ত ও কিঞ্চিৎপরিমানে দাস্যের প্রকাশ দেখা যায়। তৎ পরযুগে (ত্রেতায়) "রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন। কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন।।" উক্ত নাম সকলে নারায়ণের বিবিধ বিক্রম সকলের বিষয় সূচিত হইয়াছে। ইহাতে স্ফোটের সম্পূর্ণ দাস্যরস ও কিয়ৎপরিমাণে সখ্যের আভাস প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে স্ফোটের আর একটু বেশী রসের প্রকাশ দ্বাপর যুগের নামে দেখা যায়। "হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে। যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।।" ইহাতে নিরাশ্রিত জনের আশ্রয়রূপ কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিতেছে। ইহাতে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য এই চারিটি রসের প্রবাল্য দৃষ্ট হয়। কলিযুগে সেই স্ফোট পরিপূর্ণরূপে স্ফুরিত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা মাধুর্য্যপর নাম-মন্ত্ররূপে প্রকাশিত হইয়াছে— "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" ইহাতে প্রার্থনা নাই। মমতাযুক্ত সমস্ত রসের উদ্দীপকতা দৃষ্ট হয়। স্ফোটের কোন প্রকার বিক্রম বা মুক্তিদাতৃত্বের পরিচয় নাই। কেবল আত্মা পরমাত্মা কর্ত্তৃক স্ফোটশক্তিকর্ত্তৃক কোন প্রেমসূত্রে আকৃষ্ট আছেন, ইহাই মাত্র ব্যক্ত আছে। ইজ্যা, ব্রত, অধ্যায়নাদি সমস্ত স্ফোটের পারমার্থিক অনুশীলন প্রক্রিয়া ইহার অনুগত।

সকল শক্তি, সাধন ও সাধ্যকে ক্রোড়ীভূত করিয়া পরমস্বতন্ত্র-রূপে সর্ব্বোপরি বিরাজমান। গুরূপদেশ, পুনশ্চরণ এবং দেশ কাল পাত্রানুগত কোন প্রকাশ সাধন চেষ্টাকে অপেক্ষা করেন না। বা উক্ত কোন প্রকাশ বিরুদ্ধ ব্যাপারও প্রতিহত করিতে পারে না। জীবের প্রাকৃত দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্বময় নাম-রূপ-গুণ-লীলা অনুভূত হয় না। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া সেই সেই তত্ত্ব জীবের মঙ্গলের জন্য প্রত্যগ্‌ভাবে এই জগতে উদয় করাইয়াছেন। প্রত্যগ্‌ভাবেই চিদ্‌তত্ত্বের স্বপ্রকাশভাব। নামরূপ কলিকা স্বল্প স্ফুট হইতেই কৃষ্ণাদি মনোহর চিন্ময়-রূপ বিকশিত হয়। পুষ্পের সৌরভের ন্যায় স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণসৌরভ অনুভূত হয়। নাম-কুসুম পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে কৃষ্ণের অষ্টকাল চিন্ময় নিত্য-লীলা প্রকৃতির অতীত হইয়াও জগতে উদিত হন। ইহাই জীবের চরম সাধ্য ও সাধনা। ইহাই স্ফোটের চরম প্রস্ফুটিত প্রকাশ।

শ্রীরামচন্দ্রের প্রকাশে রসের সাড়েতিনটীর স্ফুরণ দেখা যায় শান্ত, দাস্য, সখ্য ও গৌরবমিশ্র অসম্প্রকাশিত বাৎসল্য। তথায় নীতির দ্বারা বাৎসল্য রসকে সম্প্রকাশিত হইতে দেয় নাই। তদপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা লীলায় বাৎসল্যের বিষয়াশ্রয়ের বৈপরীত্য ভাবে প্রকাশিত। তথায় সেই বাৎসল্য প্রজাতে আশ্রয়ভক্তিরস রূপে এবং পুত্র-পৌত্রাদিতে প্রশ্রয় ভক্তিরসরূপ ধারণ করিয়াছে। তদপেক্ষা মথুরায় বাৎসল্যরস বিষয়াশ্রয়ের সুষ্ঠু সমাবেশ থাকায় অধিকতর সুষ্ঠু

প্রকাশিত হইলেও বিধিবাধ্যরূপ কারাগারে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে। তথা হইতে ব্রজে সেই রস মধুররসসমন্বিত বিষয়ে পরিপূর্ণতম আশ্রয়ে সমাবিষ্ট হইয়া পরিপূর্ণতম স্ফূটিত হইয়া প্রকাশিত। দ্বারকায় যে মধুর রসের প্রকাশ তাহাতে বৈধীভাবাচ্ছন্ন থাকায় শুদ্ধ মাধুর্য্য প্রকাশক না হওয়াতে দাস্য ও সখ্য রসেরই প্রবল্য লক্ষিত হয়। ব্রজেই মধুর রসের পরিপূর্ণতম প্রকাশ পরাকাষ্ঠার স্ফূর্ত্তি।

ভাঃ ১০।৪৩।১৭ শ্লোকে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণে যে দ্বাদশ রসের প্রকাশের কথা বর্ণিত আছে তাহাতে—মল্লগণের নিকট 'রৌদ্ররসের'। উপস্থিত নরগণ—বিস্ময়রতির 'অদ্ভূতরসের'। যুবতীগণ 'শৃঙ্গাররসের'। শ্রীদামাদি গোপগণ—'সখ্য ও হাস্য রসের'। অসৎরাজগণ—'বীররসের'। দেবকী বসুদেবাদি—'বাৎসল্য ও করুণরসের'। কংসাদি—'ভয়ানক বা ভয় রসের'। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ—'বীভৎস রসের'। যোগিগণ—'শান্ত রসের'। যদুগণ—'দাস্য রসের'। কিন্তু পরিপূর্ণতম প্রকাশ ব্রজে। তন্মধ্যে প্রকাশ পরাকাষ্ঠা তারতম্যে গোকুল, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধাকুণ্ডে সম্প্রকাশিত। স্ফোটের পরিপূর্ণতম প্রকাশ পরাকাষ্ঠা তারতম্য শিরোমণি ও সর্ব্বরসের পরিপূণতম অভিব্যক্তি শ্রীরাধাকুণ্ডেই স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত।

তৃতীয় ক্রম

(পরাবস্থস্বরূপে স্ফোটের প্রকাশ)

শ্রীনৃসিংহ—স্ফোটাধার শ্রীনৃসিংহদেবের হৃদয়ে সম্বিদ্‌-

শক্তিরূপা স্ফোট বিরাজমানা ও শ্রীমুখে বাগাধিষ্ঠাত্রী শ্রীসরস্বতী-দেবী নিত্য বিরাজমানা থাকিয়া স্ফোট বিলাস সেবায় তৎপর। স্ফোটবিলাসবিরোধী যত প্রকার বাধাবিঘ্ন ও প্রতিকূল ভাব-সকল হইতে রক্ষা করিতে তিনি মহাশক্তি সম্পন্ন। শুধু যে তিনি প্রতিকূলভাব সকল বর্জ্জনেই মহাশক্তির প্রকাশ করেন, তাহা নহে; পরন্তু অনুকূলভাবে চেতনের প্রকৃষ্ট-আহ্লাদ প্রদানে ভক্ত-ভগবানের স্ফোটবিলাস সেবায়ও মহাকৃপা প্রসারক। মাতৃচক্র প্রমথন, হিরণ্যকশিপু প্রমথন, মার্জ্জাররূপ-ধারণাদিরূপে ভক্তরক্ষা তৎপর।

শ্রীরামচন্দ্র—স্ফোট বিলাস বিরোধী কামাতুরতা ও নির্ব্বিশেষ বাদ হইতে রক্ষ কুলহন্তা লীলাদ্বারা স্ফোট বিলাস মাহাত্ম্য-প্রকাশক মহাধনুর্ধর অবতার। ধনুর্ব্বানে স্ফোটের শক্ত্যংশ প্রকাশ-দ্বারা স্ফোটের শক্তিবৈচিত্র্য বিস্ফারক। গুরুভার প্রস্তরাদিকেও স্ফোট শক্তিপ্রভাবে জলোপরি ভাসমান ক্ষমতা প্রকাশকারী। সমুদ্রাদি জড়বস্তুর মধ্যেও যে তদধিষ্ঠাত্রীর ক্রিয়া আছে স্ফোট-শক্তিতে তাহারও প্রকাশকারী। নীচ-মনুষ্যজাতিতেও স্ফোটের ভক্তিশক্তি বিস্তারকারী। মনুষ্যেতর বানর পশু-পক্ষীর (সঙ্কুচিত চেতনেও) স্ফোটের ভক্তিশক্তির প্রকাশকারী। জড়ীয় ধনুর্ব্বানে স্ফোটের মন্ত্রশক্তির অদ্ভুত শক্তিমত্তা ও বিভিন্ন মহাশক্তি প্রকাশ ক্ষমতার বিস্ফুরক অবতার। স্ফোটের রস-প্রকাশরূপ স্বরূপস্থ ভাবেরও রসচতুষ্টয়ের শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য (কিঞ্চিৎ) আস্বাদক অবতার। স্ফোটের অপ্রাকৃত

নীতিবাদের সমর্থনে বৈকুণ্ঠের অধোক্ষজ তত্ত্ব অপেক্ষা উন্নতভাব মাধুর্য্যের ও করুণরসের শোকরতির বৈশিষ্ট্য রসপ্রকাশক অবতার।

শ্রীবলদেব—স্ফোটের বল-প্রকাশক মহাশক্তিমানত্ব সন্ধিনীশক্তিমত্তত্ত্ব বিগ্রহ। স্ফোটের অপ্রাকৃত হাস্যরসের বিলাস বিস্ফারক। ব্রহ্মবাদীদিগের ব্রহ্মতত্ত্বে আত্মার লয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাযুজ্যরূপ মোক্ষানুসন্ধানটী নিতান্ত আত্মচৌর্য্য-রূপ দোষবিশেষ; যেহেতু তাহাতে কিছুমাত্র আনন্দ নাই। তাহাতে জীবেরও কোন লাভ নাই এবং ব্রহ্মেরও কোন প্রকার উদ্দেশ্য সাধন হয় না। ঐ মত বিশ্বাস করিতে গেলে সমস্ত সৃজ্য জগৎকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; ব্রহ্মে সম্পূর্ণ উদাসীনতা আরোপ করিয়া তাঁহার সত্তার প্রতি ক্রমশঃ সংশয় উৎপন্ন হয়, গাঢ়রূপে আলোচনা করিলে জীবসত্তার নাস্তিত্ব এবং একটি অমূলক অবিদ্যার কল্পনা করিতে হয় এবং বস্তুতঃ সমস্ত মানব-চেষ্টা ও বিচার নিরর্থক হইয়া পড়ে। ঐ মতটী সময়ে সময়ে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রলম্বাসুররূপে প্রবেশ করত আত্মচৌর্য্যরূপ অনর্থের বিস্তার করে, ইহা স্ফোটের নামভজন-কারীর প্রীতিতত্ত্বের মহাপ্রতিবন্ধক। স্ত্রীলাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশাদিরূপে স্বরূপপ্রকাশকারী। প্রলম্বাসুর শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে মারিবার জন্য কংসরূপ নির্ব্বিশেষ-বাদের সখা-রূপে প্রেরিত হইয়া ভক্ত গোপসখারূপ ধারণ করিয়া ক্রীড়ারত হইয়াছিল। খেলায় হারিয়া বলদেবকে গোপনে কৃষ্ণের অসাক্ষাতে লইয়া মারিবার উদ্দেশে

গোপনীয় স্থানে লইতেছিল। শ্রীবলদেব তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে বধ করেন। প্রলম্বাসুর—কপটতা, ধর্ম্মের নামে গোপনে ব্যাভিচার, অর্থ-সংগ্রহ, কপটতাক্রমে সাধুত্ব প্রচারাদি প্রলম্বাসুরের কৃত্য। অভক্ত প্রলম্বাসুর ভক্তের সজ্জা লইয়া বলদেবকে সংহার করিয়া কংসের উপকার করিতে প্রয়াসী। তাহাতে হাস্যরসের উদয় হয়। যাহার যে ক্ষমতা নাই, তাহা প্রকাশের চেষ্টায় হাস্যরসের উদয় হয়। যাহাদের গুরুত্ব নাই, তাহারা যদি গুরুর আসনে আসীন হইয়া গুরুগিরি করিতে যান, তাহাতে হাস্যরসের উদয় হয়। শ্রীবলদেব সেই সকল (স্বরূপ জ্ঞানবিরোধি) ফোট বিরোধী-ভাব সকলকে কৃপা পূর্ব্বক সংহার করিয়া হাস্য-রসেই শ্রীফোটের প্রকাশ করেন।

ধেনুকাসুর—বৈষ্ণবতত্ত্বে সূক্ষ্মবুদ্ধির নিতান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা সম্প্রদায় কল্পনা করিয়া অখণ্ড বৈষ্ণবত্বকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রচার করেন তাঁহারা স্থূলবুদ্ধি। ঐ স্থূলবুদ্ধি গর্দ্দভস্বরূপ ধেনুকাসুর। মিষ্ট তাল ফল গর্দ্দভ স্বয়ং খাইতে পারে না, অথচ অপর লোকে খাইবে—তাহাতেও বিরোধ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের পূর্ব্বাচার্য্য মহোদয়গণ কর্ত্তৃক যে সকল পরমার্থ-গ্রন্থ রচিত আছে, স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহা নিজে বুঝিতে পারে না এবং অপরকে দেখিতে দেয় না। বিশেষতঃ ভারবাহী বৈধ, ভক্ত সকল স্থূলবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া উচ্চাধিকারের যত্ন পান না। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম অনন্ত-উন্নতি

গর্ভ থাকায়, বৈধকাণ্ডে যাঁহারা আবদ্ধ থাকিয়া রাগতত্ত্বের অনুভব করিতে যত্ন না পান, তাঁহারা সামান্য কর্ম্মকাণ্ড প্রিয় জনগণের তুল্য হইয়া পড়েন। অতএব গর্দ্দভরূপী ধেনুকাসুর বধ না হইলে বৈষ্ণবতত্ত্বের উন্নতি হয় না। অনেক দুর্ব্বল-চিত্ত পুরুষেরা বিধিমার্গ ত্যাগ করত রাগমার্গে প্রবেশ করেন। তাঁহারা অপ্রাকৃত আত্মগত রাগকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিষয় বিকৃত রাগের অনুশীলনে বৃষভাসুরের ন্যায় আচরণ করিয়া ফেলেন। তাঁহারা কৃষ্ণতেজে হত হইবেন। এই প্রতিবন্ধকের উদাহরণ স্বেচ্ছাচারী ধর্ম্মধ্বজী দিগের মধ্যে প্রচুর লক্ষিত হয়। যাঁহারা পবিত্র ব্রজভাবগত হইয়া কৃষ্ণানন্দ সেবা করিবেন, তাঁহারা বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক প্রতিবন্ধক দূর করিবেন। জীবের শুদ্ধ ভাবগত প্রতিবন্ধক গুলি যথা—স্ব-স্বরূপ, নাম স্বরূপ ও উপাস্যস্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞান ও অবিদ্যা তাহাই ধেনুকাসুর। দৈন্য সবল হইলে অবশ্য কৃষ্ণকৃপা হয়। তাহা হইলে বলদেব ভাবের আবির্ভাবে উহারা ক্ষণেকেই নষ্ট হয়।

স্ফোট প্রকাশার্থ ভগবদ্-দাস্যভূষিত বিশুদ্ধ জীবতত্ত্ব জ্ঞানাশ্রয়ময় চিত্তরূপ দেবকীদেবীতে প্রথমোদয়, কিন্তু কংসের দৌরাত্ম্যকার্য্য আশঙ্কা করিয়া ব্রজ মন্দিরে গমন করেন। তথায় বিশ্বাসময় ধাম ব্রজপুরী প্রাপ্ত হইয়া শ্রদ্ধাময় চিত্ত রোহিণীর গর্ভে প্রবেশ করেন। ইহার পরেই জীবহৃদয়ে ভগবদ্ভাব উদিত হয়। তথায় নানাভাবে স্ফোট প্রকাশ সেবা বিস্তার করেন। 'নিরীশ্বর প্রমোদরূপ দ্বিবিধ-বানর কৃষ্ণ-

প্রেমময় শুদ্ধ বলদেব কর্ত্তৃক নিহত হয়। জীব-সম্বিন্নির্ম্মিত ধামে বৃহদ্বনের মধ্যে ভাবরূপা গোপীদিগের সহিত বলদেব প্রেমলীলা করেন। জ্ঞানাধিকারী মাথুর দোষ সকল, কর্ম্মাধিকারী দ্বারকাগত দোষসকল ও ভক্তগণ ব্রজদূষক প্রতিবন্ধক সকল দৈন্যভরে শ্রীবলদেবের কৃপায় সযত্নে দূর করিলে স্ফোট-কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

চতুর্থ ক্রম

শ্রীকৃষ্ণও—ব্রহ্মজ্ঞান বিভাগরূপ মথুরায়, বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বসুদেবের অধিষ্ঠান। তিনি নাস্তিক্যরূপকংসের মনোময়ীভগিনী দেবকী দেবীকে বিবাহ করিলেন। কংস ঐ দম্পতি হইতে ভগবদ্-ভাবের উৎপত্তি আশঙ্কা করিয়া স্মৃতিরূপ কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। তথায় তাঁহাদের যশ, কীর্ত্তি প্রভৃতি ছয়টী পুত্র ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঈশ-বিরোধী কংস তাহাদিগকে বাল্যকালেই হনন করেন। ভগবদ্ দাস্যভূষিত বিশুদ্ধ-জীবতত্ত্ব বলদেব তাঁহাদের সপ্তম পুত্র। তাহার অব্যবহিত পরেই ভগবদ্ভাব জীব হৃদয়ে উদিত হয়। নাস্তিক্যনাশরূপ কংসবধ ইচ্ছা করিয়া মহাবীর্য্যশালী স্ফোটাত্মক ভগবান্ প্রাদুর্ভূত হন। চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনী-নির্ম্মিত ব্রজভূমিতে ভগবান্ স্ব-স্বরূপে (শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে) নীত হইলেন। সেই ভূমির ভিত্তিমূল বিশ্বাস। জীবের যুক্তি-বিভাগে বা জ্ঞানবিভাগে ঐ ভূমি থাকে না কিন্তু বিশ্বাস বিভাগেই তাঁহার অবস্থান হয়। জ্ঞান বা বৈরাগ্য তথায় দৃশ্য হয় না। আনন্দমূর্ত্তি নন্দগোপ তথায় অধিকারী। এতত্ত্বে জাতির উচ্চত্ব বা নীচত্ব বিচার নাই। এই জন্যই স্ফোটের আনন্দমূর্ত্তি

গোপত্বে লক্ষিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ গোচারণ ও গোরক্ষণ এবং অনৈশ্বর্য্যাত্মক মাধুর্য্যত্বও লক্ষিত হয়। উল্লাসরূপিণী নন্দপত্নী যশোদা, যে অপকৃষ্ট তত্ত্ব মায়াকে প্রসব করেন তাহা ব্রজ হইতে বসুদেব কর্ত্তৃক নীত হইল। পরানন্দধাম চিন্তায় বদ্ধজীবের পক্ষে যে মায়িক ভাব অনিবার্য্য, তাহা শ্রীকৃষ্ণাগমনে দূরীকৃত হইল। বিশুদ্ধপ্রেম-সূর্য্যকিরণসমূহ পরিপূরিত গোকুলে শুদ্ধ-জীবতত্ত্বরূপ রামের সহিত অচিন্ত্য ভগবত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। নাস্তিক্যরূপ কংস শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার বাসনায় বালঘাতিনী পূতনাকে ব্রজে প্রেরণ করিলেন। মাতৃস্নেহ ছলনা করিয়া পূতনা কৃষ্ণকে স্তন্যদান করিয়া কৃষ্ণতেজে নিহত হইল। ধাত্রীচ্ছলে পূতনার ব্রজে আগমন রাগমার্গগত ভক্তগণের দুষ্টগুরুরূপ স্ফোট প্রকাশের প্রথম প্রতিবন্ধক। গুরু দুইপ্রকার—অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। সমাধিস্থ আত্মাই আত্মার অন্তরঙ্গ গুরু। "আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ। যৎপ্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসাবনু-বিন্দতে।। (ভাঃ ১১।৭।২০)। যিনি যুক্তিকে গুরু বলিয়া তাহার নিকট উপাসনা শিক্ষা করেন, তিনি দুষ্ট গুরু আশ্রয় করিয়াছেন। নিত্যধর্ম্মের পোষকরূপে যুক্তির ছলনা, পুতনার ছলনার সহিত তুলনা করা যায়। রাগমার্গের উপাসকগণ পরমার্থতত্ত্বে যুক্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া আত্মসমাধিকে আশ্রয় করিবেন। যে মনুষ্যের নিকট উপাসনাতত্ত্ব শিক্ষা করা যায়, তিনি বহিরঙ্গ গুরু। যিনি রাগমার্গ অবগত হইয়া শিষ্যের অধিকার বিচারপূর্ব্বক পরমার্থ উপদেশ করেন, তিনি সদ্‌গুরু।

যিনি নিজে রাগমার্গ অবগত নহেন অথচ উপদেশ করেন, অথবা রাগমার্গ অবগত হইয়াও শিষ্যের অধিকার বিচার না করিয়া কোন উপদেশ করেন, তিনি দুষ্ট গুরু, তাঁহাকে অবশ্য বর্জ্জন করিতে হইবে। কুতর্ক ই দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক। ব্রজে বাত্যারূপ তৃণাবর্ত্ত বধ না হইলে ভাবোদগম হওয়া কঠিন। দার্শনিক, বৌদ্ধ ও যুক্তিবাদীদিগের সমস্ত তর্কই ব্রজভাব সম্বন্ধে তৃণাবর্ত্তরূপ প্রতিবন্ধক। ভগবদ্ভাবের প্রভাবে তর্করূপ তৃণাবর্ত্ত প্রাণ ত্যাগ করিবে।

যাঁহারা বৈধপর্ব্বের সার অবগত না হইয়া তাহার ভারবহনে তৎপর, তাঁহারা রাগানুভব করিতে পারেন না। অতএব ভারবাহিত্বরূপ বুদ্ধিমর্দ্দক শকটভঙ্গ ভগবৎ কর্ত্তৃক নিহত হইলে তৃতীয় প্রতিবন্ধক দূর হয়। দুষ্টগুরুগণ রাগাধিকার বিচার না করিয়া অনেক ভারবাহী জনগণকে মঞ্জরী-সেবন ও সখীভাব-গ্রহণে উপদেশ দিয়া পরমতত্ত্বের অবহেলারূপ অপরাধ করায় পতিত হইয়াছেন। যাঁহারা ঐ সকল উপদেশমতে উপাসনা করেন, তাঁহারাও পরমার্থতত্ত্ব হইতে ক্রমশঃ দূরে পড়িয়া থাকেন, যেহেতু ঐ সকল আলোচনায় আর গম্ভীর রাগের লক্ষণ প্রাপ্ত হন না। সাধুসঙ্গ ও সদুপদেশ ক্রমে তাঁহারা পুনরায় উদ্ধার পাইতে পারেন। ভগবৎ কর্ত্তৃক উক্ত শকট ভঙ্গ হইয়া থাকে।

মুখব্যাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জননীকে মুখমধ্যে সমস্ত জগৎ দেখাইলেন। জননী চিচ্ছক্তিগত রতিপোষিকা অবিদ্যা দ্বারা মুগ্ধ থাকায় কৃষ্ণৈশ্বর্য্য মানিলেন না। চিদ্বিলাসগত ভক্তগণ ভগবন্মাধুর্য্যে এতদূর মুগ্ধ থাকেন যে, ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও

তাহা তাঁহাদের নিকট প্রতীত হয় না। এ অবিদ্যা মায়াভাব-গত নয়। কৃষ্ণের বালচাপল্য (চিত্ত-নবনীত চৌর্য্য) দেখিয়া উল্লাসরূপিণী যশোদা রজ্জুদ্বারা কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার জন্য বৃথা যত্ন পাইলেন। যাঁহার মায়িক পরিমাণ নাই, তাঁহাকে কেবল প্রেমসূত্রের দ্বারা যশোদা বন্ধন করিয়াছিলেন। মায়িক রজ্জুদ্বারা তাঁহার বন্ধন সিদ্ধ হয় না। কৃষ্ণের বাললীলাক্রমে দেবপুত্রদ্বয়ের বার্ক্ষভাব হইতে অনায়াসে বন্ধচ্ছেদ হইল। ইহাতে দুইটী তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। সাধুসঙ্গে ক্ষণমাত্রেই জীবের বন্ধ-মোক্ষ হয়, এবং অসাধু-সঙ্গে দেবতারাও কুকর্ম্মবশ হইয়া জড়তা-প্রাপ্ত হন।

সখাদিগের সহিত বালরূপী কৃষ্ণ গোবৎস চারণার্থে কাননে প্রবেশ করেন অর্থাৎ চিচ্ছক্তিগত অবিদ্যামুগ্ধ শুদ্ধ জীবসকল নিষ্ঠাক্রমে গোবৎসত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাধীন হন। গোচারণ স্থলে বালদোষরূপ বৎসাসুর বধ হয়। ইহাই চতুর্থ প্রতিবন্ধক। কংসপালিত ধর্ম্মকাপট্য-রূপ মহাধূর্ত্ত বকাসুর পঞ্চম প্রতিবন্ধক। ইহাকেই নামাপরাধ বলে। যাহারা অধিকার বুঝিতে না পারিয়া দুষ্ট গুরুর উপদেশে উচ্চাধিকারের উপাসনা লক্ষণ অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা প্রবঞ্চিত ভারবাহী, কিন্তু যাহারা স্বীয় অনধিকার অবগত হইয়াও উচ্চলক্ষণ অবলম্বন করিয়া সম্মান ও অর্থসঞ্চয়কে উদ্দেশ করে তাহারাই কপট। ইহা দূর না করিলে রাগোদয় হয় না। সম্প্রদায়লিঙ্গ ও উদাসীন লিঙ্গদ্বারা তাহারা জগৎকে বঞ্চনা করে। কংসপালিত ধর্ম্মকাপট্যরূপ বকাসুর, শুদ্ধবুদ্ধ

কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হয়। ঐ সকল দাম্ভিকদিগের বাহ্যলিঙ্গ দেখিয়া যে সকল লোকেরা আদর করেন, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রীতি-অনাপ্তির হেতু হইয়া জগতের কণ্টক হন। জ্ঞাতব্য এই যে,—বাহ্যলিঙ্গের প্রতি বিদ্বেষ পূর্ব্বক তৎস্বীকর্ত্তা কোন সারগ্রাহীর অনাদর না হয়। অতএব বাহ্যলিঙ্গের প্রতি উদাসীন থাকিয়া প্রীতিলক্ষণ অন্বেষণ করত সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করা বৈষ্ণব-দিগের নিয়ত কর্ত্তব্য। নৃশংসত্ব ও প্রচণ্ডত্বরূপ অঘাসুরই ষষ্ঠ প্রতিবন্ধক। সর্ব্বভূত দয়ার অভাবে রাগের ক্রমশঃ লোপ-সম্ভাবনা, কেন না দয়া কখনই রাগ হইতে ভিন্নবৃত্তি হইতে পারে না। জীব-দয়া ও কৃষ্ণভক্তির সত্তার ভিন্নতা নাই। নৃশংসতাস্বরূপ অঘ নামা সর্প মর্দ্দিত হইল। তদন্তে ভগবান্ সরলতারূপ একত্র পুলিন ভোজন আরম্ভ করিলেন। ইত্য-বসরে সমস্ত জগতের বিধাতা চতুর্ব্বেদ-বক্তা চতুর্ম্মুখ কৃষ্ণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া গোপবালক ও গোবৎস সকল চুরি করিলেন। ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পরমমাধুর্য্যে সম্পূর্ণ প্রভুতা প্রদর্শিত হইল। গোপাল হইয়াও জগদ্বিধাতার উপর পূর্ণপ্রভাব দেখাইলেন। চিজ্জগতের অতিপ্রিয় কৃষ্ণ কোন বিধির বাধ্য নহেন। ব্রহ্মা গোপবালক সকল ও গোবৎস সকল হরণ করিলে ভগবান্ অপহৃত সকলকেই স্বয়ং প্রকাশ করিয়া অনায়াসে চালাইতে লাগিলেন। চিজ্জগৎ ও অচিজ্জগৎ সমস্ত বিনষ্ট হইলেও কৃষ্ণৈশ্বর্য্য কখনই কুণ্ঠিত হয় না। যিনি যতদূরই সমর্থ হউন, শ্রীকৃষ্ণ সামর্থ্য লঙ্ঘন করিতে কেহই পারেন না। নানাপ্রকার মতের নানা-প্রকার তর্ক ও বিচারশাস্ত্রে বিশেষরূপ চিত্তাভিনিবেশ করিলে

সমাধিপ্রাপ্ত সত্য সমুদয় বিলীন প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বেদবাদ-জনিত মোহ বলে। ঐ মোহকর্ত্তৃক মুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে সন্দেহ করিয়াছিলেন। ঐ প্রকার মোহ সপ্তম প্রতিবন্ধক। ধেনুকাসুর অষ্টম প্রতিবন্ধক। উহা শ্রীবলদেব কর্ত্তৃক নিহত হয়। কালিয় সর্পরূপ খলতা বৈষ্ণবদিগের চিদ্দ্রবতারূপ যমুনাকে সর্ব্বদা দূষিত করে, ইহা নবম প্রতিবন্ধক, ভগবান্ লাঞ্ছনা করিয়া দূরীভূত করেন। দাবানলরূপ দশম প্রতিবন্ধক—সম্প্রদায় বিরোধ। সম্প্রদায় বিরোধ-ক্রমে, নিজ সম্প্রদায় লিঙ্গ ধারণ ব্যতীত কাহাকেও বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে না পারায়, যথার্থ সাধুসঙ্গ ও সদ্‌গুরু প্রাপ্তিতে অনেক ব্যাঘাত হয়। উক্ত ভয়ঙ্কর দাবানলকে ব্রজধাম রক্ষার্থ ভগবান্ ভক্ষণ করেন। নাস্তিক্য-রূপ কংসের প্রেরিত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত মায়াবাদ-স্বরূপ জীব-চৌর দুষ্ট প্রলম্বাসুর শ্রীবলদেব কর্ত্তৃক নিহত হয়।

মধুর রসস্থ দ্রবতার অধিক্য প্রযুক্ত তদ্গত প্রীতিকে প্রাবৃট্‌কালের সহিত সাম্যবোধে কথিত হইল যে, প্রীতিবর্ষা উপস্থিত হইলে ভাবাত্মিকা হরিপ্রিয়া গোপীগণ হরিগুণ গানে প্রমত্তা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশী গীতে ব্যাকুলা হইয়া স্ফোটের মহা-আকর্ষণী শক্তিতে গোপীগণ কৃষ্ণলাভেচ্ছায় ব্রজধামে যোগমায়া মহাদেবীর অর্চ্চনা করিলেন। বৈকুণ্ঠতত্ত্বে মায়িক জগৎস্থিত জীবের চিদ্বিভাগে আবির্ভাবের নাম ব্রজ। ব্রজ-শব্দ—গমনার্থ সূচক। মায়িক জগতে আত্মার মায়া ত্যাগপূর্ব্বক ঊর্দ্ধগমন অসম্ভব, অতএব মায়িক বস্তুর আনুকূল্য আশ্রয়-

পূর্ব্বক তন্নির্দ্দেশ্য অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের অন্বেষণ করাই কর্ত্তব্য। এতন্নিবন্ধন গোপিকাভাবপ্রাপ্ত জীবদিগের মহাদেবী যোগমায়া অর্থাৎ মায়াশক্তির বিদ্যারূপ অবস্থায় আশ্রয় পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-ললনার সাহচার্য্য বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তির কৃষ্ণ-দাস্যেচ্ছা অত্যন্ত বলবান্ তাঁহাদের স্বগত বা পরগত কিছুই গোপনীয় নাই। এই তত্ত্ব ভক্তদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণ গোপীদিগের বস্ত্রহরণ করিলেন। শুদ্ধসত্ত্বগত চিত্তই ভগবদ্রতির অনাময় স্থান। তাহার আচ্ছাদন দূর করত প্রীতির অধিকার দর্শন করিলেন। গোচারণ করিতে করিতে মথুরার নিকটস্থ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিলেন। জাত্যাভিমান বশতঃ ঐ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞাদি-কার্য্য শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণকে অন্ন দিলেন না। ইহার হেতু এই যে, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা বেদবাদরত, যেহেতু তাঁহারা বেদের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য বোধ করিতে না পারিয়া সামান্য কর্ম্ম ও জ্ঞানবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক হয় কর্ম্মজড় হইয়া পড়েন, নয় আত্মজ্ঞান পরায়ণ হইয়া নির্ব্বিশেষ চিন্তায় মগ্ন হন। তাঁহারা শাস্ত্র ও পূর্ব্বপুরুষদিগের শাসনাধীনে থাকিয়া বিধিনিষেধের বাহক হইয়া পড়েন। সেই সকল অর্থ শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য যে ভগবদ্রতি তাহা তাঁহারা বুঝিতে সক্ষম হন না। অতএব তাঁহারা কি প্রকারে কৃষ্ণসেবক হইতে পারেন? এতদ্দ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, সকল ব্রাহ্মণেরাই এইরূপ কর্ম্মজড় বা জ্ঞানপর। অনেক বিপ্রকুলজাত মহাপুরুষগণ ভগবদ্-ভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। অতএব তাৎপর্য্য এই

যে, বিধিবাহক অর্থাৎ ভারবাহী ব্রাহ্মণেরা কৃষ্ণবিমুখ, কিন্তু সারগ্রাহী বিপ্রগণ কৃষ্ণদাস ও সর্ব্বপূজ্য। ভারবাহী ব্রাহ্মণ-গণের স্ত্রীগণ অর্থাৎ কোমলশ্রদ্ধ অনুগত লোকেরা বনে শ্রীকৃষ্ণ-নিকটে গমন করত পরমাত্মা কৃষ্ণের মাধুর্য্যবশ হইয়া তাঁহাকে আত্মদান করিল। এই কোমলশ্রদ্ধ পুরুষেরাই সংসারী বৈষ্ণব। ইহাদ্বারা জীবগণের সমদর্শনরূপ তত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। কৃষ্ণ-প্রীতিসম্পন্ন হইবার জন্য জাতিবুদ্ধির প্রয়োজন নাই। বরং সময়ে সময়ে ঐ বুদ্ধি প্রীতির প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে। উত্তমরূপে সমাজ রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আর্য্যগণের মধ্যে বর্ণবিভাগ ও আশ্রম-বিভাগরূপ সামাজিক বিধি স্থাপিত হইয়াছে। সমাজ রক্ষিত হইলে সৎসঙ্গ ও সদালোচনাক্রমে পরমার্থের পুষ্টি হয়। এতন্নিবন্ধন বর্ণাশ্রম সর্ব্বতোভাবে আদরনীয়, যেহেতু তদ্দারা ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব এই সমস্ত অর্থগত ব্যবস্থার একমাত্র মূল তাৎপর্য্য পরমার্থ, যাহার অন্যতম নাম শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি। যদি এই সকল অর্থাবলম্বন না করিয়াও কাহারও পরমার্থলাভ ঘটে, তথাপি অর্থসকল অনাদৃত হইতে পারে না। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, উপেয় প্রাপ্ত হইলে উপায়ের প্রতি স্বভাবতঃ অনাদর হইয়া উঠে। উপেয়রূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি যাঁহাদের লাভ হয় তাঁহারা গৌণ উপায়রূপ বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ত্যাগ করিলেও দোষী নহেন। অতএব অধিকার বিচার পূর্ব্বক দোষগুণ নির্ণয় করাই সার-সিদ্ধান্ত।

সমাজ-সংরক্ষণ কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা ভগবদাবির্ভাবের নাম যজ্ঞেশ্বর। তাঁহার জীব-প্রতিনিধির নাম ইন্দ্র। ঐ কর্ম্ম দুই প্রকার—নিত্য ও নৈমিত্তিক। সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য যাহা যাহা নিত্য কর্ত্তব্য সেই সকল কর্ম্ম নিত্য, তদিতর সকল কর্ম্মই নৈমিত্তিক। বিচার করিয়া দেখিলে কাম্য কর্ম্ম-সকল নিত্য ও নৈমিত্তিকবিভাগে পর্য্যবসিত হয়। অতএব সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মসকল উদ্দেশ্যক্রমে বিচারিত হওয়ায় নিত্য নৈমিত্তিক বিভাগেই স্থাপিত হয়, বিভাগান্তরে লক্ষিত হয় না। কেবল শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহকরূপ নিত্যকর্ম্ম ব্যবস্থা করিয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তদিগের সম্বন্ধে সমস্ত কর্ম্ম নিষেধ করিলেন। তাহাতে কর্ম্মপতি ইন্দ্র জগৎ-পুষ্টিকার্য্যসকল অনাদৃত হইল দেখিয়া বৃহদুপদ্রব উপস্থিত করিলেন। গোবর্দ্ধন অর্থাৎ নিরীহ জনের বর্দ্ধনশীল পীঠস্বরূপ ছত্র অবলম্বনপূর্ব্বক ভক্তদিগের আবশ্যকীয় সমস্ত বিষয় বর্ষণ ও প্লাবন হইতে ভগবান্ রক্ষা করিলেন। ভগবদ্-অনুশীলনকার্য্য-নিবন্ধন যদি মানবগণের জগৎ-পুষ্টিকার্য্যসকল কর্ম্মাভাবে নিবৃত্ত হয়, তাহাতে কৃষ্ণ-ভক্তদিগের কিছুমাত্র আশঙ্কা করা কর্ত্তব্য নয়। কৃষ্ণ যাঁহাদের উদ্ধারকর্ত্তা তাঁহাদিগকে কেহই নষ্ট করিতে পারে না, তাঁহাদের উপর কোন বিধির বিক্রম নাই। বিধিবন্ধন দূরে থাকুক, ভক্তদিগের প্রেমবন্ধন ব্যতীত আর কোনপ্রকার বন্ধন নাই। ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করিয়া কর্ম্মফলের আশায় দেবেন্দ্রাদি অন্যান্য ক্ষুদ্র দেবতার পূজা করা বৈষ্ণবদিগের পক্ষে ত্রয়োদশ প্রতিবন্ধক। বিশ্বাসময় দেশে অর্থাৎ শ্রীবৃন্দা-

বনে চিদ্‌দ্রবরূপিণী যমুনা নদী বহমান আছেন। নন্দরাজ তাহাতে মগ্ন হওয়ায় ভগবান্ লীলাক্রমে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। জীবের নিরুপাধিক আনন্দকে নন্দ বলিয়া ব্রজে লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ঐ আনন্দকে সম্বর্দ্ধন-করণাশয়ে মাদক সেবন করেন, তাহাতে আত্মবিস্মৃতি-রূপ বৃহদনর্থ ঘটিয়া থাকে। নন্দের বরুণালয়-সংপ্রাপ্তিটী বৈষ্ণবগণের পক্ষে চতুর্দ্দশ প্রতিবন্ধক। পরদ্রব্য হরণ ও মিথ্যা-ভাবণরূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিপর্য্যাপ্তি-সম্বন্ধে পঞ্চদশ প্রতিবন্ধক। উহা ব্যোমাসুররূপে ব্রজে উৎপাত করে। তদনন্তর ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র কৃপাপূর্ব্বক গোপদিগকে নিজ ঐশ্বর্য্য বৈকুণ্ঠতত্ত্ব দর্শন করাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য এত প্রবল যে, ঐশ্বর্য্য সমুদয় তাহাতে লুক্কায়িতরূপে থাকে, ইহাই প্রদর্শিত হইল।

রাসলীলা—নিত্যসিদ্ধগণ ও তাঁহাদের অনুগত জীব-দিগের প্রিয় ভগবান্ প্রীতিতত্ত্বের পরাকাষ্ঠারূপ রাসলীলা সম্পন্ন করিলেন। অন্তর্দ্ধান-বিয়োগদ্বারা গোপিকাদিগের প্রেমাত্মক কাম সম্বর্দ্ধন করিয়া পরম কৃপালু ভগবান্ রাসচক্রে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মায়াবিরচিত জড়াত্মক বিশ্বে একটী মূল ধ্রুবনক্ষত্র আছে। তাহার চতুর্দ্দিকে সূর্য্যসকল স্ব স্ব গ্রহসহকারে ধ্রুবের আকর্ষণ বলে নিত্য ভ্রমণ করিতেছে। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, জড় পরমাণুসমূহে আকর্ষণ-নামা একটি শক্তি নিহিত আছে। ঐ শক্তিক্রমে পরমাণুসকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া একত্রিত হইলে বর্ত্তুলাকার মণ্ডল নির্ম্মিত হয়। ঐ সকল মণ্ডল পুনশ্চ কোন বৃহদ্বর্ত্তুলাকার মণ্ডল দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া

তচ্চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। এইটী জড়জগতের নিত্যধর্ম্ম। জড় জগতের মূলীভূত মায়া চিজ্জগতের প্রতিফলন মাত্র। চিজ্জগতে প্রীতিরূপ নিত্যধর্ম্ম দ্বারা অণুচৈতন্য সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া অপেক্ষাকৃত কোন উন্নত চৈতন্যের অনুগমন করে। ঐ সকল উন্নত চৈতন্য পুনরায় অধীন চৈতন্যগণ-সহকারে, পরমধ্রুবচৈতন্যরূপ শ্রীকৃষ্ণের রাসচক্রে অনুক্ষণ ভ্রমণ করিতেছে। অতএব বৈকুণ্ঠতত্ত্বে পরমরাসলীলা নিত্য বিরাজমান আছে। যে রাগতত্ত্ব চিদ্বস্তুতে নিত্য অবস্থিতি করত মহাভাব পর্য্যন্ত প্রীতির বিস্তার করে, সেই ধর্ম্মের প্রতিফলনরূপ জড়ীভূত কোন অচিন্ত্য ধর্ম্ম আকর্ষণরূপে জড়-জগতে বিস্তৃত হইয়া উহার বৈচিত্রী সম্পাদন করিতেছে। এতন্নিবন্ধন, স্থূল দৃষ্টান্তদ্বারা সূক্ষ্মতত্ত্ব দর্শাইবার অভিপ্রায়ে কহিতেছেন যে, যেমত জড়াত্মক বিশ্বে সসূর্য্য গ্রহমণ্ডল সকল ধ্রুব নক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে আকর্ষণশক্তির দ্বারা নিত্য ভ্রমণ করে, তদ্রূপ চিদ্বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণ-বলক্রমে শুদ্ধ জীবসকল, শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া নিত্যকাল ভ্রমণ করেন। ইহাই স্ফোটের মহা-আকর্ষণী শক্তি। এই চিদ্‌গত মহারাসলীলায় কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং সমস্ত জীবগণই নারী। চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একমাত্র ভোক্তা ও সমস্ত অণু-চৈতন্যই ভোগ্য। প্রীতিসূত্রে সমস্ত চিৎস্বরূপের বন্ধন সিদ্ধ হওয়ায়, ভোগ্যতত্ত্বের স্ত্রীত্ব ও ভোক্তৃতত্ত্বের পুরুষত্ব সিদ্ধ হইতেছে জড়দেহগত স্ত্রী-পুরুষত্ব—চিদ্‌গত ভোক্তা ভোক্তৃত্বের অসৎ প্রতিফলন। সমস্ত অভিধান অন্বেষণ করিয়া এমত

একটী বাক্য পাওয়া যাইবে না, যদ্দ্বারা চিৎস্বরূপদিগের পরম চৈতন্যের সহিত অপ্রাকৃত সংযোগ-লীলা সম্যক্ বর্ণিত হইতে পারে। এতন্নিবন্ধন মায়িক স্ত্রীপুরুষের সংযোগসম্বন্ধীয় বাক্য সকল তদ্বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সম্যক্ ব্যঞ্জক বলিয়া ব্যবহৃত হইল। ইহাতে অশ্লীল চিন্তার কোন প্রয়োজন বা আশঙ্কা নাই। যদি অশ্লীল বলিয়া পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে আর ঐ পরতত্ত্বের আলোচনা সম্ভব হয় না। বাস্তবিক বৈকুণ্ঠগত ভাবনিচয়ের প্রতিফলনরূপ মায়িক ভাবসকল বর্ণন-দ্বারা বৈকুণ্ঠতত্ত্বের বর্ণনে অসমর্থ; তদ্বিষয়ে অন্য উপায় নাই। যথা কৃষ্ণ দয়ালু, ইহা বলিতে হইলে মানবগণের দয়াকার্য্য লক্ষ্য করিয়া বলিতে হইবে। কোন রূঢ়বাক্যে ঐ ভাব ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। অতএব অশ্লীলতার আশঙ্কা ও লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সারগ্রাহী আলোচকগণ মহারাসের পরমার্থ-তত্ত্ব অকুণ্ঠিতভাবে শ্রবণ, পঠন ও চিন্তন করিবেন। সেই রাসলীলার সর্ব্বোত্তম ভাব এই যে, সমস্ত জীবনিচয়ের পরমারাধ্যা কৃষ্ণমাধুর্য্য প্রকাশিনী হ্লাদিনী-স্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা ভাবরূপা সখীগণে বেষ্টিতা হইয়া রাস মধ্যে পরম-শোভমানা হয়েন। এই শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্বই মূল স্ফোটতত্ত্ব-অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব। সকল শক্তি-প্রকাশাদি এই স্ফোটেরই প্রকাশ, শক্তি ও কার্য্য। রাসলীলার পরে চিদ্দ্রবময়ী যমুনার জল-ক্রীড়া স্বভাবতঃ হইয়া থাকে।

নন্দ-স্বরূপ আনন্দ, নির্ব্বাণমুক্তিরূপ সর্পগ্রস্ত হইলে, ভক্তরক্ষক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আপদ্ মোচন করেন। উপাসনা-

কার্য্যে বৈষ্ণবদিগের আনন্দবৃদ্ধি হইতে হইতে কোন সময় প্রলয় লক্ষণ-ভাবের উদয় হয়, তাহাতে কোন সময় সাযুজ্য-ভাব আসিয়া পড়ে। ঐ সাযুজ্য-ভাবটী নন্দভক্ষক সর্প বিশেষ; তাহা হইতে মুক্ত থাকিয়া সাধক সুবৈষ্ণব হইবেন। যশকে প্রধান করিয়া মানেন যিনি, তিনি যশোমূর্দ্ধা শঙ্খচূড়; তিনি ব্রজভূমিতে উৎপাত করিতে গিয়া বিনষ্ট হন। প্রতিষ্ঠাপরতা ও ভক্তিচ্ছলে ভোগ কামনা—ইহারা শঙ্খচূড়-নামা ষোড়শ প্রতিবন্ধক। প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল লোকেরা কোন কার্য্য করেন, তাঁহারাও একপ্রকার দাম্ভিক, অতএব বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা তাহা হইতে সাবধান থাকিবেন। কংসবৈরী শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে মথুরা-গমনে মানস করিলেন, তৎকালে রাজ্য-সদাসুর ঘোটকরূপী কেশী নিহত হইল। সাধকের যখন ভক্তি তেজ সমৃদ্ধি হয়, তখন স্বীয় উৎকর্ষজ্ঞানরূপ ঘোটকাত্মা কেশী-নামক অসুর ব্রজে আগমন করত বড়ই উৎপাত করে। ক্রমশঃ স্বীয় উৎকৃষ্টতা আলোচনা করিতে করিতে ভগবদবমাননা-ভাবের উদয় হইয়া বৈষ্ণবকে অধঃপাতিত করায়। অতএব তদ্রূপ দুষ্টভাব বৈষ্ণবহৃদয়ে না হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ভক্তি সমৃদ্ধি হইলেও নম্রতাধর্ম্ম কখনই বৈষ্ণবচরিত্র ত্যাগ করিবে না। যদি করে, তবে কেশীবধের প্রয়োজন হইয়া উঠে। এই অষ্টাদশটী প্রতিবন্ধক। যাঁহারা পবিত্র ব্রজভাব-গত হইয়া কৃষ্ণানন্দ সেবা করিবেন, তাঁহারা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক প্রোক্ত অষ্টাদশটী প্রতিবন্ধক দূর করিবেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি প্রতিবন্ধক জীব শুদ্ধভাবগত হইয়া স্বীয় চেষ্টাক্রমে

দূর করিবেন, কতকগুলি শ্রীকৃষ্ণকৃপাসহকারে দূর করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। যে সকল প্রতিবন্ধক জীব স্বয়ং দূর করিতে সক্ষম হয়েন, ঐ সকল ধর্ম্মাশ্রয় থাকায় ঐ সমাধি সবিকল্প-নাম প্রাপ্ত হয়। আত্মার প্রত্যক্ষ শ্রীভাগবতে বলদেব কর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়া থাকার বর্ণন আছে। কিন্তু কৃষ্ণাশ্রয়ে যে সকল প্রতিবন্ধক দূর হয়, তাহা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দূর করিয়াছেন, এরূপ বর্ণিত আছে।

মাথুর লীলা :—ঘটনীয় বিষয় সকলের ঘটক অক্রুর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ভগবান্ প্রথমে মল্লদিগকে নষ্ট করিয়া পরে অনুজ সহিত কংসকে নিপাত করিলেন। নাস্তিক্যরূপ কংস বিগত হইলে তাহার জনক স্বাতন্ত্র্যরূপ উগ্রসেনকে শ্রীকৃষ্ণ রাজসিংহাসন অর্পণ করিলেন। অস্তি-প্রাপ্তি নামা কংসের দুই ভার্য্যা কর্ম্মকাণ্ড-স্বরূপ জরাসন্ধকে আপন আপন বৈধব্যদশা নিবেদন করিলেন। তাহা শ্রবণে মগধরাজ সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক মথুরাপুরীতে সপ্তদশবার মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইলেন। জরাসন্ধ পুনরায় মথুরা রোধ করিলে ভগবান্ স্বকীয়া দ্বারকাপুরীতে গমন করিলেন। মূল তাৎপর্য্য এই যে, নিষেকাদি শ্মশানান্ত দশকর্ম্ম, : বর্ণচতুষ্টয় ও আশ্রমচতুষ্টয় এই আঠারটী কর্ম্ম বিক্রম। তন্মধ্যে অষ্টাদশ বিক্রমরূপ চতুর্থাশ্রমদ্বারা জ্ঞানপীঠ অধিকৃত হইলে মুক্তিস্পৃহাজনিত ভগবত্তিরোভাব লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে মথুরায় ছিলেন, তৎকালে গুরুকুলে বাস করত অনায়াসে সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করিলেন ও গুরুদেবকে

তন্মৃতপুত্রের জীবন দান করিলেন। স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণের বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন নাই, কিন্তু জ্ঞানপীঠরূপ মথুরাবস্থিতি-কালে নরবুদ্ধির জ্ঞানভাবের ক্রমোন্নতি হয়। যাঁহারা কর্ম্মফল আত্মসাৎ করেন, তাঁহারা কামী। সেই কামীদিগের কৃষ্ণরতি মলযুক্ত, কিন্তু অনেক দিবস পর্য্যন্ত ঐ সকাম কৃষ্ণরতি আলোচনা করিতে করিতে সুনির্ম্মল কৃষ্ণভক্তির উদয় হইয়া পড়ে। মথুরায় অবস্থিতিকালে কুব্জার সহিত সাধারণী রতিজনিত যে প্রণয় হয় তাহা কুব্জার অন্তঃকরণে সকাম ছিল, কিন্তু সকাম প্রীতির চরমফলরূপ শুদ্ধপ্রীতিও পরে উদিত হইয়াছিল। ব্রজভাব সর্ব্বোপরি ভাব ; তাহা শিক্ষা করিবার জন্য গোকুলে উদ্ধবকে প্রেরণ করিলেন। পাণ্ডবগণ ধর্ম্ম শাখা ও কৌরবগণ অধর্ম্ম শাখা, ইহা স্মৃতিতে কথিত আছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগেরই বান্ধব ও কুল রক্ষক। ধর্ম্মের কুশলস্থাপন এবং পাপীদিগের ত্রাণ অভিপ্রায়ে ভগবান্ অক্রূরকে দূত করিয়া হস্তিনায় প্রেরণ করিলেন।

কর্ম্মের গতি দুই প্রকার অর্থাৎ স্বার্থপর ও পরমার্থপর. পরমার্থপর কর্ম্ম সকলকে কর্ম্মযোগ বলা যায় ; কেননা জীবন-যাত্রায় ঐ সকল কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানের পুষ্টি এবং কর্ম্মজ্ঞান উভয়ের যোগক্রমে ভগবদ্ভক্তির পুষ্টি হইয়া থাকে। এই প্রকার কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পরস্পর সংযোগকে কেহ কেহ কর্ম্মযোগ, কেহ কেহ জ্ঞানযোগ, কেহ কেহ ভক্তিযোগও সারগ্রাহী লোকেরা সমন্বয়যোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু যে সকল কর্ম্ম স্বার্থপর তাহাদের নাম কর্ম্মকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড

প্রায়ই ঈশ্বর বিষয়ে অস্তিপ্রাপ্তিরূপ সংশয়কে উৎপন্ন করিয়া নাস্তিকতার সহিত তাহাদের উদ্বাহরূপ সংযোগ করিয়া থাকে। সেই কর্ম্মকাণ্ডরূপ জরাসন্ধ ব্রহ্মজ্ঞান-স্বরূপিণী রম্য মথুরাপুরীকে রোধ করিল। ভক্তসমাজরূপ বান্ধবগণকে শ্রীকৃষ্ণ বৈধভক্তিযোগরূপ দ্বারকাপুরীতে স্বেচ্ছাক্রমে লইয়া গেলেন। বর্ণাশ্রমরূপ সাংসারিক বিধিরাহিত্যকে যবন বলা যায়, অবৈধকার্য্যবশতঃ যবন-ধর্ম্ম ম্লেচ্ছতাভাবাপন্ন, ঐ যবন কর্ম্মকাণ্ডের সাহায্যে জ্ঞানের বিরোধী ছিল, মুক্তিমার্গাধিকার-রূপ মুচুকুন্দ রাজাকে ঐ যবন পদাঘাত করায় তাঁহার তেজে ঐ দুরাচার হত হইল।

দ্বারকা লীলা—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়ী দ্বারকাপুরীতে অবস্থিত হইয়া পরমৈশ্বর্য্যরূপিণী রুক্মিণী দেবীকে ভগবান্ বিবাহ করিলেন। কামরূপ প্রদ্যুম্ন রুক্মিণীর গর্ভজাতমাত্রেই দুরাত্মা মায়ারূপী শম্বর কর্ত্তৃক হৃত হইলেন। পুরাকালে শুষ্ক বৈরাগ্যগত মহাদেব কর্ত্তৃক কামদেবের শরীর ভস্মসাৎ হইয়াছিল, তৎকালে রতিদেবী বিষয়-ভোগরূপ আসুরীভাবাশ্রয় করিয়াছিলেন কিন্তু বৈধী ভক্তিমার্গ উদয় হইলে ভস্মীভূত কাম কৃষ্ণপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করত স্বপত্নী রতিদেবীকে অসুরী-ভাব হইতে উদ্ধার করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, যুক্তবৈরাগ্যে বৈধকাম ও রতির অস্বীকার নাই। স্বপত্নী রতিদেবীর শিক্ষায় অতি বলবান্ কামদেব, বিষয়ভোগরূপ শম্বরকে বধ করত দ্বারকা গমন করিলেন। মানময়ী রাধিকার কলাস্বরূপা সত্যভামাকে মণি উদ্ধার করত বিবাহ করিলেন। মাধুর্য্যগত

হ্লাদিনী শক্তির ঐশ্বর্য্যভাবে প্রতিফলিত রুক্মিণ্যাদি অষ্টমহিষী দ্বারকায় কৃষ্ণ-প্রিয়া হইয়াছিলেন। মাধুর্য্যগত ভগবদ্ভাব যেরূপ অখণ্ড, ঐশ্বর্য্যগত বৈধীভক্ত্যাশ্রয় দ্বারকানাথের ভাব সেরূপ নয়, যেহেতু ফলরূপে ঐ ভাবের সন্তানসন্ততিক্রমে বশংবৃদ্ধি হইয়াছিল।

হরধামরূপ কাশীতে অদ্বৈতমতবাদরূপ আসুরিক মতের উদয় হয়, যাহাতে আমি বাসুদেব বলিয়া এক দুষ্ট ব্যক্তি ঐ মত প্রচার করেন। রমাপতি ভগবান্ তাহাকে বধ করিয়া ঐ মতের দুষ্ট পীঠস্বরূপ কাশীধামকে দগ্ধ করেন। ভগবত্তত্ত্বকে ভৌমবুদ্ধি করিয়া নরকাসুরের ভৌমনাম হয়। তাহাকে বধ করিয়া গরুড়াসন ভগবান্ অনেক রমণীবৃন্দকে উদ্ধার করত তাহাদিগকে বিবাহ করলেন। পৌত্তলিক মত নিতান্ত হেয় যেহেতু পরমতত্ত্বে সামান্য বুদ্ধি করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম, শ্রীমূর্ত্তিসেবন ও পৌত্তলিক মতে অনেক ভেদ আছে। পরমার্থতত্ত্বের নির্দ্দেশক শ্রীমূর্ত্তিসেবন দ্বারা পরমার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু নিরাকারবাদরূপ ভৌতিক তত্ত্বের ব্যতিরেক ভাবকে পরব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করা অথবা মায়িক কোন বস্তু বা গঠনকে পরমেশ্বর বলিয়া জানাই পৌত্তলিকতা অর্থাৎ ভগবদিতর বস্তুতে ভগবন্নির্দ্দেশ। এই মতের অনুগামী লোক সকলকে ভগবান্ উদ্ধার করত স্বয়ং স্বীকার করিলেন। ধর্ম্ম-ভ্রাতা ভীমের দ্বারা জরাসন্ধকে বধ করিয়া অনেকানেক রাজাদিগকে কর্ম্মপাশ হইতে উদ্ধার করিলেন। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে অশেষ পূজা গ্রহণ করত আত্মবিদ্বেষী অর্থাৎ ভগবৎ-

স্বরূপবিদ্বেষী শিশুপালের শিরশ্চেদ করিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে পৃথিবীর ভার অপনোদন করিয়া ভগবান্ ধর্ম্মস্থাপন-পূর্ব্বক সমাজ রক্ষা করিলেন। নারদমুনি দ্বারকায় আগমন করিয়া প্রতি মহিষীর গৃহে শ্রীকৃষ্ণকে একইকালে দর্শন করত ভগবত্তত্ত্বের গাম্ভীর্য্যে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সর্ব্বজীবে এবং সর্ব্বত্র ভগবান্ পূর্ণরূপে বিলাসবান্ হইয়া একই কালে অবস্থিত আছেন, ইহা একটী অপূর্ব্ব তত্ত্ব। সর্ব্বব্যাপী ভাবটী এই তত্ত্বের নিকট, নিতান্ত সামান্য বোধ হয়। অসভ্যতারূপ দন্ত-বক্র হত হইলেন। পুনশ্চ ধর্ম্মভ্রাতা অর্জ্জুনকে স্বীয় ভগিনী সুভদ্রা দেবীর পাণি প্রদান করিলেন। যেস্থলে ভোগ্যত্বরূপ জীবের স্ত্রীত্ব সম্পন্ন হয় নাই, সেস্থলে সখ্যভাবগত-হ্লাদিনী-শক্তি-সম্বন্ধ-স্থাপনার্থে ভগবদ্ভাবের সন্নিকৃষ্ট ভগিনীত্বপ্রাপ্ত কোন অচিন্ত্য ভক্তভাবকে সুভদ্রারূপে কল্পনা করা যায়। ঐ ভাব অর্জ্জুনের ন্যায় ভক্তিবিশেষের ভোগ্য হয়। ব্রজ-ভাবের ন্যায় ঐ ভাব উৎকৃষ্ট নয়।

শাল্বমায়া বিনাশ করিয়া ভগবান্ দ্বারকাপুরী রক্ষা করিলেন। বৈজ্ঞানিক শিল্প ভগবৎকার্য্যের নিকট কিছুই নয়। নৃগরাজ অনুচিতকর্ম্মফলে (নাম মাহাত্ম্যে বিশ্বাস না থাকায় জাগতিক শুভকার্য্য দানাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া নামাপরাধ মধ্যে গণ্য) কৃকলাসত্ব ভোগ করিতেছিলেন, ভগবৎকৃপায় তাহা হইতে উদ্ধার পাইলেন। পাষণ্ডদত্ত অতিশয় উপাদেয় দ্রব্যও ভগবদ্গ্রাহ্য নয়, কিন্তু প্রীতিদত্ত অতি সামান্য দ্রব্যও ভগবানের আদরনীয় হয়, ইহা সুদামা

ব্রাহ্মণের তণ্ডুলকণ ভক্ষণ করিয়া দেখাইলেন। এই সমস্ত লীলা ভক্তগণের হৃদ্দেশবর্ত্তী, কিন্তু ভক্তগণের মর্ত্ত্যদেহ পরিত্যাগ কালে, রঙ্গস্থিত নটের রঙ্গত্যাগের ন্যায়, অদৃশ্য হয়। কালরূপা শ্রীকৃষ্ণেচ্ছাভাবরূপ যাদবদিগকে লীলারঙ্গ হইতে নিবৃত্ত করিয়া দ্বারকাধামকে বিস্মৃতিসাগরের উর্ম্মিদ্বারা প্লাবিত করিলেন। ভগবানের ইচ্ছা সর্ব্বদা পবিত্র। ইহাতে কিছুমাত্র অমঙ্গল নাই। ভক্তগণকে বৈকুণ্ঠাবস্থা প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে মায়িক শরীর হইতে ভিন্ন করিয়া লন। সেই পরমানন্দদায়িনী কৃষ্ণেচ্ছা ভক্তদিগের জরাক্রান্ত কলেবর সকল ভগবজ্‌জ্ঞানরূপ প্রভাসক্ষেত্রে পরিত্যাগ করাইলেন। শরীরের অপটু অবস্থায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেহ কাহারও শাসনাধীনে না থাকায় পরস্পর বিবাদ করে বিশেষতঃ দেহত্যাগকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে, কিন্তু ভক্তদিগের চিত্তে ভগবত্তত্ত্ব কখনই নিবৃত্ত হয় না। ভক্তহৃদয়ে যে ভগবদ্ভাব থাকে তাহা ভক্তকলেবর বিচ্ছিন্ন হইলে, ভক্তের শুদ্ধ আত্মার সহিত স্বীয় মহিমা প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠস্থ প্রদেশবিশেষ গোকুলে নিত্য বিরাজমান হইতে থাকে। উক্ত লীলা সকল ভগবৎ হৃদ্দেশস্থ ও ভক্ত হৃদ্দেশস্থ ভাব সকলকে উদ্বেলিত করিয়া লীলা পোষণোপযোগী করিয়া বিভিন্ন প্রকার ভাবে যথোপযুক্ত বিভাবিত করিয়া উভয়কে লীলারস আস্বাদন করাইবার শক্তিই স্ফোট শক্তি।

চিৎপ্রভাবগত পরা শক্তির সন্ধিনীভাবকৃত বকুণ্ঠ, ১। মাধুর্য্যগত বিভাগ, ২। ঐশ্বর্য্যগত বিভাগ ও ৩। নির্ব্বিশেষ

বিভাগরূপ বিভাগত্রয়ে বিভক্ত। নির্ব্বিশেষ বিভাগটী বৈকুণ্ঠের আবরণ ভূমি। বহিঃপ্রকোষ্ঠের নাম নারায়ণধাম এবং অন্তঃপুরের নাম গোলোক। নির্ব্বিশেষ উপাসকেরা নির্ব্বিশেষ বিভাগ অর্থাৎ ব্রহ্মধামকে প্রাপ্ত হইয়া মায়াজনিত শোক হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। ঐশ্বর্য্যগত ভক্তবৃন্দ নারায়ণ ধাম প্রাপ্ত হইয়া অভয়লাভ করেন। মাধুর্য্যাস্বাদী ভক্তজন অন্তঃপুরস্থ হইয়া কৃষ্ণামৃত লাভ করেন। অশোক, অভয় ও অমৃত—এই তিনটী শ্রীকৃষ্ণের ত্রিপাদ বিভূতি নিত্য বৈকুণ্ঠগত। বিভূতিযোগে পরব্রহ্মের নাম বিভূত হইয়াছে। মায়িক জগৎটী শ্রীকৃষ্ণের চতুর্থ বিভূতি। আবির্ভাব হইতে অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত নানা-সম্বন্ধঘটিত-লীলা গোলোকধামে বর্ত্তমান আছে। বদ্ধজীবে যে গোলোকভাব প্রতিভাত আছে, তাহাতেও এই লীলা নিত্য, যেহেতু অধিকারভেদে কোন ভক্তহৃদয়ে এই মুহূর্ত্তে কৃষ্ণজন্ম হইতেছে, কোন ভক্তহৃদয়ে বস্ত্রহরণ, কোন হৃদয়ে মহারাস, কোন হৃদয়ে পূতনাবধ, কোন হৃদয়ে কংসবধ, কোন হৃদয়ে কুব্জাপ্রণয় এবং কোন হৃদয়ে ভক্তের জীবনত্যাগ সময়ে অন্তর্দ্ধান হইতেছে। যেমত জীবসকল অনন্ত, তদ্রূপ জগৎসংখ্যাও অনন্ত, অতএব এক জগতে একলীলা ও অন্য জগতে অন্য লীলা, এরূপ শশ্বৎ বর্ত্তমান আছে। অতএব ভগবানের সমস্ত লীলাই নিত্য, কখনই লীলার বিরাম নাই, যেহেতু ভগবানের স্ফোট-শক্তি সর্ব্বদাই ক্রিয়াবতী। এই সমস্ত লীলাই স্বরূপ-ভাব-গত অর্থাৎ মায়িকবিকারগত নয়। যদিও মায়াবশতঃ

বদ্ধজীবে ঐ লীলা বিকৃতবৎ বোধ হয়, তথাপি তাহার নিগূঢ়-সত্ত্বা চিদ্রূপবর্ত্তিনী। সেই লীলা গোলোকধামে স্বরূপভাব-সম্পন্না আছে, কিন্তু বদ্ধজীবসম্বন্ধে তাহা সাম্বন্ধিকী। বদ্ধ-জীবসকল দেশ, কাল ও পাত্রভেদ অবলম্বন পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ সকল লীলা দেশগত, কালগত ও পাত্রগতভেদ অবলম্বনপূর্ব্বক ভিন্ন-ভিন্নাকাররূপে দৃষ্ট হয়। লীলা কখনই সমল হয় নাই, কিন্তু আলোচকদিগের মলযুক্ত বিচারে উহার ভিন্নতা পরিদৃশ্য হয়। চিজ্জগতের ক্রিয়াসকল বদ্ধজীবে স্বরূপভাবে স্পষ্ট পরিদৃশ্য হয় না, কেবল সমাধিদ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হয়, তাহাও ঐ স্বরূপ ভাবের মায়িক প্রতিচ্ছায়াকে লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধ হয়। এতদ্ধেতুক ব্রজলীলাদিতে যে সকল দেশ-নিদর্শন, কাল-নিদর্শন ও ব্যক্তি-নিদর্শন লক্ষিত হয়, ঐ সকল নিদর্শন পাত্রবিচার ক্রমে দুইপ্রকার কার্য্য করে। কোমলশ্রদ্ধ পুরুষদিগের পক্ষে তাহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের স্থল। সেরূপ স্থূল নির্দ্দেশ ব্যতীত তাঁহাদের ক্রমোন্নতির পন্থান্তর নাই। উত্তমাধিকারীদিগের পক্ষে তাহারা চিদগত-বৈচিত্র্য-প্রদর্শকরূপে সম্যক্ আদৃত হইয়াছে। মায়িক সম্বন্ধ দূর হইলে জীবের পক্ষে স্বরূপ-লীলা প্রত্যক্ষ হইবে। বদ্ধজীবে ভগবল্লীলা স্বভাবতঃ সাম্বন্ধিকী। ঐ সাম্বন্ধিকী ভাব দুই-প্রকার—ব্যক্তিনিষ্ঠ ও সর্ব্বনিষ্ঠ। বিশেষ বিশেষ ভক্তহৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইয়া আসিয়াছে তাহা ব্যক্তিনিষ্ঠ। ঐ ব্যক্তিনিষ্ঠ ভাবকর্তৃক প্রহ্লাদ, ধ্রুব ইত্যাদি ভক্তগণের হৃদয়

অতি প্রাচীন কালেও ভগবল্লীলার পীঠস্বরূপ হইয়াছিল। যেমত কোন বিশেষ ব্যক্তির জ্ঞানোদয়ক্রমে ভগবদ্ভাবের উদয় হইয়া তাহার হৃদয় পবিত্র করে তদ্রূপ সমস্ত জনসমাজকে এক ব্যক্তি জ্ঞান করিয়া উহার বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা বিচার করিলে দেখা যায় যে, সাধারণ আলোচনাক্রমে কোন সময়ে ভগবদ্ভাব সামাজিক সম্পত্তি হইয়া উঠে এবং সমাজের জ্ঞানবৃদ্ধিক্রমে প্রথমে উহা কর্ম্মবশ, পরে জ্ঞানপর এবং অবশেষে চিদনুশীলনরূপ পরম ধর্ম্মের প্রবলতাক্রমে বিশুদ্ধ হইয়া উঠে। সেই সর্ব্বনিষ্ঠ লীলাগত ভাব দ্বাপযুগে নারদ-ব্যাসাদির চিত্তে উদিত হওয়াতে অপ্রাকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে। সমাজ-জ্ঞানসমৃদ্ধিক্রমে যে কৃষ্ণলীলারূপ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রকাশ হইল তাহা তিন ভাগে বিভাজ্য। তন্মধ্যে দ্বারকালীলা প্রথম ভাগ এবং ভগবান্ তাহাতে ঐশ্বর্য্যাত্মক বিধিপরায়ণ বিভুস্বরূপ উদিত হইয়াছেন। মধ্যলীলা মাথুর বিভাগে লক্ষিত হয়; তাহাতে ভগবানের ঐশ্বর্য্য ততদূর প্রস্ফুটিত নহে, অতএব অধিকতর মাধুর্য্য তাহাতে নিহিত আছে। কিন্তু তৃতীয় বিভাগে ব্রজলীলা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যে লীলাতে যতদূর মাধুর্য্য, সেই লীলা ততদূর উৎকৃষ্ট ও স্বরূপসন্নিকর্ষ। অতএব ব্রজলীলয় শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র পূর্ণতম।

ঐশ্বর্য্য যদিও বিভূতির অঙ্গবিশেষ, তথাপি কৃষ্ণতত্ত্বে তাহার প্রাবল্য সম্ভব হয় না; যেহেতু যেখানে ঐশ্বর্য্যের অধিক প্রভাব, সেইখানেই মাধুর্য্যের লোপ হয়। অতএব গো, গোপ,

গোপী, গোপবেশ, গোরসোদ্ভূত নবনীত, বন, কিশলয়, যমুনা, বংশী প্রভৃতি যে স্থানের সম্পত্তি, সেই স্থানই ব্রজগোকুল, অর্থাৎ বৃন্দাবন বলিয়া সমস্ত মাধুর্য্যের আস্পদ হইয়াছে। সেখানে ঐশ্বর্য্য কি করিবে। সেই ব্রজলীলায় দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গাররূপ চারিটী সম্বন্ধাশ্রিত পরম রস চিদ্বিলাসের উপকরণস্বরূপ সর্ব্বদা বিরাজমান হইতেছে। সেই সমস্ত রসের মধ্যে গোপীদিগের সহিত ভগবল্লীলারসই শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে গোপীগণের শিরোমণি শ্রীমতী রাধিকার সহিত ভগবল্লীলা সর্ব্বোত্তম ভাবনা বলিয়া লক্ষিত হয়।

যাঁহারা এই রসরূপ চিদ্গতভাবের আস্বাদনপর, তাঁহারাই নিত্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। কোন কোন মধ্যমাধিকারী পুরুষেরা যুক্তির সীমাতিক্রম আশঙ্কা করিয়া বলিয়া থাকেন যে, সামান্য ভাবসূচক বাক্যসংযোগদ্বারা এইরূপ তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর, কৃষ্ণলীলাবর্ণনরূপ নিদর্শনের প্রয়োজন নাই। এরূপ মন্তব্য ভ্রমজনিত, যেহেতু সামান্য বাক্যযোগে বৈকুণ্ঠবৈচিত্র্য প্রদর্শিত হয় না। এক অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্ম আছেন তাঁহার উপাসনা কর, এরূপ কহিলে আত্মার চরমধর্ম্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত হয় না। সম্বন্ধযোজনা ব্যতীত উপাসনাকার্য্য সম্ভব হয় না। মায়া নিবৃত্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মে অবস্থান করাকে উপাসনা বলা যায় না, যেহেতু ঐ কার্য্যে প্রতিষেধরূপ ব্যতিরেক-ভাব-ব্যতীত কোন অন্বয় ভাবের বিধান হইল না। ব্রহ্মকে দর্শন কর, ব্রহ্মের চরণাশ্রয় গ্রহণ কর ইত্যাদি বাক্য-প্রয়োগের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণ বিশেষ ধর্ম্মের স্বীকার করা

হইল। এস্থলে বিবেচনা করিতে হইবে যে, ঐ বিশেষে সম্পূর্ণ সন্তোষ না হওয়ায় তাঁহাকে প্রভু, পিতা ইত্যাদি সম্বোধন প্রয়োগ করা যায়, তদ্দ্বারা মায়িক সম্বন্ধ দৃষ্টিপূর্ব্বক কোন অনির্ব্বচনীয় লক্ষ্য আছে। মায়িকসত্তা ও কার্য্যকে নিদর্শনরূপে স্বীকার করিতে হইলে, বৈকুণ্ঠগত সমস্ত সম্বন্ধ-ভাবের মায়িক প্রতিফলনকে নিদর্শনরূপে সংগ্রহ করত সার-গ্রহণ-প্রবৃত্তিদ্বারা বৈকুণ্ঠগত সত্তা ও কার্য্যসকলকে অন্বেষণ করিতে সারগ্রাহী লোক ভীত হইবেন না। বিদেশীয় পণ্ডিতগণ বুঝিতে না পারিয়া পাছে আমাদিগকে পৌত্তলিক বলেন, এই অসার ভয়কে শিরোধার্য্য করিয়া আমরা কি পরমার্থ-রত্নকে বিসর্জ্জন দিব ? যাঁহারা নিন্দা করিবেন, তাঁহারা নিজ নিজ কৃত সিদ্ধান্তে কোমলশ্রদ্ধ। তাঁহাদিগ হইতে উচ্চাধিকারী হইয়া আমরা কি জন্য তাঁহাদিগকে আশঙ্কা করিব ? সামান্য বাক্যযোগে রসতত্ত্বের বিস্তৃতি হয় না, এজন্য ব্যাসাদি কবিগণ শ্রীকৃষ্ণ লীলাতত্ত্ব বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়াছেন। ঐ অপূর্ব্ব-লীলাবর্ণন কোমলশ্রদ্ধ ও উত্তমাধিকারী উভয়েরই পরম-শ্রদ্ধাস্পদ। প্রকৃষ্টরূপে সেবিত হইলে ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র যে পরিমাণে পরমানন্দ দান করেন, তাহা ধ্যানযোগে জীবাত্মা-সহচর ঈশ্বর, জ্ঞানযোগে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, কর্ম্মযোগে যজ্ঞেশ্বর উপাসিত হইয়া প্রদান করেন না। অতএব সর্ব্ব-জীবের পক্ষে হয় কমলশ্রদ্ধরূপে অথবা পরমসৌভাগ্যক্রমে উত্তমাধিকারিরূপে কৃষ্ণসেবাই একমাত্র পরম ধর্ম্ম। সমস্ত সুবৈষ্ণবগণ স্ফোটতত্ত্বে বিভিন্ন প্রকাশরূপ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অবগত হইবেন।

মথুরা ও দ্বারকাগত ভাবসকল সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রজভাবের পুষ্টিকর। যে ব্রজভাবে আসক্তি করিয়া জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা অন্বয়ব্যতিরেকরূপে বিবেচিত হইবে। অন্বয়-বিচারে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চ সম্বন্ধের আলোচনা হইয়া থাকে। কেহ কেহ ব্রজরাজের দাস্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং শ্রীদাম-সুবলাদি ভক্তগণ সখ্যভাবে সেবা করেন। যশোদা, রোহিণী, নন্দ প্রভৃতি বাৎসল্য-ভাবের পাত্র এবং শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীগণ কান্তাভাব প্রাপ্ত হইয়া রাসমণ্ডলে বর্ত্তমান আছেন। বৃন্দাবন বিনা অন্যত্র শুদ্ধসম্বন্ধভাব নাই। এতন্নিবন্ধন শুদ্ধ জীবদিগের বৃন্দাবন-ধামে স্বাভাবিকী রতি হইয়া থাকে। বৃন্দাবনস্থ কান্তভাবই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত শ্রেষ্ঠ, যেহেতু জীবের ভোগ্যতা ও ভগবানের ভোক্তৃত্বরূপ নিত্যধর্ম্ম ইহাতে বিশুদ্ধরূপে লক্ষিত হয়। নিত্য-ধর্ম্মে অবস্থিত জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে কোনপ্রকার কুণ্ঠতা নাই। অখণ্ড পরমানন্দ উহাতে প্রীতিরূপে নিত্য বর্ত্তমান আছে। জীব ও কৃষ্ণের সম্ভোগসুখই ব্রজরসের নিত্য প্রয়োজন। সেই সুখের পুষ্টি করিবার জন্য বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস-রূপ বিরহভাব নিতান্ত প্রয়োজন। মথুরা ও দ্বারকা-চিন্তা দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয়। অতএব মথুরা ও দ্বারকাদি-ভাব ব্রজভাবের পুষ্টিকর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রপঞ্চ বদ্ধ জীবের অধিকার-ক্রমানুসারে আদৌ বৈধ ভক্তির আশ্রয় থাকে, পরে রাগোদয় হইলে ব্রজভাবের উদগম হয়। জনসমাজে বৈধানুশীলন এবং স্বীয়ান্তঃকরণে কৃষ্ণরাগাশ্রয়

যৎকালে হইতে থাকে, সেই কালে শ্রীকৃষ্ণে পরকীয় রসের কল্পনা করা যায়। যেমত কোন স্ত্রী নিজ বিবাহিত স্বামীকে বাহ্যাদর করত কোন পরপুরুষের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাতে গোপনে অনুরক্ত হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বাশ্রিত বৈধমার্গের বিধিসকল ও ঐ সকল বিধির নিয়ন্তা ও রক্ষক-সকলের প্রতি কেবল বাহ্য সম্মান করত ভিতরে ভিতরে রাগানুশীলন দ্বারা কৃষ্ণপ্রেমকারী পুরুষেরা পরকীয়রসাশ্রয় করিয়া থাকেন। এই তত্ত্বটী শৃঙ্গার-রসের পক্ষে উপাদেয়, অতএব মধ্যমাধিকারীদিগের নিন্দা-ভয়ে উত্তমাধিকারীরা কখনই ত্যাগ করিতে পারেন না।

বৈধ বিধানের মূল তাৎপর্য্য এই যে, যৎকালে বদ্ধজীব-দিগের আত্মার নিত্যধর্ম্মরূপ রাগ নিদ্রিতপ্রায় থাকে অথবা বিকৃতভাবে বিষয়রাগরূপে পরিণত থাকে, তখন আত্মবিদ্বৈদ্যগণ ঐ রোগ দূরীকরণ জন্য যে সকল বিধান করেন, তাহাই বিধিমার্গ। সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে যে মহাপুরুষ যে কার্য্যের দ্বারা স্বীয় সুপ্তপ্রায় রাগের উদয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি জীবদিগের প্রতি স্বাভাবিক দয়াপূর্ব্বক ঐ কার্য্য বা ঘটনাটীকে পরমার্থ-সাধনের উপায়-স্বরূপ বর্ণন করিয়া একটী একটী বিধির ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ সকল মহাপুরুষদিগের বিধিসকল, শাস্ত্রাজ্ঞারূপে কোমল-শ্রদ্ধ মহাশয়গণের নিতান্ত অবলম্বনীয়। বিধিকর্ত্তা ঋষিগণ উত্তমাধিকারী ও সারগ্রাহী ছিলেন। যে সকল লোকেরা স্বয়ং বিচার করিয়া রাগোৎপত্তির উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারেন, তাঁহাদের পক্ষে বিধিমার্গ ব্যতীত আর গতি নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নয়টী বিভাগে উক্ত বিধিসকল সংগৃহীত হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে ঐ সকল বিধির চতুঃষষ্টি অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া আলোচিত হইয়াছে। ফল কথা, যাঁহাদের স্বাভাবিক রাগ অনুদিতপ্রায় আছে, তাঁহারা বিধিমার্গের অধিকারী, কিন্তু রাগতত্ত্বের ভাবোদয় হইলেই বিধিমার্গের অধিকার নিরস্ত হয়। যে কোন বিধির আশ্রয়ে কৃষ্ণানুশীলনদ্বারা যে পুরুষের রাগোদয় হয়, সেই বিধি সেই পুরুষকর্ত্তৃক রাগাবির্ভাবের পরেও কৃতজ্ঞতাসহকারে ও অপর লোকে অনুকরণ করিয়া চরিতার্থ হইবে, এরূপ আশয়ে অনেকদিন পর্য্যন্ত সেবিত হয়। সারগ্রাহী মহাত্মারা সমস্ত বিধি অবলম্বন বা পরিত্যাগ করিতে অধিকার রাখেন। উপাসনাপর্ব্বে রাগতত্ত্বকে অবস্থাক্রমে তিন ভাগে বিভাগ করা যায়, যথা,—শুদ্ধরাগ, বৈকুণ্ঠসত্তাগতভাবমিশ্রিত রাগ এবং বদ্ধজীবের পক্ষে নিদর্শনচেষ্টাগত ভাবমিশ্রিত রাগ। কৃষ্ণার্দ্ধরূপিণী রাধিকাসত্তাগত অতি শুদ্ধ রাগকে মহাভাব বলা যায়। রাগের তদবস্থা হইতে ভিন্ন, কিন্তু মহাভাবের অত্যন্ত সন্নিকটস্থ শুদ্ধসত্ত্বগত অষ্ট প্রকার ভাবসকল অষ্ট সখী। উপাসকের নিদর্শনচেষ্টাগত সখীভাবের সন্নিকর্ষ-ভাবসকল মঞ্জরী। উপাসক প্রথমে স্বীয়স্বভাবপ্রাপ্য মঞ্জরীর আশ্রয় করিয়া, পরে ঐ মঞ্জরীর সেব্যা সখীর আশ্রয় করিবেন। সখীর কৃপা হইলে শ্রীরাধিকার পদাশ্রয় লাভ হইবে। মহা-রাসলীলাচক্রে উপাসক, মঞ্জরী, সখী ও শ্রীমতী রাধিকা—ইহারা জড়জগতের ধ্রুবচক্রের উপগ্রহ, গ্রহ, সূর্য্য ও ধ্রুব—

ইহাদের সহিত সৌসাদৃশ্য রাখেন। ভাববাহুল্যক্রমে মহাভাবত্বপ্রাপ্ত জীবদিগের সর্ব্বানন্দ প্রদায়ক কৃষ্ণসম্ভোগ সুলভ হইয়া পড়ে। এই চমৎকার ব্রজভাব সম্পন্ন হইবার প্রীতিদূষক অষ্টাদশটী প্রতিবন্ধক আছে। প্রতিবন্ধক বিচারের নাম ব্রজভাবের ব্যতিরেক বিচার। ইহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। উক্ত বিষয়গুলি স্ফোটপ্রকাশের অন্বয় ও ব্যতিরেক শক্তিদ্বারা সম্ভাবিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি :—শ্রীব্যাসদেব ব্রজলীলা বর্ণনে নিত্যতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। প্রপঞ্চ-জনিত বিষয়-জ্ঞান ঐ নিত্যতত্ত্বের স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে পারে না। জীবের সিদ্ধসত্তায় ঐ পরমতত্ত্ব ভাসমান হয়। বদ্ধজীবের সম্বন্ধে দূরতারহিত বিশুদ্ধ নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে স্ফোটের ঐ সিদ্ধসত্তা কার্য্যক্ষম হয়। সমাধি দুই প্রকার—সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। জ্ঞানিগণের সম্প্রদায়ে সমাধির যে কিছু ব্যাখ্যা হইয়া থাকুক্, সাত্বতগণ অত্যন্ত সহজ সমাধিকে নির্ব্বিকল্প ও কূটসমাধিকে সবিকল্প সমাধি বলিয়া থাকেন। আত্মা চিদ্বস্তু, অতএব স্বপ্রকাশতা ও পরপ্রকাশতা উভয় ধর্ম্মই তাহাতে সহজ। স্বপ্রকাশ-স্বভাব-দ্বারা আত্মা আপনাকে আপনি দেখিতে পায়। পরপ্রকাশ-ধর্ম্ম দ্বারা আত্মেতর সকল বস্তুকে জ্ঞাত হইতে পারে। যখন এই ধর্ম্ম আত্মার স্বধর্ম্ম হইল, তখন নিতান্ত সহজ সমাধি যে নির্ব্বিকল্প, তাহাতে আর সন্দেহ কি। আত্মার বিষয়বোধ-কার্য্যে যন্ত্রান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না, এজন্য ইহাতে বিকল্প নাই। কিন্তু অতন্নিরসনক্রমে যখন সাঙ্খ্য-সমাধি অবলম্বন

করা যায়, তখন সমাধিকার্য্যে বিকল্প অর্থাৎ বিপরীত ধর্ম্মাশ্রয় থাকায় ঐ সমাধি সবিকল্প নাম প্রাপ্ত হয়। আত্মার প্রত্যক্ষ কার্য্যকে সহজ সমাধি বলা যায়, ইহাতে মনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না। সহজ সমাধি অনায়াসসিদ্ধ, কোনমতে ক্লেশসাধ্য নহে। ঐ সমাধি আশ্রয় করিলে স্ফোটের নিত্যতত্ত্ব সহজে আত্মপ্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। সেই আত্মপ্রত্যক্ষ-রূপ সহজ সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রজলীলা লক্ষিত ও বর্ণিত হয়। তবে যে তদ্বর্ণনে মায়িকপ্রায় নাম, রূপ, গুণ ও কর্ম্ম লক্ষিত হয়, সে কেবল মায়াপ্রসূত বিশ্বের নিজ আদর্শ বৈকুণ্ঠের সহিত সমানতাপ্রযুক্ত বলিতে হইবে। বাস্তবিক আত্মায় যে সহজ সমাধি আছে তাহা চিচ্ছক্ত্যাবিষ্কৃত কার্য্যবিশেষ। তদ্দ্বারা যাহা যাহা লক্ষিত হইতেছে, সে সমস্ত মায়িক জগতের আদর্শমাত্র—অনুকরণ নয়। এই কারণবশতঃ কৃষ্ণনাম-গুণাদিস্বরূপ ব্রজভাবসকলের সহিত জড়োদিত নাম, গুণ, রূপ, কর্ম্ম প্রভৃতির সর্ব্বদা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ঐ আত্ম-প্রত্যক্ষ স্বপ্রকাশ-স্বভাব। পণ্ডিতেরা ইহাকে সমাধি বলেন। ইহা অতিশয় সূক্ষ্মস্বরূপ। কিঞ্চিন্মাত্র সংশয়ের উদয় হইলে লোপপ্রায় হইয়া যায়। আত্মার স্বসত্তাতে বিশ্বাস, ইহার নিত্যত্ব ও ইহার সহিত পরব্রহ্মের সম্বন্ধ ইত্যাদি অনেকগুলি সত্য ঐ সহজ সমাধিদ্বারা জীবের উপলব্ধি হয়। যদি আমি আছি কিনা, মরণের পর আমার সত্তা থাকিবে কি না এবং পরব্রহ্মের সহিত আমার কিছু সম্বন্ধ আছে কি না, এরূপ যুক্তিগত কোন সংশয়ের উদয় হয়, তাহা হইলে ঐ সকল সত্য-

সংস্কারাত্মক ভ্রমবিশেষ বলিয়া পরিচিত হইতে হইতে ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যায়। সত্যের লোপ নাই, এজন্য তাহারা লুপ্তপ্রায় থাকে। আত্মার নিত্যত্ব ও ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রভৃতি সত্যসকল যুক্তিদ্বারা স্থাপিত হইতে পারে না, কেন না যুক্তির প্রপঞ্চাতীত বিষয়ে গতি নাই। আত্মপ্রত্যক্ষই ঐ সকল সত্যের একমাত্র স্থাপক। ঐ আত্মপ্রত্যক্ষ বা সহজ সমাধিদ্বারা জীবের নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ ও নিত্যক্রিয়া কৃষ্ণদাস্য সততই সাধুদিগের প্রতীত হয়। আত্মা যখন সহজ সমাধি অবলম্বন করেন, তখন প্রথমে আত্মবোধ, দ্বিতীয়ে আত্মার ক্ষুদ্রতাবোধ, তৃতীয়ে আশ্রয়বোধ, চতুর্থে আশ্রিত ও আশ্রয়ের সম্বন্ধবোধ, পঞ্চমে আশ্রয়ের গুণকর্ম্মাত্মক স্বরূপগত সৌন্দর্য্যবোধ, ষষ্ঠে আশ্রিত-গণের পরস্পর সম্বন্ধবোধ, সপ্তমে আশ্রিতগণ ও আশ্রয়ের সংস্থানরূপ পীঠবোধ, অষ্টমে তদগত অবিকৃত কালবোধ, নবমে আশ্রিতগণের ভাবগত নানাত্ববোধ, দশমে আশ্রিত ও আশ্রয়ের নিত্যলীলাবোধ, একাদশে আশ্রয়ের শক্তিবোধ, দ্বাদশে আশ্রয়শক্তিদ্বারা আশ্রিতগণের উন্নতি ও অবনতিবোধ, ত্রয়োদশে অবনত আশ্রিতগণের স্বরূপভ্রমবোধ, চতুর্দ্দশে তাহাদের পুনরুন্নতিকারণরূপ আশ্রয়ানুশীলনবোধ, পঞ্চদশে অবনত অশ্রিতজনের আশ্রয়ানুশীলনদ্বারা স্বস্বরূপ পুনঃ-প্রাপ্তিবোধ ইত্যাদি অনেক অচিন্ত্যতত্ত্বের বোধোদয় হয়। যাঁহার সহজ সমাধিতে যতদূর বিষয়জ্ঞান মিশ্রিত আছে, তিনি ততই অল্পদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পান। বিষয়জ্ঞানের মন্ত্রিস্বরূপ যুক্তিকে তাহার নিজাধিকারে আবদ্ধ রাখিয়া, যিনি

যতদূর সহজ সমাধির উন্নতি করিতে সক্ষম হন, তিনি ততদূর সত্যভাণ্ডার খুলিয়া স্ফোটের অনির্ব্বচনীয় অপ্রাকৃত সত্যসকল সংগ্রহ করিতে পারেন। বৈকুণ্ঠের স্ফোটভাণ্ডার সর্ব্বদা পরিপূর্ণ। নিত্য-প্রেমাস্পদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া জীবদিগকে সততই স্ফোটের আকর্ষণী শক্তি প্রকাশ-পূর্ব্বক আকর্ষণ ও আহ্বান করিতেছেন। যে সংশয় সমাধিকে খর্ব্ব করে তাহাকে দূর করিয়া বৈকুণ্ঠতত্ত্বের অন্তঃপুর বৃন্দাবনে সর্ব্বোত্তম তত্ত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপ সৌভগ দর্শন হয়। সমাধি যদি বিষয়জ্ঞানদোষে দূষিত থাকে এবং যুক্তিবৃত্তি যদি বিষয়জ্ঞান ছাড়িয়া সমাধিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করত অনধিকার-চর্চ্চা করিতে পারে তাহা হইলে প্রথমেই চিদ্গততত্ত্বে বিশেষ ধর্ম্মকে স্বীকার না করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধাম পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, আর অধিকদূর যাইতে পারা যায় না। কিন্তু বিষয়-জ্ঞান ও যুক্তি যদি কিয়ৎপরিমাণে নিবৃত্ত হইয়াও সমাধি-কার্য্যে কিছু হস্তক্ষেপ করিত, তাহা হইলে আত্মা ও পরমাত্মার নিত্যভেদমাত্র স্বীকার করিয়া বিশেষগত বৈচিত্র্যের অধিকতর উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইত। কিন্তু সংশয়রূপ দুষ্ট ভাবকে একেবারে বিসর্জ্জন দিলে আশ্রয়তত্ত্বের স্বরূপ-সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ দর্শন পাওয়া যায়।

"সমাধিদৃষ্ট স্বরূপ-সৌন্দর্য্য"—সমস্ত চিত্তত্ত্বপ্রতি-পোষক ভগবৎসৌন্দর্য্যটী নরভাবস্বরূপ। ভগবৎস্বরূপে শক্তি ও করণের ভিন্নতা নাই, তথাপি চিৎপ্রভাবগত সন্ধিনী, বিশেষ ধর্ম্মের সাহায্যে, করণসকলকে এরূপ উপযুক্ত স্থানগত

করিয়াছে যে, তাহাতে একটী অপূর্ব্ব শোভা উৎপন্ন হইয়াছে। সমস্ত চিদচিজ্জগতে সে শোভার তুলনা নাই। ভগবত্তত্ত্বে দেশ ও কালের প্রভুতা না থাকায় ভগবৎস্বরূপের অণুত্ব বা বৃহত্ত্ব দ্বারা কিছু মাহাত্ম্য স্থাপিত হয় না, বরং প্রকৃতির অতীত ধর্ম্মরূপ মধ্যমাকারের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পূর্ণত্বরূপ কোন চমৎকার ভাব দৃষ্ট হয়। অতএব সমাধিযোগে সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপ ভগবানের কলেবরসত্তা দর্শন লাভ হয়। ভগবদ্রূপসত্তা আরও মধুর। সমাধিচক্ষু যত গাঢ়-রূপে রূপসত্তায় নিযুক্ত হয়, ততই কোন অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণ তাহাতে লক্ষিত হয়। বোধ হয় ঐ চিন্ময়রূপের প্রতিফলরূপ মায়িক ইন্দ্রনীলমণি মায়িক চক্ষুর শীতলতা সম্পন্ন করে অথবা মায়িক নবজলধরগণ উত্তাপপীড়িত মায়িক চক্ষু আনন্দ বর্দ্ধন করে। সন্ধিনী, সম্বিৎ, হ্লাদিনীরূপ ত্রিতত্ত্বের কোন অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা অখণ্ডরূপে ভগবৎসৌন্দর্য্যে ত্রিভঙ্গ-রূপে ন্যস্ত রহিয়াছে। চিজ্জগতের অত্যন্ত প্রফুল্লতাযুক্ত নয়নদ্বয় ঐ স্বরূপের শোভা বিস্তার করিতেছে। বোধ হয় জড়জগতে ঐ চক্ষুদ্বয়ের প্রতিফলনরূপ কমলের অবস্থান। ঐ স্বরূপের শিরোভাগে কোন অপূর্ব্ব বিচিত্রতা লক্ষিত হইতেছে। বোধ হয় শিখিপুচ্ছ জড়জগতে উহারই প্রতিফলন। কোন অনায়াসসিদ্ধ চিৎপুষ্পের মালা ঐ স্বরূপের গলদেশের শোভা বিস্তার করিতেছে। বোধ হয় স্বভাবকৃত বনফুলের শোভা জড়জগতে তাহার প্রতিফলন। চিৎসম্বিৎ-প্রকাশিত চিৎ-প্রভাবগত জ্ঞান ঐ স্বরূপের কটিদেশকে আচ্ছাদন

করিয়াছে। বোধ হয়, নবজলধরের অধোভাগগত সৌদামিনী জড়জগতে উহার প্রতিফলন হইবে। কৌস্তভাদি চিদ্গত রত্ন ও অলঙ্কারসকল ঐ স্বরূপের শোভা বিস্তার করিতেছে। চিদাকর্ষণাত্মক সুমিষ্ট আহ্বান যদ্দ্বারা হইতেছে, ঐ চিদ্‌যন্ত্রকে বংশীরূপে লক্ষিত হয়। প্রাপঞ্চিক রাগরাগিণী চালকরূপ বংশ্যাদ উহার প্রতিফলন হইয়া থাকিবে। চিদ্‌দ্রবতারূপ যমুনাপুলিনে ও চিৎপুলকরূপ কদম্বতলে ঐ অচিন্ত্যস্বরূপ পরিলক্ষিত হইতেছে। এই সমস্ত চিল্লক্ষণের দ্বারা চিদ্-চিজ্জৎপতি নন্দতনয় শ্রীকৃষ্ণ সমাধিতত্ত্বে বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক লক্ষিত হ'ন। এই সকল চিল্লক্ষণের প্রতিচ্ছায়ারূপ মায়িক পদার্থ আছে বলিয়া চিদ্বস্তুর অনাদর করা সারগ্রাহীর কার্য্য নয়। সমস্ত চিল্লক্ষণ যথাযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎ-স্বরূপকে সর্ব্বচমৎকারকারী করিয়াছে। সমাধি যত গাঢ় হইবে ততই অধিক সূক্ষ্মদর্শন হইবে, সমাধি যত অল্প হইবে ততই ঐ স্বরূপতত্ত্বের বিশেষাভাব ও অবিলক্ষিতরূপ গুণাদির অদৃশ্যতা সিদ্ধ হইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মায়িকজ্ঞানপীড়িত লোকেরা সমাধিদ্বারা বৈকুণ্ঠের প্রতি অক্ষিপাত করিয়াও চিৎস্বরূপ ও চিদ্বিশেষ দর্শন করিতে সক্ষম হন না। এ কারণে তাঁহাদের চিদালোচনা স্বল্প ও প্রেমসম্পত্তি নিতান্ত ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। সেই সমাধিলক্ষিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্ফোটাকর্ষণস্বরূপ বংশীগীতের দ্বারা চিদচিৎজগৎকে উন্মত্ত করিয়া গোপীদিগের চিত্তহরণ করেন। জাত্যাদি মদবিক্রম যাহাদের হৃদয়কে দুষ্ট করিয়াছে, তাহারা কিরূপে কৃষ্ণলাভ করিতে পারে?

প্রপঞ্চগত দুষ্টমদ ছয় প্রকার ; অর্থাৎ জাতিমদ, রূপমদ, গুণমদ, জ্ঞানমদ, ঐশ্বর্য্যমদ ও ওজোমদ। এই সকল মদমত্ত পুরুষেরা ভক্তিভাব অবলম্বন করিতে পারে না। জ্ঞানমদদূষিত ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তাঁহারা পারক্য-চিন্তায় ব্রহ্মানন্দকে ভক্তির অপেক্ষা অধিক সম্মান করেন। মদরহিত পুরুষেরা গোপ ও গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণানন্দ লাভ করেন। কৃষ্ণতত্ত্বে গোপগোপীদিগেরই অধিকার, কেবল গোপীশব্দ ব্যবহৃত হইবার কারণ এই যে, এস্থলে কান্ত-ভাবাশ্রিত সর্ব্বোচ্চ রসের ব্যাখ্যা হইতেছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যগত পুরুষেরা ব্রজভাবাপন্ন, তাঁহারাও নিজ নিজ ভাবগত কৃষ্ণরস উপলব্ধি করেন। বাস্তবতত্ত্ব এই যে, সমস্ত জীবের ব্রজভাবে অধিকার আছে। মাধুর্য্যভাব হৃদয়স্থ হইলেই জীবের ব্রজধামপ্রাপ্তি সিদ্ধ হয়। ব্রজধামগত জীবের পূর্ব্বোক্ত পঞ্চরসের মধ্যে যে রস স্বভাবতঃ ভাল লাগে, তাইাই তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ভাব। সেই ভাবগত হইয়া তিনি উপাসনা করিবেন, কিন্তু এস্থলে কেবল কান্তভাবগত জীবের চরমাবস্থা প্রদর্শিত হইল। গোপীভাবপ্রাপ্ত পুরুষদিগকে সিদ্ধ বলা যায় এবং ঐ ভাবের যাঁহারা অনুকরণ করেন তাঁহারা সাধক। অতএব পরমার্থবিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধ ও সাধক এই দুই প্রকার সাধু আছেন বলিয়া স্বীকার করেন। গোপীভাবগত জীবের সাধনক্রম প্রদর্শিত হইতেছে। সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে যে সকল জীবের কর্ণে শ্রীকৃষ্ণের স্ফোটের প্রকাশ বেণুগীত প্রবেশ করে, তাঁহাদিগকে গীতমাধুর্য্য আকর্ষণ করিয়া উৎকৃষ্ট

অধিকারী করে। সংসারী লোকদিগের মায়াভোগরূপ পৌরুষই তাহাদের অনর্থ। অশ্রিততত্ত্বের আশ্রয়ত্যাগক্রমে মায়ার উপর পুরুষত্ব সিদ্ধ হয়। ঐ পুরুষভাব শীঘ্র দূর হইলে, পুনরায় কান্তরসাসক্ত পুরুষদিগের আশ্রিতভাব প্রাপ্তি হয় এবং সাধক আত্মায় ভগবদ্ভোগ্যতারূপ অপ্রাকৃত স্ত্রীত্ব উপস্থিত হয়। ক্রমশঃ পূর্ব্বরাগের এতদূর প্রাদুর্ভাব হয় যে, জীব উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে। যাঁহারা কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ঐ রূপ বর্ণন পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিয়া এবং চিত্রপট দর্শন-পূর্ব্বক তাঁহার কৃষ্ণপ্রাপ্তিলালসা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। জীবের সহজ জ্ঞানে ভগবদাকর্ষণের উপলব্ধির নাম কৃষ্ণগীত-শ্রবণ। কৃষ্ণরূপদর্শকেরা শাস্ত্রে যাহা যাহা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কৃষ্ণোপলব্ধির নাম কৃষ্ণগুণ-শ্রবণ। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বকৌশল দর্শনের নাম চিত্রপট-দর্শন। মায়িক বিশ্বটী চিদ্বিশ্বের প্রতিভাত ছবি, ইহা যাঁহার বোধগম্য হইল, তিনি চিত্রপট দর্শন করিয়াছেন বলা যায়। অথবা সহজ জ্ঞানে ভগদ্দর্শন, শাস্ত্রালোচনাদ্বারা ভবগতূপলব্ধি এবং বিশ্বকৌশলে ভগবত্তার দর্শন এই প্রকার ত্রিবিধ উপায়ে প্রথমে বৈষ্ণবতা সংগৃহীত হয়, ইহা বলিলেও হইতে পারে। ব্রজভাবের আশ্রয়রূপ শ্রীকৃষ্ণে বিমল-শ্রদ্ধাই পূর্ব্বরাগ অর্থাৎ প্রাগ্‌ভাব। সেই শ্রদ্ধার উদয় হইলে ব্রজবাসী সাধুদিগের সঙ্গ হয়। সাধুসঙ্গই কৃষ্ণলাভের হেতু। স্ফোটবাহক সাধুকৃপাদ্বারা স্ফোটশক্তি প্রাপ্ত এইরূপ ভাগ্যবান্ পুরুষদিগের ক্রমশঃ কৃষ্ণাভিমুখ অভিসার হইতে হইতে চিদ্দ্রবতারূপ যমুনার

তটে পরম কান্তের সহিত শুভ মিলন হয়। তখন কৃষ্ণসঙ্গক্রমে ব্রহ্মানন্দতুচ্ছকারী পরানন্দ স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং পূর্ব্বাশ্রিত মায়িক গার্হ্যসুখ তৎক্ষণাৎ প্রেমসমুদ্রের নিকট গোষ্পদের তুল্য হইয়া পড়ে। তাহার পর, প্রতিদিন সমস্ত আত্মার আত্মস্বরূপ নিত্য নূতন বিগ্রহে পরমানন্দ অসীম হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভগবদ্বিগ্রহ সর্ব্বক্ষণ রসরসান্তরের আশ্রয় হইয়া অপূর্ব্ব নূতনতা অবলম্বন করে, অর্থাৎ অশ্রিতজনের রসপিপাসা বৃদ্ধি হয়, কখনও তৃপ্ত হয় না। চিজ্জগতে শান্তাদি পাঁচটী সাক্ষাৎ রস ও বীর-করুণাদি সাতটী গৌণরস সমাধিগত পুরুষেরা দর্শন করিয়াছেন। যখন বৈকুণ্ঠতত্ত্বের প্রতিচ্ছায়ারূপ মায়িক জগৎ পরিলক্ষিত হইয়াছে, তখন মায়িক জগৎস্থ সকল রসেরই আদর্শ বৈকুণ্ঠে বিশুদ্ধভাবে আছে, তাহাতে সন্দেহ কি? পূর্ব্ববিচারিত রতির মূলতত্ত্ব গাঢ়রূপে পুনরায় বিচারিত হইতেছে। —সান্দ্রানন্দরূপ প্রীতির বীজস্বরূপ রতিই ভজনক্রিয়ার মূলতত্ত্ব। চিদানন্দ জীবের সচ্চিদানন্দ ভগবত্তত্ত্বের প্রতি যে স্বতঃসিদ্ধা আনুরক্তি, তাহাই রতি। চিদ্বস্তুর পরস্পর আকর্ষণ ও অনু-রাগরূপ স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। তাহাই পারমহংস্য অলঙ্কার-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য স্থায়িভাব। সেই রতি, রসতত্ত্বের অতি সূক্ষ্মমূল। সংখ্যাগণনায় এক যেরূপ মূলস্বরূপ হইয়া তদূর্দ্ধ সমস্ত সংখ্যায় ব্যাপ্ত আছে, প্রীতির পুষ্টি অবস্থায় প্রেম, স্নেহ, মান, রাগ প্রভৃতি দশাতেও রতি তদ্রূপ মূলরূপে লক্ষিত হয়। প্রীতির সমস্ত ক্রিয়াতে রতিকে মূলরূপে

লক্ষ্য করা যায় এবং ভাব ও সামগ্রীসকলকে স্কন্ধশাখা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অতএব রতি রসকে আশ্রয় করত রসরূপী হইয়া বর্দ্ধমানা হয়েন। রস মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বাদশ প্রকার। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চবিধ মুখ্যরস সম্বন্ধভাবরূপী। বীর, করুণ, রৌদ্র, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত—এই সাতটী গৌণরস। ইহারা সম্বন্ধ হইতে উত্থিত হয়। আদৌ রতির বেদনাসত্তা থাকিলেও যে পর্য্যন্ত সম্বন্ধভাবের আশ্রয় না পায়, সে পর্য্যন্ত উহার কৈবল্যাবস্থায় ব্যক্তির সম্ভাবনা নাই। সম্বন্ধাশ্রয়ে রতির ব্যক্তি হয়। সেই ব্যক্তিগত বিশেষ ভাবসকলই গৌণরস। রসরূপ স্বীকার করত ঐ রতি আর চারিটী সামগ্রীসহযোগে সম্যক্ দীপ্তিপ্রাপ্ত হয়। রসাশ্রয়ে ব্যক্তি সিদ্ধ হইলেও সামগ্রী ব্যতীত রতি প্রকাশ পায় না। সামগ্রী চারি প্রকার অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী। বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দুই প্রকার—কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত। তাঁহাদের গুণ ও স্বভাব প্রভৃতি রতির উদ্দীপনরূপ বিভাব। অনুভাব তিন প্রকার—অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিক। ভাব, হাব প্রভৃতি বিংশতি প্রকার অলঙ্কার অঙ্গজ, অযত্নজ ও স্বভাবজ এই তিন-ভাবে বিভক্ত হইয়াছে। জৃম্ভা, নৃত্য, লুণ্ঠন প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়াগুলিকে উদ্ভাস্বর বলে। আলাপ, বিলাপ প্রভৃতি দ্বাদশটী বাচিক অনুভাব। স্তম্ভ, স্বেদ প্রভৃতি আটপ্রকার সাত্ত্বিক বিকার। নির্ব্বেদ প্রভৃতি তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাব আছে। রতির মহাভাব পর্য্যন্ত পুষ্টিকার্য্যে রস ও সামগ্রীসকলের নিত্য

প্রয়োজন আছে। এই কৃষ্ণরতি স্থায়িভাব ভক্তিরস। বদ্ধজীবে প্রপঞ্চ-সম্বন্ধবশতঃ ভক্তিস্বরূপে ইহার প্রতীতি। মুক্তজীবে প্রীতিতত্ত্বরূপে বৈকুণ্ঠাবস্থায় নিত্য বর্ত্তমান। রতির মহাভাব পর্য্যন্ত ক্রম, তাহার মুখ্য ও গৌণ রসাশ্রয় ও সামগ্রী-সাহায্যে বিচিত্রপুষ্টিপ্রাপ্তিরূপ রসসমুদ্রের অনন্ত মাধুর্য্য মুক্ত-জীবগণের নিত্য ধন। বদ্ধ জীবদিগের তাহাই সাধ্য। যদি বল, আত্মার চিন্ময় আনন্দ-রস নিত্য হইলে সাধনের প্রয়োজন কি ? তবে বলি, জীবের রতি জড়গতা হইয়া বিকৃত হইয়াছে। হৃদয়ে শুদ্ধরতির প্রাকট্য করাই ইহার সাধন। সহজ-সমাধি-যোগে ব্যাস প্রভৃতি বিদ্বজ্জনগণ দেখিয়াছেন যে, জীবের সিদ্ধ-সত্তায় রতিতত্ত্বই সর্ব্বোপাদেয়। আদর্শের ধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে বিম্বিতসত্তায় প্রতিভাত হইয়া থাকে। এতন্নিবন্ধন প্রাকৃত রতিসত্তাও সমস্ত প্রাকৃতসত্তা অপেক্ষা রমণীয় হইয়াছে। কিন্তু প্রাকৃত স্ত্রীপুরুষ-গত রতি, অপ্রাকৃত রতির নিকট অতিশয় তুচ্ছ ও জুগুপ্সিত। যথা রাসপঞ্চাধ্যায়ে—"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূ-ভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥" নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণের সহিত নিত্যসিদ্ধ জীবগণের মহা-ভাবাবধি ভাব ও মহারাসাবধি ক্রিয়া বর্ণিত হইল। জড়জন্য বাক্যের এই পর্য্যন্ত শেষ গতি। ইহার অতিরিক্ত যাহা আছে, তাহা সমাধিদ্বারা স্ফোটশক্তির প্রকাশে লক্ষিত হইবে।

ব্রজভাবগত কৃষ্ণভক্তদিগের প্রতি স্ফোটের প্রক্রিয়া—শ্রীকৃষ্ণে যাঁহাদের রাগ উদিত

হইয়াছে, অথবা পূর্ব্বরাগরূপ শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তাঁহাদের আচরণ সর্ব্বত্র বিশুদ্ধরূপে লক্ষিত হয়। এস্থলে রাগতত্ত্বের স্বরূপ বিচার করা প্রয়োজন। চিত্ত ও বিষয়ের বন্ধনসূত্রের নাম প্রীতি। সেই বন্ধনসূত্র বিষয়ের যে অংশ অবলম্বন করিয়া থাকে তাহার নাম রঞ্জকতা ধর্ম্ম। চিত্তের যে অংশ অবলম্বন করিয়া থাকে তাহার নাম রাগ। চিত্ত ও বিষয়ের বিচারটী বিশুদ্ধ আত্মগত রাগ ও অশুদ্ধ মনোগত রাগ উভয়েরই সামান্য লক্ষণ। রাগ যখন প্রথমে কিয়ৎ পরিমাণে আত্মপরিচয় দেয়, তখন তাহার নাম শ্রদ্ধা শ্রদ্ধাবান্ ও অনুরক্ত উভয়বিধ পুরুষের চরিত্র সর্ব্বত্র নির্ম্মল কারণ, জীবের রাগতত্ত্ব এক। বিষয়রাগ ও ব্রহ্মরাগে সত্তার ভিন্নতা নাই, কেবল বিষয়ের ভিন্নতা মাত্র। ঐ রাগ যখন বৈকুণ্ঠাভিমুখ হয়, তখন প্রপঞ্চ বিষয়ে রাগ থাকে না, কেবল আবশ্যক মত প্রপঞ্চ স্বীকার ঘটিয়া থাকে। স্বীকৃত বিষয় সকলও তখন বৈকুণ্ঠভাবাপন্ন হয়, অতএব সমস্ত রাগই অপ্রাকৃত হইয়া পড়ে। রাগাভাব হইলে আসক্তি অবশ্যই খর্ব্ব হয় এবং অশুদ্ধরূপে বিষয়স্বীকারে একপ্রকার অশ্রদ্ধা স্বভাবতঃ লক্ষিত হয়। অতএব ভক্তজনের পাপকার্য্য প্রায়ই অসম্ভব ; যদিও কদাচিৎ অশুদ্ধাচার হইয়া পড়ে, তজ্জন্যও তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত নাই। ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে,—পাপ—কার্য্যরূপী ও বাসনারূপী। কার্য্যরূপী পাপকে পাপ বলা যায় এবং বাসনা-রূপী পাপকে পাপবীজ বলা যায়। কার্য্যরূপী পাপে স্বরূপ-সিদ্ধাবস্থা নাই, যেহেতু বাসনা-অনুসারে একই কার্য্য কখন

পাপ, কখন নিষ্পাপ হইয়া উঠে। বাসনা অর্থাৎ পাপবীজের মূলানুসন্ধান করিলে শুদ্ধ আত্মার দেহাত্মাভিমানরূপ স্বরূপভ্রমই সমস্ত পাপবাসনার একমাত্র মূলহেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই দেহাত্মাভিমানরূপ স্বরূপ ভ্রম বা অবিদ্যা হইতে পাপ ও পুণ্য উভয়েরই উৎপত্তি। অতএব পাপ-পুণ্য উভয়ই সাম্বন্ধিক, আত্মার স্বরূপগত নয়। যে কর্ম্ম বা বাসনা সাম্বন্ধিকরূপে আত্মার স্বরূপ প্রাপ্তির সাহায্য করিলেও করিতে পারে, তাহাই পুণ্য। যদ্দ্বারা সে সাহায্যের সম্ভাবনা নাই তাহাই পাপ। কৃষ্ণভক্তি যখন আত্মার স্বরূপ ও স্বধর্ম্মালোচনারূপ কার্য্য-বিশেষ হইয়াছে, তখন যে আধারে তাহা লক্ষিত হয়, সে আধারে সমস্ত পাপপুণ্যরূপ সাম্বন্ধিক অবস্থার মূলস্বরূপ অবিদ্যা ক্রমশঃ ভর্জ্জিত হইয়া সম্পূর্ণ লোপ পাইতেছে। মাঝে মাঝে যদিও ভর্জ্জিত 'কই' মৎস্যের ন্যায় হঠাৎ পাপ-বাসনা বা পাপ উদ্গত হয়, তাহা সহসা ক্রিয়াবতী ভক্তির দ্বারা প্রশমিত হইয়া পড়ে। সে স্থলে প্রায়শ্চিত্ত-চেষ্টা বিফল। প্রায়শ্চিত্ত তিন প্রকার—কর্ম্মপ্রায়শ্চিত্ত, জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্ত ও ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত। কৃষ্ণানুস্মরণ-কার্য্যই ভক্তি-প্রায়শ্চিত্ত। অতএব ভক্তিই ভক্তিপ্রায়শ্চিত্ত। ভক্তদিগের প্রায়শ্চিত্তপ্রয়াসে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অনুতাপকার্য্য-দ্বারা জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্ত হয়। জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্তক্রমে পাপ ও পাপবীজ অর্থাৎ বাসনার নাশ হয়, কিন্তু ভক্তিব্যতীত অবিদ্যার নাশ হয় না। চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি কর্ম্মপ্রায়শ্চিত্তদ্বারা পাপ প্রশমিত হয়, কিন্তু পাপবীজ বাসনা এবং পাপ ও তদ্বাসনা-

মূল অবিদ্যা পূর্ব্ববৎ থাকে। অতি সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা-এই প্রায়শ্চিত্ত বুঝিতে হইবে।

কোন বিদেশীয় বাৎসল্যরসাশ্রিত ভক্তিতত্ত্বে অনুতাপের বিধান দেখা যায়, কিন্তু ঐ বাৎসল্যভাব—জ্ঞানমিশ্র ও ঐশ্বর্য্যগত থাকায় সেরূপ বিধান অযুক্ত নয়। কিন্তু মাধুর্য্যগতা অহৈতুকী কৃষ্ণভক্তিকে ভয়, অনুতাপ ও মুমুক্ষারূপ বৈরস্য অপকারী হইয়া পড়ে। প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধরূপ পূর্ব্বপাপ নির্ম্মূলকরণ ও আত্মার স্বরূপাবস্থান সাধন - এই দুইটী ভক্তির অবান্তর ফল, সুতরাং ভক্তসম্বন্ধে অনায়াসসিদ্ধ। জ্ঞানীদিগের পক্ষে ব্যতিরেকচিন্তারূপ অনুতাপক্রমে অপ্রারব্ধ পাপ নাশ হয়, কিন্তু পারব্ধ পাপ জীবনযাত্রায় ভুক্ত হয়। কর্ম্মীদের সম্বন্ধে পাপের দণ্ডরূপ ফলভোগক্রমেই পাপক্ষয় হয়। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে অধিকারবিচার নিতান্ত প্রয়োজন। পশুস্বভাব হইতে নরস্বভাব এবং সামান্য বৈধ স্বভাব হইতে স্বাধীন রাগাত্মক স্বভাব পর্য্যন্ত অনেক অধিকার লক্ষিত হয়। যাঁহার অধিকারে যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই তাঁহার পক্ষে গুণ এবং যাঁহার অধিকারে যাহা অকর্ত্তব্য, তাহাই তাঁহার পক্ষে দোষ। এই বিধি অনুসারে সমস্ত কার্য্য বিচারিত হইলে স্বতন্ত্ররূপে গুণদোষের সংখ্যা করিবার প্রয়োজন কি? অধিকারবিচারে যাহা এক ব্যক্তির পুণ্য তাহা অন্য ব্যক্তির পাপ। শৃগাল-কুক্কুরের পক্ষে চৌর্য্য ও ছাগের পক্ষে অবৈধ মৈথুন পাপ হইতে পারে না। মানবের পক্ষে অবশ্য তাহা পাপ বলিয়া গণ্য হয়। বিষয়-পুরুষের পক্ষে বিবাহিত স্ত্রীসঙ্গ কর্ত্তব্য। কিন্তু যাঁহার সংসার-

রাগাক্রান্ত রাগ পূর্ণরূপে পরমেশ্বরে অর্পিত হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে একপত্নী-প্রেমও নিষিদ্ধাচার কেন না বহুভাগ্যোদয়ে যে পরম-প্রীতির উদয় হইয়াছে, তাহাকে বিষয়প্রীতিরূপে পর্য্যবসান করা অবনতির কার্য্য বলিতে হইবে। পক্ষান্তরে, অত্যন্ত পশুভাবাপন্ন পুরুষের পক্ষে এক বিবাহ দূরে থাকুক, বিবাহবিধিদ্বারা স্ত্রীসংসর্গ স্বীকার করাই পুণ্য। অপিচ উপাসনাপর্ব্বে প্রথম ঈশ্বরসাম্মুখ্য হইতে আরম্ভ হইয়া ব্রজ-ভাবের উদয় পর্য্যন্ত তমোগুণ হইতে সত্ত্বগুণাবধি সগুণ ও তদনন্তর নির্গুণ; এইরূপ সাধকের স্বভাব, জ্ঞানোন্নতি ও বৈকুণ্ঠপ্রবৃত্তির কৈবল্য-অনুসারে অসংখ্য অধিকার লক্ষিত হয়। ঐ সকল ভিন্নভিন্নাধিকারে কর্ম্ম ও জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যায়। বিচারক স্বয়ং এ সকল স্থির করিয়া লইতে পারেন। পাপ-পুণ্য, ধর্ম্ম-অধর্ম্ম, নিবৃত্তি-প্রবৃত্তি স্বর্গ-নরক; বিদ্যা ও অজ্ঞান ইত্যাদি যত প্রকার দ্বন্দ্বভাব আছে, এ সমুদয়ই বিকৃত-রাগ পুরুষদিগের বাদ মাত্র; বাস্তবিক স্বরূপতঃ ইহারা কেহ দোষ গুণ নয়। সাম্বন্ধিকভাবে ইহাদিগকে গুণদোষ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। স্বতন্ত্ররূপে বিচার করিলে স্বরূপতঃ আত্ম-রাগের বিকারই দোষ ও আত্মরাগের স্বরূপাবস্থিতিই গুণ। যে কার্য্য যখন গুণের পোষক হয়, তখন তাহাই গুণ ও যে কার্য্য যখন দোষের পোষক হয়, তখন তাহাই দোষ বলিয়া সারগ্রাহি-গণ স্থির করেন। তাঁহারা অনাত্মক শুষ্ক তর্কে ও পক্ষাশ্রিত বাদসকলে সম্মত হন না। প্রীতির পুষ্টিই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহা জ্ঞাত হইয়া কৃষ্ণভক্তগণ সম্প্রদায়বিবাদে ও

বাহ্যলিঙ্গ সকলে আসক্ত হন না, অথবা বিদ্বেষও করেন না, যেহেতু তাঁহারা সামান্য পক্ষপাত কার্য্যে নিতান্ত উদাসীন।

হরিভক্ত পণ্ডিতগণ অবগত আছেন যে, তাহাকেই কর্ম্ম বলা যায় যদ্দ্বারা ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তুষ্ট হন এবং তাহাকেই বিদ্যা বলা যায় যাহাদ্বারা কৃষ্ণে মতি হয়। এইটী স্মরণ করত তাঁহারা সমস্ত প্রয়োজনসাধক কর্ম্ম করেন এবং সমস্ত পরমার্থপোষিকা বিদ্যার অর্জ্জন করেন। তদিতর সমস্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানকেই তাহারা ফল্গু বলিয়া জানেন। তাঁহারা স্বভাবতঃ স্থিতপ্রজ্ঞ, নম্রস্বভাব ও সর্ব্বভূতের হিতসাধনে তৎপর। তাঁহাদের বুদ্ধি এত স্থির যে, জীবনকালে বা জীবনাত্যয়ে নানাবিধ প্রপঞ্চ-যন্ত্রণা ঘাটিলেও পরামার্থতত্ত্ব হইতে বিচলিত হন না। রাগের প্রাদুর্ভাবে মন ও দেহের স্বভাবতঃ ভিন্নতাপ্রাপ্তিবশতই হউক অথবা রাগতত্ত্বকে উপলব্ধি করিবার জন্য স্বরূপ জ্ঞানালোচনা-দ্বারাই হউক, ব্রজভাবগত কৃষ্ণভক্তদিগের একটী সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক হইয়া উঠে। সিদ্ধান্ত এই যে, জীবাত্মা স্বাভাবতঃ শুদ্ধও কেবল অর্থাৎ মায়িকগুণের কোন অপেক্ষা করেন না। আপাততঃ যাহাকে আমরা মন বলি, তাহার নিজ সত্তা নাই, আত্মার জ্ঞানবৃত্তির প্রপঞ্চসম্বন্ধবিকারমাত্র। আত্মার সিদ্ধ-বৃত্তিসকল সাম্বন্ধিক-অবস্থায় মনোবৃত্তিস্বরূপে লক্ষিত হয়। বৈকুণ্ঠগত আত্মার স্ববৃত্তিদ্বারা কার্য্য হয়, তথায় এই মন থাকে না। আত্মার প্রপঞ্চসম্বন্ধে শুদ্ধ জ্ঞান সুপ্তপ্রায় হইলে বিকৃত জ্ঞানকেই জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করে। এই জ্ঞান মনের কার্য্য ও জড় জানিত। ইহাকেই বিষয়জ্ঞান বলা যায়। আমাদের

বর্ত্তমান দেহ প্রাপঞ্চিক, ইহার সহিত আত্মার বদ্ধকালাবধি সম্বন্ধ মাত্র। এই স্থূল ও লিঙ্গদেহের সহিত বিশুদ্ধ আত্মার সংযোগপ্রণালী কেবল পরমেশ্বরই জানেন, মানবগণের জানিবার অধিকার নাই। যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত ভক্তিযোগে ভক্তদিগের শরীরযাত্রা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। জীব স্বয়ং চিত্তত্ত্ব, স্বভাবতঃ ভগবদ্দাস এবং প্রীতিই তাঁহার একমাত্র ধর্ম্ম। আদৌ হৃদয়ানিষ্ঠানুসারে জীবের পতনকালে কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে এই অনির্দ্দেশ্য বন্ধনব্যাপার সিদ্ধ হওয়ায় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবের পক্ষে ভক্তিযোগই একমাত্র শ্রেয়ঃ। ভক্তিযোগদ্বারা ভগবৎকৃপার উদয় হইলে, অনায়াসে চিজ্জড়ের সংযোগ দূর হইবে। নিজচেষ্টা দ্বারা অর্থাৎ দেহপাত বা কর্ম্মত্যাগরূপ নিশ্চেষ্টতা অথবা ভগবদ্বিদ্রোহতা-সহকারে ইহা কখনই সিদ্ধ হইবে না, সমাধিদ্বারা এই পরম সত্যটী প্রাপ্ত হওয়া যায়। কর্ম্মজ্ঞানাত্মক মানবজীবন যখন ভক্তির অনুগত হয়, তখনই ভক্তিযোগের উদয় হয়। ইহা অবগত হওত, ব্রজভাবাঢ্য পুরুষগণ বৈকুণ্ঠস্থ হইয়া সমাধিযোগে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন। আত্মার চিৎসত্তায় যখন প্রেমের বাহুল্য হইয়া উঠে, তখন মনোময় লিঙ্গদেহে পবিত্র প্রীতি উচ্ছলিতা হইয়া মিশ্রভাবগত হয়। ঐ অবস্থায় মনন, স্মরম, ধ্যান, ধারণা ও ভূতশুদ্ধির চিন্তা ইত্যাদি মানস-পূজার নানাবিধ ভাবের উদয় হয়। নানসপূজাকার্য্যে মিশ্রভাব আছে বলিয়া তাহা পরিহার্য্য নয়; যেহেতু লিঙ্গভঙ্গপর্য্যন্ত উহা নিসর্গসিদ্ধ থাকে। জড় হইতে আদৌ যে সকল মানসক্রিয়া

সংগৃহীত হইয়া থাকে, ঐ সকলই প্রপঞ্চজনিত পৌত্তলিকভাব ; কিন্তু সমাধিগত আত্মচেষ্টা হইতে যে সকল ভাব উচ্ছলিত হইয়া মানসযন্ত্রে ও ক্রমশঃ দেহে ব্যাপ্ত হয়, সে সকল চিৎপ্রতিফলন-স্বরূপ সত্যগর্ভ। অতএব বদ্ধজীবে প্রীতির কার্য্যসকল মানসিক কার্য্য বলিয়া লক্ষিত হয় ; ঐ সকল মানসগত চিৎপ্রতিফলন পুনরায় অধিকতর উচ্ছলিত হইয়া দেহগত হয়। জিহ্বাগ্রে আসিয়া চিৎপ্রতিফলিত ভগবন্নামগুণাদি কীর্ত্তন করে। কর্ণ-সন্নিকটস্থ হইয়া ভগবন্নামগুণাদি শ্রবণ-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। চক্ষুগত হইয়া জড় জগতে প্রেমময় সচ্চিদানন্দপ্রতিফলিত ভগবন্মূর্ত্তি দর্শন করে। আত্মগত শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাবসকল দেহে উচ্ছলিত হইয়া পুলক, অশ্রু, স্বেদ, কম্প, নৃত্য, দণ্ডবন্নতি, লুণ্ঠন, প্রেমালিঙ্গন, ভগবত্তীর্থপর্য্যটন প্রভৃতি কার্য্যসকল উদিত করে। আত্মগত ভাবসকল আত্মাতেই সক্রিয়রূপে অবস্থান করিতে পারিত, কিন্তু আত্মার স্বরূপাবস্থানসম্বন্ধে ভগবৎকৃপাই প্রাকৃত জগতে চিদ্ভাবের উচ্ছলন-কার্য্যে প্রধান উদ্যোগী। বিষয়রাগকে ভগবদ্রাগরূপে উন্নত করিবার আশয়ে প্রবৃত্তির পরাগ্‌গতি পরিত্যাগ ও প্রত্যগ্‌গতি সাধনের জন্য ভগবদ্ভাবসকল বিষয়ে বিমিশ্রিত হইয়াছে। মনোযন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয়দ্বার অতিক্রম করত আত্মা যে বিষয়াভিমুখে ধাবমান হন, তাহার নাম আত্মার পরাগ্‌গতি। ঐ প্রবৃত্তিস্রোত পুনরায় স্বধামে ফিরিয়া যাইবার নাম প্রত্যগ্‌গতি। সুখাদ্য-লালসার প্রত্যগ্ধর্ম্ম-সাধনার্থে মহাপ্রসাদ-সেবন ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমূর্ত্তি ও তীর্থাদি দর্শনদ্বারা দর্শনবৃত্তির প্রত্যগ্‌গমন

সাধিত হয়। হরিলীলা ও ভক্তিসূচক গীতাদি শ্রবণদ্বারা শ্রবণ-প্রবৃত্তির প্রত্যগ্‌গতি সম্ভব। ভগবদর্পিত তুলসী-চন্দনাদি সুগন্ধি গ্রহণদ্বারা গন্ধপ্রবৃত্তির বৈকুণ্ঠগতি সনকাদির চরিত্রে সিদ্ধ হইয়াছে।

বৈষ্ণব-সংসার-সমৃদ্ধিমূলক বিবাহিত ভগবৎপর পত্নী বা পতিসঙ্গমদ্বারা স্ত্রী বা পক্ষান্তরে পুরুষসংযোগপ্রবৃত্তির প্রত্যগ্‌-গতি মনু, জনক, জয়দেব, পিপাজি প্রভৃতি বৈষ্ণবচরিত্রে লক্ষিত হয়। উৎসবপ্রবৃত্তির প্রত্যগ্‌গতি সাধনের জন্য হরি-লীলোৎসবাদির অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। এই সকল প্রত্যগ্‌ভাবান্বিত নরচরিত্র সর্ব্বদা সারগ্রাহীদিগের পবিত্র জীবনে লক্ষিত হয়। তবে কি সারগ্রাহী মহোদয়গণ কেবল চিৎপর হইয়া জড় কার্য্য-সকলকে অশ্রদ্ধা করেন? তাহা নয়। আত্মায় যোষিদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া সারগ্রাহী মহোদয়গণ কৃষ্ণভজন করেন, তথাপি সর্ব্বদাই বাহ্যদেহে শারীর কর্ম্মসকল বীরভাবে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। আহার, বিহার, ব্যায়াম, শিল্পকার্য্য, বায়ুসেবন, নিদ্রা, যানারোহন, শরীররক্ষা, সমাজরক্ষা, দেশভ্রমণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তাঁহাদের চরিত্রে যথাযোগ্য সময়ে লক্ষিত হয়। সারগ্রাহী বৈষ্ণব পুরুষদিগের মধ্যে বীরভাবে অবস্থিতি ও কার্য্য করেন। স্ত্রী জাতির আশ্রয় পুরুষ হইয়া যোষিদ্বর্গের নিকটে পূজনীয় হন। সমাজসকলে অবস্থিত হইয়া সামাজিক কার্য্যসমুদয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বালক-বালিকা-গণকে অর্থবিদ্যা শিক্ষা দিয়া প্রধান-শিক্ষক-মধ্যে পরিগণিত হন। শারীরিক ও মানসিক যত প্রকার বিজ্ঞান-শাস্ত্র আছে

এবং শিল্পশাস্ত্র ও ভাষাবিজ্ঞান, ব্যাকরণ, অলঙ্কারাদি শাস্ত্র প্রভৃতি সকলেই অর্থশাস্ত্র। ঐ সকল শাস্ত্রদ্বারা কোন না কোন শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক বা সামাজিক উপকার উৎপন্ন হয়; ঐ উপকারের নাম অর্থ। ইহার উদাহরণ এই যে, চিকিৎসাশাস্ত্রদ্বারা আরোগ্যরূপ অর্থ পাওয়া যায়। গীতশাস্ত্র-দ্বারা কর্ণও মনঃসুখরূপ অর্থ পাওয়া যায়। প্রাকৃত তত্ত্ববিজ্ঞান-দ্বারা অনেকানেক অদ্ভুত যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রদ্বারা কালাদিনির্ণয়রূপ অর্থ সংগ্রহ হয়। এই প্রকার অর্থশাস্ত্র যাঁহারা অনুশীলন করেন, তাঁহারা অর্থবিৎ পণ্ডিত। বর্ণাশ্রমাত্মক ধর্ম্মব্যবস্থাপক স্মৃতিশাস্ত্রকেও অর্থশাস্ত্র বলা যায় এবং স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণকে অর্থবিৎ পণ্ডিত বলা যায়, যে হেতু সমাজরক্ষারূপ অর্থই তাঁহাদের ধর্ম্মের একমাত্র সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য। কিন্তু পার-মার্থিক পণ্ডিতেরা ঐ অর্থ হইতে সাক্ষাৎ রূপে পরমার্থ সাধন করেন। সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ অর্থশাস্ত্রের যথোচিত আদর করত তাহার সম্যক্ আলোচনা করিতে কখনই বিরত হন না। ঐ সমস্ত অর্থশাস্ত্রের চরমগতিরূপ পরমার্থ অনুসন্ধান করত তিনি সকল অর্থবিৎ পণ্ডিতের মধ্যে বিশিষ্টরূপে পূজিত হয়েন। পরমার্থনির্ণয়ে অর্থবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহার সহকারিত্বে পরিশ্রম করিতেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তিসংস্থাপকরূপে সারগ্রাহী বৈষ্ণব বিরাজ করেন। নানাবিধ পাপীদিগকে ঘৃণা করিয়া তিনি পরিত্যাগ করেন না। কখন গোপনীয় উপদেশ; কখন প্রকাশ্য বক্তৃতা করত, কখন বন্ধুভাবে, কখন বিরোধভাবে, কখন স্বীয় চরিত্র দেখাইয়া, কখন বা পাপের দণ্ডবিধান করত

সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ পাপীদিগের চিত্তশোধনে বিশেষ তৎপর থাকেন।

সারগ্রাহী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র সর্ব্বদাই অদ্ভুত, কেন না পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তি-কার্য্যে যেমত তাঁহাদের আচরণে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ কখন প্রেমসম্পত্তির অতি বাহুল্যবশতঃ নিবৃত্তিলক্ষণও দেখা যায়। সর্ব্বজনপ্রিয় সারগ্রাহী বৈষ্ণব নির্জ্জনস্থ হইয়া কখন কখন অন্তরঙ্গ পরম রহস্য ভজনা করেন। ব্রজমাহাত্ম্য বর্ণন করিতে করিতে অত্যন্ত বলবতী প্রেমলালসার উদয় হওয়ায় কখন কখন বলেন যে, "আমার সে সৌভাগ্য কোন্ দিবস হইবে, যখন যমুনাতটস্থ শ্রীবৃন্দারণ্যে সারগ্রাহি-বৈষ্ণবজনসঙ্গে সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের ভজনা করিব। যে সারগ্রাহী বৈষ্ণবের কৃপামাত্রে কর্ম্মজড় ও জ্ঞানদগ্ধ পুরুষেরাও সারগ্রাহি-বৈষ্ণবতা লাভ করেন, সেই ভবার্ণবের কর্ণধারস্বরূপ সারগ্রাহি-বৈষ্ণবজনপদাশ্রয় আমার নিত্যকর্ম্ম হউক।" বৈষ্ণব ত্রিবিধ—কোমলশ্রদ্ধ, মধ্যমাধিকারী ও উত্তমাধিকারী। কর্ম্মকাণ্ড ও তদ্দত্ত ফলকে নিত্যজ্ঞান করিয়া পরমার্থবিরত পুরুষেরা কর্ম্মজড়। কেবল যুক্তিযোগে নির্ব্বিশেষব্রহ্মনির্ব্বাণসংস্থাপক পুরুষেরা নিত্য-বিশেষ-জ্ঞানাভাবে জ্ঞানদগ্ধ অর্থাৎ নিতান্ত শুষ্ক ও নীরস। আত্মার চরমাবস্থায় নিত্য-বিশেষগত বৈচিত্র্য স্বীকার-পূর্ব্বক যাঁহারা আত্মা হইতে নিত্য ভিন্ন সর্ব্বানন্দধাম পরমৈশ্বর্য্য ও পরমমাধুর্য্যসম্পন্ন করুণাময় ভগবানের উপাসনাকার্য্যকে জীবের নিত্যধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা ভক্ত বা বৈষ্ণব। কর্ম্মজড় ও জ্ঞানদগ্ধ পুরুষেরা সৌভাগ্যক্রমে ও সাধুসঙ্গ-প্রভাবে বৈষ্ণবপদবী প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ নরস্বভাবে অবস্থিতি

করেন। কোমলশ্রদ্ধ ও মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবগণের যে মল লক্ষিত হয়, তাহা প্রবলরূপে কর্ম্মজড় ও জ্ঞানদগ্ধ পুরুষে লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ কর্ম্মজড় ও জ্ঞানদগ্ধ পুরুষদিগের বৈষ্ণবপদবী প্রাপ্ত হইলেও পূর্ব্বাবস্থা হইতে জড়তা ও কুতর্কের যে অবশিষ্টাংশ অভ্যাসক্রমে থাকে, তাহাই কোমলশ্রদ্ধ ও মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবদিগের হেয়াংশ। যাহা হউক, ঐ হেয়াংশ কেবল অজ্ঞান ও কুসংস্কারের ফল, ইহাতে সন্দেহ নাই। ত্রিবিধ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে উত্তমাধিকারী পুরুষের কুসংস্কার ও জড়তা থাকে না। অনেক-বিষয়-সম্বন্ধে জ্ঞানাভাব থাকিতে পারে, কিন্তু সারগ্রাহি-বৃত্তি প্রবলরূপে সমস্ত কুসংস্কারকে একেবারে দূর করে। মধ্য-মাধিকারী বৈষ্ণব ভারবাহী হইতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু সার-গ্রাহিপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে বলবতী না থাকায় তাঁহাদের হৃদয়ে পূর্ব্ব কুসংস্কারজনিত কিছু কিছু সংশয় বলবান্ থাকে। ইহাঁরা চিদ্গতবিশেষতত্ত্ব ও সহজ সমাধি স্বীকার করিয়াও যুক্তির মুখাপেক্ষায় বৈকুণ্ঠতত্ত্বকে সম্যগ্রূপে দর্শন করিতে পারেন না। কোমলশ্রদ্ধ পুরুষেরা বৈষ্ণবপদবী প্রাপ্ত হইয়াও কুসংস্কারের নিতান্ত বশবর্ত্তী থাকেন। ইহাঁরা কর্ম্মসঙ্গী ও বৈধ শাসনের অধীন। যদিও ইহাঁরা স্ফোটকৃপা লাভের সাক্ষাৎ অধিকারী নহেন, তথাপি উত্তমাধিকারীর সাহায্যে আলোচনা করিয়া উত্তমাধিকারিত্ব লাভ করিতে পারিবেন। অতএব ত্রিবিধ বৈষ্ণবেরাই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির সংবর্দ্ধনার্থ স্ফোটতত্ত্ব আলোচনায় পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যাঁহারা অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠের

ভাব প্রথমে বর্ণন করেন, তাঁহারা জড়ভাবসকলকে চিত্তত্ত্বে আরোপ করিয়া পরে কুসংস্কার দ্বারা তাহাতে মুগ্ধ হন। পরে ঐ সকল সংস্কারকে কূটযুক্তিদ্বারা উক্ত প্রকারে স্থাপন করিয়াছেন। বাস্তবিক বৈকুণ্ঠ ও ভগবদ্বিলাস-বর্ণন সমস্তই প্রাকৃত, এইরূপ সিদ্ধান্ত কেবল তত্ত্বজ্ঞানাভাববশতঃই হয়। যাহারা স্ফোট-শক্তিলাভ করিয়া গাঢ়রূপে চিত্তত্ত্বের আলোচনা করেন নাই, তাঁহারা কাজে কাজেই এরূপ তর্ক করিবেন। বস্তুতঃ যে সকল বিচিত্রতা জড়জগতে পরিদৃশ্য হয়, সে সকল চিজ্জগতের প্রতিফলন মাত্র। চিজ্জগৎ ও জড়জগতে বিভিন্নতা এই যে, চিজ্জগতে সমস্তই আনন্দময় ও নির্দ্দোষ এবং জড়জগতে সমস্তই ক্ষণিক সুখ-দুঃখময় ও দেশকালনির্ম্মিত হেয়ত্বে পরিপূর্ণ। অতএব চিজ্জগৎ সম্বন্ধে বর্ণনসকল জড়ের অনুকৃত নয়, কিন্তু ইহার অতি বাঞ্ছনীয় আদর্শ। বিশেষ ধর্ম্মকর্ত্তৃক নিত্যধামের যে বৈচিত্র্য স্থাপন হইয়াছে, তাহা নিত্য হইলেও সমস্ত বৈকুণ্ঠ-তত্ত্বটী অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ, যেহেতু তাহা প্রকৃতির পর তত্ত্ব অর্থাৎ দেশ-কাল-ভাবদ্বারা প্রাকৃত তত্ত্বসকল খণ্ড খণ্ড হইয়াছে, পরতত্ত্বে সেরূপ সদোষ খণ্ডভাব নাই। নিত্যসিদ্ধ ও সিদ্ধীভূত জীবদিগের সম্বন্ধে নিত্য শ্রীকৃষ্ণদাস্যই নিত্যসুখ। চিদাত্মার বিমলানন্দবিলাস বর্ণনে জড়াসরস্বতী অশক্তা, যে বাক্যসকল-দ্বারা বর্ণিত হইবে ঐ সকল বাক্য জড় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যদিও বাক্যদ্বারা স্পষ্ট বর্ণনে অশক্ত, তথাপি "সারজুট্-বৃত্তিদ্বারা সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক" ভগবদ্বার্ত্তা যথাসাধ্য বর্ণিত হইতে পারে। বাক্যসকলে সামান্য অর্থ করিতে গেলে বর্ণিত

বিষয় উত্তমরূপে উপলব্ধ হইবে না; এতদ্ধেতুক সমাধি অবলম্বন-পূর্ব্বক এতৎতত্ত্বের উপলব্ধি করিতে হইবে। অরুন্ধতী-সন্দর্শন-প্রায় স্থূলবাক্য হইতে তৎসন্নিকর্ষ সূক্ষ্মতত্ত্বের সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। যুক্তি প্রবৃত্তি ইহাতে অক্ষম, যেহেতু অপ্রাকৃত বিষয়ে তাহার গতি নাই, কিন্তু আত্মার সাক্ষাদ্দর্শনরূপ আর একটী সূক্ষ্মবৃত্তি সহজসমাধি-নামে লক্ষিত হয়, সেই বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বর্ণন ও শ্রবণ দ্বারা তত্ত্বোপলব্ধি করিতে হইবে। যে সকল উত্তমাধিকারিগণের ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি উদয় হইয়াছে; তাঁহারাই স্বভাবতঃ আত্মসমাধিতে বৈকুণ্ঠ দর্শন করেন। সেই সকল উত্তমাধিকারী বৈষ্ণবের শ্রীচরণাশ্রয় করিলে তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক স্ফোটশক্তির স্ফূরণ দ্বারা তাদাত্ম্যসম্পন্ন করিলে তবে আত্মসমাধি লাভে অপ্রাকৃততত্ত্বে অধিকার লাভ হয়।

অচিন্ত্য-অনন্ত-শক্তিশালী পরতত্ত্বের শক্তিসমূহ ও শক্তিপরিণত বস্তু সমূহের যাহা পুরুষের যুক্তিতর্ক-গম্য নহে তাহা একমাত্র যে শব্দশক্তির দ্বারা প্রকাশিত ও চিদেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত ও ক্রিয়াশীল হয় তাহাই স্ফোটশক্তি। সেই অপ্রাকৃত বিষয় উপনিষদে, ব্রহ্মসূত্রে ও তাহার অকৃত্রিমভাষ্য-ভূত শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতা ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদি শব্দপ্রমাণের মধ্যে সেই সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত গ্রাথিত আছে। তাহাই শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রচারিত ও গৌড়ীয়-গোস্বামিগণের প্রকাশিত দার্শনিক-সিদ্ধান্ত। শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলে, রামানন্দসংবাদে, শ্রীরূপ-সনাতন-শিক্ষায় সেই স্ফোটশক্তির প্রকাশ ও বর্ণনমুখে শক্তি-সঞ্চারণে উপলব্ধি করাইয়াছিলেন। তাহাই শ্রীল সনাতন-

গোস্বামিপাদ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে ও শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে, শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীলঘুভাগবতামৃত ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থাদিতে, শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ ষট্‌সন্দর্ভে ও সর্ব্ব-সম্বাদিনীতে বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। সেই অমূল্যরত্ন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণন করিয়াছেন। 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৭) শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন আচার্য্যগণ উক্ত স্ফোটবাদেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "ব্রহ্ম—শব্দমুলক, শব্দ প্রমাণক; ব্রহ্ম,—ইন্দ্রয়াদি প্রত্যক্ষ প্রমাণক নহেন। সেই জন্য ব্রহ্মের স্বরূপ—'যথাশব্দ' অর্থাৎ শব্দ প্রমাণানুরূপ। মণি, মন্ত্র, ঔষধ-প্রভৃতির শক্তি বিভিন্ন দেশ-কালাদি-মিনিত্ত বশতঃ বিচিত্র ও বহু বিরদ্ধ কার্য্য উৎপন্ন করে। 'এই বস্তুর এই শক্তি, এই সহায়, এই বিষয়, এই প্রয়োজন,—এই-সকল শক্তি বিনা উপদেশে, কেবলমাত্র তর্কে জানা যায় না (শঙ্কর ভাষ্য)। পৌরাণিকগণ বলেন—"যে সকল বস্তু অচিন্ত্যনীয়, তাহা তর্কের দ্বারা মীমাংসা করা যাইতে পারে না। যাহা প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ অপ্রাকৃত, তাহাই অচিন্ত্যের লক্ষণ। অতএব অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপাববোধ শব্দ মূলক।"

পরতত্ত্ব শব্দমূলক, তাঁহার শব্দ ও শব্দীতে ভেদ না থাকায় তাঁহার শক্তিও শব্দও তাঁহা হইতে অভিন্ন। তাঁহার সর্ব্ববিধ প্রকাশ ও বিক্রম শব্দদ্বারাই প্রকাশিত হয়। শব্দ হইতেই সর্ব্ব-শক্তি প্রকাশিত হয়। চিজ্জগতের বিভিন্ন উপাদান, ভাব, রস ও লীলাদি সেই শব্দ হইতেই প্রকাশিত হয়। জীব ও জড়জগতের সম্বন্ধেও সেই শব্দই মূল এবং প্রমাণস্বরূপ। শব্দই সকল বস্তু,

ভাব, রস ও লীলাদি প্রকট করিয়া প্রকাশ করেন, তাহাই প্রমাণ-স্বরূপে গ্রাহ্য হয়। সর্ব্ব শক্তি ও প্রকাশাদি—"যস্য দেবে পরা-ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ"॥ বিচারে প্রকাশিত হয়। সেই স্ফোটই বিস্ফারিত হইয়া মহাশক্তি প্রকাশ করে। তাহার বিকৃত প্রতিফলনেই জগৎ ধ্বংস করে, মণি-মন্ত্র-ঔষধিরূপে বিভিন্ন মহাশক্তি প্রকাশ করে। মন্ত্র প্রভাবে ধনুর্ব্বানাদিতে মহাশক্তির প্রকাশ করে। গীতবাদ্যাদিতে রাগ-রাগিণীরূপধারণ ও মহা আকর্ষণীশক্তির প্রকাশ করে। অগ্নি-বিষাদির মহাশক্তিকেও স্তব্ধীভূত করে। ক্ষুদ্র জীবশক্তির প্রতিও বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর আবাহন করাইয়া সর্ব্বকার্ষক শ্রীভগবান্‌কেও আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। স্বরূপ শক্তিতেও বিভিন্ন সেবোপকরণ অপ্রাকৃত দ্রব্যের প্রভূত অচিন্ত্যশক্তি প্রকট করাইয়া শ্রীভগবানের লীলারস পোষণ করে। সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বপাত্রে সর্ব্ব-শক্তিপরিপূর্ণ ভাব প্রকাশ করিতে পারে। কেহ কোন প্রকারে সে শক্তিকে প্রতিহত করিতে পারে না।

পঞ্চমক্রম।

শ্রীচৈতন্যদেব ও স্ফোটবাদ—সর্ব্বাবতারীর ও অবতারী সর্ব্বসিদ্ধান্তের শুদ্ধত্ব সমঞ্জসকারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টক—স্ফোটবিচারেরই পরিস্ফুট বিজ্ঞান। শ্রীমন্মহাপ্রভু অতি অল্পাক্ষরে স্ফোটের বিচার বলিয়াছেন, "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" বিদ্বদ্‌রূঢ়ি-বৃত্তিতে প্রত্যেক শব্দ বিষ্ণু-বাচক—পরব্রহ্ম

বাচক। প্রত্যেক শব্দে স্ফোটধর্ম্ম হইতে বিদ্বদ্রূঢ়ি প্রকাশিত। মহান্ত গুরুর দ্বারা বর্ণবেধ সংস্কার হইলে—দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে স্ফোটধর্ম্মগত বিদ্বদ্রূঢ়ি প্রকাশিত হয়। রূঢ়িবৃত্তি শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করে। শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়া হইতে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া রূঢ়িবৃত্তিতে স্ফোটবাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি আন্তরস্ফোটে জগৎ কৃষ্ণময় দর্শন করিতে লাগিলেন ও বহিঃ-স্ফোট প্রকাশে "অহর্নিশ শ্রবণে শুনয়ে কৃষ্ণনাম। বদনে বোলয়ে "কৃষ্ণচন্দ্র" অবিরাম। পড়াইতে বৈসে গিয়া ত্রিজগৎ-রায়। কৃষ্ণ-বিনু কিছু আর না আইসে জিহ্বায়॥" "এবে যত বাখানেন নিসাগ্নি-পণ্ডিত। শব্দ-সনে বাখানেন কৃষ্ণ-সমীহিত। গয়া হৈতে যাবৎ আসিয়াছেন ঘরে। তদবধি কৃষ্ণ বই ব্যখ্যা নাহি স্ফুরে॥ সর্ব্বদা বলেন 'কৃষ্ণ'—পুলকিত অঙ্গ। ক্ষণে হাস্য, হুঙ্কার, করয়ে বহু রঙ্গ॥ প্রতি-শব্দে ধাতু-সূত্র একত্র করিয়া। প্রতিদিন কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা করেন বসিয়া॥"

"সিদ্ধ বর্ণসমাম্নায় ?" বলে শিষ্যগণ। প্রভু বলে,—"সর্ব্ব-বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ।" শিষ্য বলে,—"বর্ণ সিদ্ধ হইল কেমনে ?" প্রভু বলে,—"কৃষ্ণ-দৃষ্টিপাতের কারণে॥" শিষ্য বলে,—"পণ্ডিত, উচিত ব্যাখা কর"। প্রভু বলে,—"সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্মঙর॥ কৃষ্ণের ভজন কহি—সম্যক্ আম্নায়। আদি-মধ্য-অন্তে কৃষ্ণ ভজন বুঝায়॥" কলাপ বা কাতন্ত্র-ব্যাকরণের প্রথম সূত্র—সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ" অর্থাৎ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের পাঠক্রম—চির-প্রসিদ্ধ। ছাত্রগণ বলিতে লাগিলেন যে, বর্ণপাঠ-রীতি ত' সুপ্রসিদ্ধ ? তদুত্তরে প্রভু বলিলেন যে, স্ফোট বিচারে সকল

বর্ণ নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত-চিন্ময়ী পরমুখ্যা বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে নারায়ণকেই প্রতিপাদন করেন। আরোহ-পন্থী বা অধিরোহ-বাদী বর্ণের অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তির সাহায্যে শব্দশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, কিন্তু প্রভু অবতার-বিচার অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক-বর্ণকেই ভগবদ্বাচক বলিয়া জানাইলেন। প্রত্যেক বর্ণকে অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তির সাহায্যে মাপিতে গেলে বদ্ধজীব নারায়ণেতর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের উদ্দেশ লাভ করে, কিন্তু বর্ণের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি, প্রত্যেক বর্ণই যে সাক্ষাৎ মূর্ত্তবর্ণবিগ্রহ নারায়ণ,—ইহাই প্রতিপাদন করে। অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি আধ্যক্ষিক-জ্ঞানীকেপ্রজল্পী করিয়া তুলে, আর সাক্ষাৎ স্বপ্রকাশ বাচ্যবস্তু শ্রীনারায়ণ বর্ণদ্বারা আপনাকে প্রকটিত করিয়া জীবকে হরিকীর্ত্তনকারী করান। মহাপ্রভু বর্ণসিদ্ধির কারণ নির্ণয় করিলেন,—বাচ্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের নিরীক্ষণহেতু অর্থাৎ কৃষ্ণের অভিন্ন পূর্ণ-শুদ্ধ-নিত্য-মুক্তবাচক, ব্যঞ্জক বা সূচক অথবা দ্যোতক হওয়ায় প্রত্যেক বর্ণই স্ফোটবিচারে নিত্যসিদ্ধ। স্ফোটবিচারে প্রত্যেক শাস্ত্রার্থ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ স্মৃতিউৎপাদক শব্দব্রহ্ম। শ্রীকৃষ্ণভজন-প্রণালী ও স্ফোটবিচার সম্যক্ আম্নায় পারম্পর্য্যে আগত হয়। যথা সম্যক্ আম্নায়,—"আমনতি উপদিশতি বিষ্ণোঃ পরমং পদম্; আম্নায়তে সম্যগভ্যস্যতে মুনিভিরসৌ, আম্নায়তে উপদিশ্যতে পরধর্ম্মোঽহনেনেতি আম্নায়ঃ 'বেদঃ'; সমাম্নায়। ভাঃ ১০।৪৭।৩৩ শ্লোকে 'সমাম্নায়'-শব্দে শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত টীকায়—"সমাম্নায়ো বেদঃ"। (গীতায় ১৫।১৫ শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তি)—"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতি-

জ্ঞানমপোহনঞ্চ। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥" অর্থাৎ 'আমিই সর্ব্বজীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অবস্থিত; আমা-হইতেই জীবের কর্ম্মফলানুসারে স্মৃতিজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞানের ভ্রংশ ঘটে; আমিই সর্ব্ববেদবেদ্য ভগবান্, সমস্ত বেদান্ত-কর্ত্তা এবং বেদান্ত-বিৎ।" ভাঃ ১২।১৩।১—'ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুদ্গণ দিব্যস্তবে যাঁহাকে স্তব করেন, অঙ্গ পদক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদসকল যাঁহার গান করিয়া থাকেন, সমাধি-অবস্থায় তদ্গত-চিত্ত হইয়া যোগিগণ যাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত জানেন না, সেই পরম-দেব শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি।' ভাঃ ১১।২১।৪২—৪৩ শ্লোকে অর্থাৎ 'কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যসমূহদ্বারা শ্রুতি কাহাকে বিধান করেন, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যসমূহদ্বারা শ্রুতি কাহাকে প্রকাশ করেন এবং পরিণামে নিষেধ করিবার উদ্দেশে কোন্ বিষয়েরই বা প্রস্তাব করেন?—ইত্যাদি বেদবাণীর তাৎপর্য্য আমি-ব্যতীত আর অন্য কেহই জানে না। এ বিষয় অত্যন্ত নিগূঢ় হইলেও এক্ষণে তোমার প্রতি কৃপা করিয়া বলিতেছি যে, সেই বেদবাণী কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞরূপে আমাকেই বিধান করে, দেবতাকাণ্ডে তত্তদ্দেবতা-রূপে আমাকেই প্রকাশ করে, আর আকাশাদি প্রপঞ্চের উল্লেখপূর্ব্বক পুনরায় যে উহা নিরাকরণ করেন, তাহাও আমি ব্যতীত পৃথক্-সত্তাক নহে,—ইহাই সকল-বেদের তাৎপর্য্য; অর্থাৎ স্ফোটের শব্দ প্রকাশক শাস্ত্ররূপ বেদ পরমার্থভূত বাস্তব-বস্তু আমাকেই আশ্রয়পূর্ব্বক জড়ভেদকে মায়ামাত্ররূপে প্রস্তাব করিয়া পরিশেষে উহার নিষেধানন্তর চিন্মাত্র-ব্রহ্মজ্ঞানকে

অতিক্রমপূর্ব্বক চিদ্‌-বিলাসবৈকুণ্ঠবৈচিত্র্য-বর্ণনে পর্য্যবসিত হইয়াই প্রসন্না হন।' হরিবংশে'—"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥" অর্থাৎ 'বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে,—সর্ব্বত্র একমাত্র শ্রীহরিই কীর্ত্তিত হন। ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি। স্ফোটের পরমযৌগিক-বৃত্তির সাহায্যে প্রত্যেক-শব্দের ধাতু অর্থাৎ ক্রিয়াবাচক প্রকৃতি ও তত্তৎ-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-সাধকসূত্র সংযোগ করিয়া তাহার কৃষ্ণতাৎপর্য্যপর ব্যাখ্যা করিলেন। "প্রভুর না স্ফুরে কৃষ্ণ-ব্যতিরেকে আন। শব্দ মাত্রে কৃষ্ণভক্তি করয়ে ব্যাখ্যান॥ পড়ুয়া সকলে বলে,—"ধাতু-সংজ্ঞা কার্?" প্রভু বলে—"শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যার॥" শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ণ-শুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত চিন্ময়ী পরম-মুখ্যা স্ফোটের বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে প্রত্যেক শব্দেরই কৃষ্ণভক্তিপরা ব্যাখ্যা করিতেন। কৃষ্ণ-ব্যতীত অন্য দ্বিতীয় বস্তুর অভিনিবেশক্রমে কোন শব্দার্থ তাঁহার কৃষ্ণ-কীর্ত্তনরত জিহ্বায় ব্যাখ্যাত হয় নাই। 'ধাতু'-শব্দে বাচ্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরা, অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি যেমন শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্য, মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যাত্মক চিদ্বিলাস প্রকাশ করে বলিয়া সেই শক্তি ও শক্তিমান্ পরস্পর অভিন্নরূপে সংযুক্ত, তদ্রূপ স্ফোটের যোগবৃত্তিতে প্রত্যেক বাচক-শব্দের প্রকৃতি বা ধাতুও তাহার অভ্যন্তরে অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত থাকিয়া তাহার অর্থ বা শক্তি প্রকাশ করে। ভাঃ ১০।১৪।৫০-৫৭ শ্লোকে—"সকল প্রাণীর আত্মাই 'পরম-প্রিয়'; অপত্য-বিত্তাদি অন্যান্য-বস্তু আত্মার প্রিয়

বলিয়াই 'প্রিয়তর' হইয়া থাকে। এই কারণেই দেহিগণের
স্ব-স্ব-অহঙ্কারাস্পদ দেহে যেরূপ স্নেহ হয়, মমতাবলম্বন পুত্র
বিত্ত-গৃহাদিতে তদ্রূপ হয় না। যে-সকল পুরুষ দেহাত্ম
তাহাদের দেহ যেরূপ 'প্রিয়তর,' দেহ-সম্পর্কিত পুত্রাদি তদ্রূ
'প্রিয়' নহে। কিন্তু যদ্যপি দেহ মমতা ভাজন, তথাপি তা
আত্মবৎ প্রিয় হইতে পারে না; যেহেতু দেহ জীর্ণ হইয়া মৃত্যু
আসন্ন হইলেও জীবিতাশা বলবতী থাকে। অতএব সকল
দেহীর আত্মাই প্রিয়তর, আত্মার নিমিত্তই চরাচর সকল জগ
প্রিয় হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণই সকল দেহীর আত্মা; তিনি
জগতের হিতার্থ স্বরূপ-শক্তি চিন্ময়ী মায়া-দ্বার
এখানে দেহীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। বস্তুতঃ, যে-
পুরুষ সর্ব্ব-জগতের কারণরূপে শ্রীকৃষ্ণকে জানেন তাঁহাদে
সমক্ষে স্থাবর-জঙ্গম সমুদয় জগৎ ভগবদ্রূপে প্রকাশ পায়
তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যে, তদ্ব্যতীত অন্যকোন বস্তুই নাই
যাবতীব বস্তুর পরম অর্থ তাহাদের কারণেই অবস্থিত; ভগবা
শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত কারণেরও কারণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ব্যতী
অন্যবস্তু কি, তাহা নিরূপণ কর।" কৃষ্ণেতর অন্য সম
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ প্রজল্প ও রসাভাষাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব
নিষ্কপট সেবোন্মুখ-জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ কর। বাহ্যজ
বস্তুসমূহকে ভোক্তৃ-অভিমানে ভোগ্যজ্ঞানে ভোগ করি
পরিবর্ত্তে আপনাকে কৃষ্ণের নিত্য সেবোপকরণ জানিয়া সর্ব
কৃষ্ণের শুদ্ধ নাম-কীর্ত্তনানুকূল সেবানুষ্ঠানাদি-সম্পাদনে নি
থাক। নিষ্কপট সেবোন্মুখ-কর্ণ-দ্বারা ভোগপর অনিত্য অ

শব্দ-কোলাহল-শ্রবণের মূলে যে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেচ্ছা, তাহা পরিহার করিয়া কৃষ্ণাভিন্ন শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণনাম-কথা শ্রবণ কর। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে অনিত্য সুখলাভের আশা বিসর্জ্জন করিয়া নিরন্তর সেবোন্মুখ শুদ্ধচিত্তে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ কর।

ভাঃ ১।২।১৪—অতএব ভক্তিপ্রধান ধর্ম্মই অনুষ্ঠেয় হওয়ায় একাগ্রমনে ভক্তবৎসল বাসুদেবেরই শ্রবণ, কীর্ত্তন, মনন এবং অর্চ্চন কর্ত্তব্য।' ভাঃ ২।১।৫—অতএব, যে ব্যক্তি অভয়পদ মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার পক্ষে সর্ব্বাত্মা ভগবান্ পরমেশ্বর শ্রীহরিরই শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ অবশ্য কর্ত্তব্য।' ভাঃ ২।২।৩৬—'অতএব সর্ব্বাত্ম-দ্বারা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ভগবান্ শ্রীহরিরই শ্রবণ কীর্ত্তন এবং স্মরণ কর্ত্তব্য।'

ভাঃ ৬।১।১৯—যে-সকল ব্যক্তি কৃষ্ণপাদপদ্মে তদ্-গুণানুরক্ত চিত্ত একবারমাত্র নিবেশ করেন, তাঁহাদের তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বপাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত কৃত হওয়ায়, যম ও পাশধারী যমদূতগণ স্বপ্নেও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হন না। ইত্যাদি।

"এইমত পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি। হেন কৃষ্ণে, ভাই-সব! কর' দৃঢ় ভক্তি॥ বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম। অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ কর' ধ্যান॥ যাঁহার চরণে দুর্ব্বা-জল দিলে মাত্র। কভু নহে যমের সে অধিকার-পাত্র॥ অঘ-বক পূতনারে যে কৈলা মোচন। ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন-চরণ॥ পুত্রবুদ্ধি ছাড়ি' অজামিল সে স্মরণে। চলিলা বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণচরণে॥ যাঁহার চরণ সেবি' শিব—দিগম্বর। যে-চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর॥ অনন্ত যে

চরণ-মহিমা-গুণ গায়। দন্তে তৃণ করি' ভজ হেন কৃষ্ণ-পা'য় ॥ যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণ-পাদপদ্মে ভক্তি ॥ কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ ধন। চরণে ধরিয়া বলি,—'কৃষ্ণে দেহ' মন' ॥" "প্রভু বলে,—"ধাতু-সূত্র বাখানিলুঁ কেন?" পড়ুয়া-সকল বলে,—'সত্য অর্থ যেন ॥ যে-শব্দে যে-অর্থ তুমি করিলা বাখান। কার্ বাপে তাহা করিবারে পারে আন? যতেক বাখান' তুমি,—সব সত্য হয়। সবে যে উদ্দেশে পড়ি,—তার অর্থ নয় ॥" "সূত্ররূপে কোন্ বৃত্তি করিয়ে বাখান?" শিষ্যবর্গ বলে,—"সবে এক হরিনাম ॥ সূত্র-বৃত্তি-টীকায় বাখান' কৃষ্ণ মাত্র। বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র?" "দশদিন ধরি' কর' যতেক ব্যাখ্যান। সর্ব্ব-শাস্ত্রে-শব্দে—কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণনাম ॥" "শব্দের অশেষ অর্থ—তোমার গোচর। যে বাখান' হাসি' তাহা কে দিবে উত্তর?" পড়ুয়া-সকল বলে,—"বাখান উচিত। সত্য 'কৃষ্ণ'—সকল শাস্ত্রের সমীহিত ॥ অধ্যয়ন এই সে—সকল-শাস্ত্র-সার। তবে যে না লই'—দোষ আমা সবাকার ॥ মূলে যে বাখান' তুমি, জ্ঞাতব্য সে-ই সে। তাহাতে না লয় চিত্ত নিজ-কর্ম্মদোষে ॥"

আপনি স্ফোটের বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তির সাহায্যে শব্দের যে অর্থ করেন ও করিয়াছেন, তাহাই একমাত্র বাস্তব নিত্য-সত্য। আমরা অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তির সাহায্যে শব্দের যে উপদেশ বা তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করি, তাহা তাৎকালিক অর্থপ্রতিম হইলেও যথার্থ বা প্রকৃত সত্যার্থ নহে, পরন্তু কদর্থমাত্র। আপনিই শব্দ-শাস্ত্রে

পরম সর্ব্বোত্তম ও বিশারদ; শব্দের যোগ, রূঢ়ি, যোগরূঢ়ি, গৌণী, মুখ্যা, লক্ষণা ও অভিধা প্রভৃতি নানা-বৃত্তিদ্বারা অর্থ ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করিতে আপনিই অভিজ্ঞতম। এইরূপ কৃষ্ণপর অধ্যয়নই সর্ব্বশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় বা তাৎপর্য্য, তথাপি আমরা যে আপনার কৃত কৃষ্ণপর সত্যার্থ গ্রহণ করি না, তাহাতে আমাদেরই অপরাধ। আসল কথা,—আপনি যেরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করেন বা করিলেন, তাহা উপলব্ধি করাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন; কিন্তু দুরদৃষ্ট-দোষে আমাদের চিত্ত আপনার কৃত সর্ব্বশাস্ত্রসার সত্যার্থের গ্রহণে অসক্ত হইতেছে। "পরং-ব্রহ্ম বিশ্বম্ভর শব্দ-মূর্ত্তিময়। যে-শব্দে যে বাখানেন সে-ই সত্য হয়॥

শ্রীশচীমাতাকে লক্ষ্য করিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভু স্ফোটের-বিদ্বদ্‌রূঢ়িগত সকল কৃষ্ণ ভজনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

"প্রভু বলে,—"ভাই সব! কহিলা সুসত্য। আমার এ-সব কথা—অন্যত্র অকথ্য॥ কৃষ্ণবর্ণ এক-শিশু মুরলী বাজায়। সবে দেখি,—তাই ভাই! বলি সর্ব্বথায়॥ যত শুনি শ্রবণে, সকল—কৃষ্ণনাম। সকল ভুবন দেখি গোবিন্দের ধাম॥" "কৃষ্ণ-বিনু আর বাক্য না স্ফুরে আমার। সত্য আমি কহিলাঙ চিত্ত আপনার॥" "আশীবাদ করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥ "দিবসেকো আমি যদি হই কৃষ্ণদাস। তবে সিদ্ধ হউ তোমা' সবার অভিলাষ॥ তোমরা—সকলে লহ কৃষ্ণের শরণ। কৃষ্ণনামে পূর্ণ হউ সবার বদন॥ নিরবধি শ্রবণে শুনহ কৃষ্ণ-নাম। কৃষ্ণ হউ তোমা' সবাকার ধন প্রাণ। যে পড়িলা,

সে-ই ভাল, আর কার্য্য নাই। সবে মেলি 'কৃষ্ণ' বলিবাঙ এক ঠাঁই॥ কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সবার।" "এই মতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস। সংকীর্ত্তন আরম্ভের হইল প্রকাশ॥" "পড়িলাঙ শুনিলাঙ যতদিন ধরি'। কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর' পারপূর্ণ করি॥"

পরবিদ্যা-বধূজীবন সাক্ষাৎ শুদ্ধসরস্বতী-পতি মূর্ত্ত-শব্দ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের পরবিদ্যা-বিলাসে আশীর্ব্বাদরূপে স্ফোটের স্ফূরণ হওয়ায় শিষ্যবর্গ স্ফোটের কৃপা লাভ করিয়া তাদাত্ম্য হইয়া পূর্ণ-প্রকাশে যোগদান করিলেন। প্রভুর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের আরম্ভমুখেই তাঁহার বিদ্যা-বিলাসের পরিপূর্ণতা প্রকাশিত হইয়াছিল। 'সংকীর্ত্তন'-শব্দে বহুলোক মিলিয়া যে শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার কীর্ত্তন, এবং তাদৃশ কীর্ত্তনকালে সেবোন্মুখ-জনগণের তত্তদ্ বিষয়ের 'শ্রবণ'কেও লক্ষ্য করে। ইহাই সঙ্কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা সম্যগ্‌ভাবে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তিত না হইলে অনাদিবহির্ম্মুখ কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের প্রাপঞ্চিক-বিষয়ে অভিনিবেশত্যাগের আর আদৌ কোন সম্ভাবনা থাকে না। যদি পরলোকের অর্থাৎ পরব্যোম বা পূর্ণ-চেতন-রাজ্যের চিন্ময়ী কৃষ্ণকথা ইন্দ্রিয়তর্পণপর মানবগণের নিকট স্ফোটের স্ফুরণে উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে মনঃ-কল্পিত বিবিধ ইন্দ্রিয়-তর্পণপর প্রচেষ্টাই ধর্ম্মের নামে প্রচলিত হইয়া জগজ্জঞ্জাল উপস্থাপিত করিবে। অমন্দোদয়-দয়া-সিন্ধু মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অমন্দোদয়-দয়ার ও অহৈতুকী

কৃপার বশবর্ত্তী হইয়া সমগ্র অচৈতন্য জগদ্‌বাসীকে তাহাদের অবিদ্যা-জনিত জড়াভিনিবেশ হইতে রক্ষা করিবার মানসে স্ফোটের শুদ্ধ-চৈতন্যময়ী কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদয় করাইবার জন্য তদ্বৃত্তি কৃষ্ণসেবা-পরাকাষ্ঠা-লাভই যে কৃষ্ণসেবানুগা পরবিদ্যার চরম ফল, তাহা প্রচার করিয়াছেন।

প্রভু বলিলেন,—আমি যে এতকাল যাবৎ শব্দ-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিয়াছি, সেই পঠন-পাঠনের, অধ্যয়ন-অধ্যাপনের ফল-স্বরূপ কৃষ্ণকীর্ত্তনই একমাত্র সার বলিয়া বুঝিয়াছি। উহাই বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য অভিধেয়। অতএব হে ছাত্রগণ, তোমাদের বিদ্যানুশীলনের চরম-ফল-স্বরূপ অনুক্ষণ চিত্তদর্পণ-মার্জ্জন, ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ, শ্রেয়ঃকুমুদজ্যোৎস্না-বিতরণ, পরবিদ্যাবধূ-জীবন কৃষ্ণকীর্ত্তন অনুশীলন করিতে থাক। ইহাই স্ফোটবিচারেরই পরিস্ফুট বিজ্ঞান।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ও বিষ্ণুভক্তিজিজ্ঞাসু ছাত্রগণের প্রশ্নে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্বয়ং শুদ্ধ-সরস্বতীপতি শ্রীবিশ্বম্ভর ছাত্রগণকে শ্রৌতপথ শিক্ষা দিলেন। তাঁহার শিক্ষায় তর্কপথ আদৃত না হওয়ায় অধিরোহবাদের অকর্ম্মণ্যতাই প্রদর্শিত হইয়াছে। "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" এবং "প্রায়েণ বেদ তদিদং"—এই ভাগবত-কথিত শ্লোকদ্বয়-প্রতিপাদিত নিষ্ফল অধিরোহ-পথে যে নির্ভেদজ্ঞান ও অনিত্য-কর্ম্মের কুচেষ্টা, উহার নিষেধোপলক্ষণেই বিষ্ণুমন্ত্র প্রদত্ত হয়। কিন্তু আধুনিক মনোধর্ম্ম-জীবি শ্রৌতপথবিরোধী হরি-গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষী

বৈষ্ণব-ব্রুবের কীর্ত্তিত কোন কল্পিত কৃত্রিম ছড়া প্রভু বা তদীয় নিষ্কপট মুক্তসেবক জগদ্‌গুরু আচার্য্য বা প্রচারকগণ কখনও কাহাকেও উপদেশ দেন নাই, পরন্তু গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত মন্ত্রের এবং সম্বোধনাত্মক শ্রীনামেরই উপদেশ দিয়াছেন। প্রভু এই মন্ত্র ও নাম আম্নায় বা গুরু-পারম্পর্য্য-ক্রমে প্রাপ্ত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়া তাহারই উপদেশ দিয়াছিলেন। প্রভু শিক্ষা দিলেন "(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥" এস্থলে প্রথমে হরি ও যাদব-নামদ্বয়ের সহিত কীর্ত্তনেচ্ছু ব্যক্তির শরণাগতি বা আত্মসম্প্রদানাত্মক চতুর্থ-বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ কৃষ্ণ-নাম-গ্রহনেচ্ছু জন সর্ব্বাগ্রে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনৈকব্রত শ্রীসদ্‌গুরুর সমীপে আত্মসম্প্রদানমুখে দিব্যজ্ঞান লাভপূর্ব্বক শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম-কথা শ্রবণ করিতে করিতে সম্বোধনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে নিরন্তর নিরপরাধে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন অনুশীলন করিবেন। ভগবন্নামের সহিত চতুর্থ্যন্ত-পূর্ব্বক আত্ম-নিবেদন দ্বারা তাঁহার নিষ্কপট ভজন করিতে ইচ্ছা হইলে মন্ত্র-লাভ হয়, আর ভগবন্নামের সম্বোধন দ্বারা ভগবন্নামেরই ভজন অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ্যন্ত-পদে শরণাগতি লক্ষিতা হয়। সম্বোধনাত্মক-পদে কীর্ত্তনকারীর নিত্য সেবাকাঙ্ক্ষাই লক্ষিতা। মন্ত্রজপ-ফলে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তির সংসার-বন্ধন-মুক্তি এবং মুক্ত-পুরুষের নাম-সম্বোধন পদ—নিত্যভজন-তাৎপর্য্যপর। কৃষ্ণ-মন্ত্রকে সাধন এবং কৃষ্ণনামকে সাধন ও সাধ্য জানিয়া সাধ্যও সাধন, পরস্পরের অদ্বয়জ্ঞানই অব্যবহিতা ভক্তির পর্য্যায়ে

স্বীকৃত হইয়াছে। মন্ত্র ও নাম, উভয়েই বাচ্যবিগ্রহ বিষ্ণুরই অভিন্ন বাচক। সম্বন্ধজ্ঞান-লাভের প্রয়াসার্থই মন্ত্রের সাধন এবং মন্ত্রসিদ্ধিতে মুক্ত-পুরুষের ভজনারম্ভ। (চৈঃ চঃ আঃ ৭ম পঃ ৭৩ --)" কৃষ্ণ মন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥"

"আপনে কীর্ত্তন-নাথ করেন কীর্ত্তন। চৌদিকে বেড়িয়া গায় সব-শিষ্যগণ॥ আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ নাম-রসে। গড়াগড়ি যায় প্রভু ধুলায় আবেশে ॥"

এস্থলে যিনি কীর্ত্তন করিতেছেন, তিনি স্বয়ংই সেই কীর্ত্তনেরই উদ্দিষ্ট বস্তু। নাম ও নামী অভিন্ন, গৌর ও কৃষ্ণ অভিন্ন, সুতরাং প্রভুর কীর্ত্তনে নিজাভিন্ন গোলোকপতি কৃষ্ণের মাধুর্য্য ও বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের ঐশ্বর্য্যরস প্রকটিত। সেই নাম-রসের আস্বাদক-সূত্রে কৃষ্ণেতর মায়ার প্রতি অভিনিবেশ বর্জ্জনপূর্ব্বক কৃষ্ণাভিনিবিষ্ট হইবার লীলা প্রদর্শন করিলেন।

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী গৌরাবতার ও কীর্ত্তন-মহিমা বর্ণন করিয়াছেন—"পরম-দয়ালু শ্রীচৈতন্যদেব ইহ-জগতে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হইলে যোগ, ধ্যান, জপ, তপ, ত্যাগ, নিয়ম, বেদাধ্যয়ন, সদাচার এই সকল কিছুই ছিল না; এমন কি, যাহার পাপাদি-কর্ম্মে নিবৃত্তিও নাই, সেইরূপ ব্যক্তিও পরম-হর্ষে পুরুষার্থ-শিরোণি পরমপ্রেম লুণ্ঠন করিয়াছিল। আশ্চর্য্য-বিভবশালী শ্রীচৈতন্যদেব ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে, কর্ম্মিকুলের মন মহাকর্ম্ম-প্রবাহে নিপতিত থাকিলেও, প্রেম লাভ করিয়া স্থৈর্য্যপ্রাপ্ত হইল এবং মহাপাষাণ

হইতেও অতিশয় কঠিন মনও ভক্তিরসে দ্রবতা প্রাপ্ত হইল। মহাযোগাদি-সাধনে চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরও মন যোগাদি অনিত্যসাধন হইতে বিরত হইয়া উর্দ্ধে নৃত্য অর্থাৎ অধোক্ষজ চিদ্বি-লাসরাজ্যে প্রেম আস্বাদন করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র পরভক্তিযোগ-পদবী আবিষ্কার করিলে প্রাকৃত বিষয়-রসমগ্ন ব্যক্তিগণ স্ত্রী-পুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রসম্বন্ধী বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু-নিরোধার্থ সাধন-ক্লেশ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন,জ্ঞান-সন্ন্যাসিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; তখন ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার রস আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই। শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইলে গৃহে গৃহে তুমুল হরিসংকীর্ত্তনের রোল উত্থিত হইয়াছিল, দেহে দেহে পরিপুষ্ট পুলকাশ্রু-কদম্ব শোভা পাইয়াছিল, প্রেমভক্তির গাঢ়ত্বের উত্তরোত্তর উৎকর্ষে শ্রুতির অগোচর পরমমধুর শ্রেষ্ঠা পদবীও প্রকাশিতা হইয়াছিল। সর্ব্বচিত্তাকর্ষক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনোহর কনক-কান্তি ধারণ-পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলে মহা-প্রেম-বারিধির রসবন্যায় এই নিখিলজগৎ অকস্মাৎ সর্ব্বতো-ভাবে প্লাবিত এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুত-চর প্রেমবিকার দ্বারা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিল। কোন কোন ব্যক্তি দুর্নিবার গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া সমগ্রশাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে সংগ্রহ করিতেন, অর্থাৎ 'আমি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, আমা-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠব্যক্তি কেহ নাই' – এইরূপ মনে করিতেন। কেহ কেহ বা নিজেই

নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেন, সেই সকল কৃতার্থন্মন্য এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম্ম, তথা তপস্যা, সাংখ্য-যোগাদিমার্গে উচ্চনীচভাবে অবস্থিত ব্যক্তিগণের কেহ কেহ দুই তিনবার-মাত্র-হরির নামবলী জপ করিতেন, তথাপি তাঁহাদের চিত্ত কৈতবপূর্ণই ছিল। পূর্ব্বের অবস্থা এইপ্রকার, কিন্তু এখন গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইলে 'প্রেম' ও সাধারণ হইয়া পড়িল অর্থাৎ আপামর সর্ব্বসাধারণেই এই প্রেম প্রাপ্ত হইল। সুরগণ যাঁহার পাদ-পদ্ম-সেবা বঞ্ছা করেন, সেই লীলাময়-পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বব্যাপিনী সুমধুর প্রেমপীযুষ-লহরী (সর্ব্বত্র প্রকৃষ্টরূপে বিস্তার করিলে, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি জড়মতি কি বালক, কি শোচনীয় নীচব্যক্তি—এই সংসারে সকলেরই ভক্তিলাভে যোগ্যতা এবং শ্রীহরির চরণে কোন এক অপূর্ব্ব চমৎকারময়-অদ্বয়জ্ঞানরস উদিত হইয়াছিল প্রেমরস-রসিক-শিরোমণি স্বয়ং ভগবান্ গৌরচন্দ্র ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে, শঙ্কর-নারদাদি সকলেই (অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্ত-রূপে) আগমন করিয়াছিলেন। স্বয়ং লক্ষ্মীও (শ্রীলক্ষ্মী প্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-রূপে) আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। স্বয় ভগবান্ হইতে অভিন্ন তদীয় প্রকাশ-স্বরূপ বলদেব (পাষং দলনবানা নিত্যানন্দরায়-রূপে) বিরাজ করিতেছিলেন যাদবগণও (শচী, জগন্নাথ প্রভৃতিতে) প্রকাশিত হইয়াছিলে আর অধিক কি বলিব, নন্দাদি ব্রজবাসিগণ, সুবলাদি-প্রমু সখাগণ, গোপী-প্রমুখ শক্তিগণ, রক্তক, চিত্রক প্রভৃতি দাসগ

অর্থাৎ কৃষ্ণলীলার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ সকলেই গৌরলীলায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তপ্তকাঞ্চনদ্যুতি গৌরসুন্দর পৃথিবীতে স্বীয় অলৌকিক প্রেম বিতরণ করিলে, দাস, সখা ও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-হীন কেবল মধুর-রসের নিত্যসিদ্ধ সেবিকা প্রেয়সীবর্গ,—ইঁহারা সকলেই গৌর পাদপদ্ম-সন্নিধানে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বের (কৃষ্ণ-লীলার) প্রেমাস্বাদন অপেক্ষাও মহা-প্রেমামৃত-সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। অতি অলৌকিক পরম-মহিমান্বিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃথিবীতে অবতীণ হইলে কুলবধূগণও লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমে অতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিত, ইন্দ্রিয়তর্পণপর কুবিষয়-পাষাণ-নির্ম্মিত কঠিনহৃদয়ও সর্ব্বতোভাবে দ্রবীভূত হইয়াছিল, তত্ত্বজ্ঞানহীন অজ্ঞ ব্যক্তিগণও চৈতন্য-কৃপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সকল শাস্ত্রজ্ঞ-সমাজকেও ধিক্কার করিয়াছিল। চৈতন্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে এই প্রপঞ্চে সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতাভিমানী-দিগেরও কৃষ্ণসেবারূপ চেতনবৃত্তি আচ্ছাদিত প্রায় হইয়াছিল। ইঁহারা সর্ব্বপুরুষার্থ-শিরোমণি কৃষ্ণপ্রেম লক্ষ্য করেন নাই, যেহেতু ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তি অতি সামান্যা ও সন্দেহ প্রবণা; কিন্তু সম্প্রতি গৌরচন্দ্র কৃপাপূর্ব্বক জগতে উদিত হওয়ায় সুদুর্ব্বোধ, পরমচমৎকার বিভাব-অনুভাবাদি সামগ্রীপুষ্টা উন্নতোজ্জ্বল মধুর-রসময়ী প্রেমভক্তিতে কাহাদেরই বা প্রবেশ না হইয়াছে?

সর্ব্বজ্ঞ মুনিশ্রেষ্ঠগণ তাঁহাদের নিজ-নিজ-মত যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বিস্তৃত করিলেও কোন ব্যক্তিই পূর্ব্বে সেই সকল পক্ষপাতিনী যুক্তিতে সুদৃঢ়-বিশ্বাসী ছিলেন না। সম্প্রতি

অপ্রতিম-প্রভাবশালী শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইলে পুনরায় একমাত্র হরিভক্তিই যে বেদ-প্রতিপাদ্য পরমার্থ, তাহা কেই বা নিশ্চয় না করিয়াছে? বিশেষ সদাচারী ও পরমধার্ম্মিক প্রাচীন-মহাপুরুষগণের দ্বারা কোন কোন ব্যক্তি বৈকুণ্ঠাদি-লোক প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র যেরূপ সমগ্র বিশ্বকে প্রেম-সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে আর কেহই এরূপ করেন নাই। ধর্ম্মবিষয়িণী অতুলনীয়া নিষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠ-ভক্তি সাম্যগ.রূপে আশ্রয় করিয়াও লোকে লৌহের ন্যায় সুকুঠিন হৃদয় ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীতে অবস্থান করে; (কিন্তু শ্রীগৌরহরির কৃপায়) অহো! গোঘাতী অপেক্ষাও পাপীয়ান্ ব্যক্তি (পাপপ্রবৃত্তি হইতে সর্ব্বতো-ভাবে মুক্ত হইয়া) অশ্রু প্রবাহের দ্বারা বিশ্ব প্লাবিত করিয়াছে। অহো! কে-ই বা কাঞ্চনকান্তি শ্রীগৌরঙ্গ-সুন্দরের দুর্ব্বিগাহ রঙ্গ জনিতে পারে! বিপুল-দুরবগাহ-প্রভাবে শ্রীগৌরসুন্দর সমগ্র বিশ্বকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণাবেশ-হেতু কখনও বালকৃষ্ণলীলা প্রকাশ করিয়া, জানু দ্বারা চঙ্ক্রমণ করিতেছেন, কখনও বা গো-পালকের চরিত্র প্রকাশ করিয়া, কখনও বা বহুভঙ্গী অভিনয় করিয়া নৃত্য করিতেছেন, আবার কখনও শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া 'হরি'! 'হরি'!! 'হরি'!!!—এইরূপ বিরহপীড়াজনিত আর্ত্তিসহকারে :রোদন করিতেন। নিজপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর পৃথিবীতে উদ্দণ্ড-নৃত্য আরম্ভ করিলে দেবগণ দুন্দুভি বাদন করিয়াছিলেন, প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ সঙ্কীর্ত্তন

আরম্ভ করিয়াছিলেন, সিদ্ধগণ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা ভূমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। মনোহর স্তোত্রপাঠ-কুশল মহর্ষিবৃন্দ প্রীতির সহিত স্তব করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরি মহাভাবামৃত রসে মগ্ন হইয়া কখনও হাস্য করিতেন, কখনও রোদন করিতেন, কখনও মূর্চ্ছিত হইতেন, কখনও ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেন, কখনও দ্রুত গমন করিতেন, আবার কখনও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন, কখনও বা 'হা হা' এইরূপ মহৎ শব্দ করিতেন ; —এইরূপ নানাভাবে প্রপঞ্চে বিহার করিয়াছিলেন।"

শ্রীলপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদের উক্ত বর্ণনায় স্ফোটের বিভিন্ন প্রকার প্রকাশের কথা ব্যক্ত হইয়াছে। অন্বয়-ব্যতিরেক-ভাবে স্ফোটের প্রকাশ, সর্ব্বত্র, সর্ব্বদা, সর্ব্বপাত্রে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বতোভাবে, পরিপূর্ণতম ভাবে শ্রীগৌরহরির কৃপা ও প্রকাশ দ্বারা স্ফোটের সর্ব্বপ্রকার বৈচিত্র্য অদ্ভূতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ ক্রম

স্ফোটের আনন্দময়ত্ব—শ্রীল সনাতন গোস্বামি-পাদ শ্রীশ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষনীতে (ভাঃ ১০।৮৭।১৭) ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পঞ্চবিধ আত্মার মধ্যে যাহা চরম, সেই আনন্দময় আত্মই আপনিই হ'ন। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটিতে আত্মার অধ্যাস হেতুই (অর্থাৎ আত্মত্বের আরোপ হয় বলিয়াই)

ইহাদিগকে এস্থলে আত্মা বলা হইয়াছে। সেই আনন্দময় আপনি কিরূপ? এই অন্নময় প্রভৃতির মধ্যে জীবগণের উপকারের জন্য অন্বয় (অনুপ্রবিষ্ট); কারণ, পরমানন্দস্বরূপ আপনা হইতেই জীবগণের প্রাণাদি ব্যাপার উদ্ভূত হয়, ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। এইরূপে আপনি জীবগণের উপকারী। তন্মধ্যে 'অন্নময়' আত্মা এই স্থূল দেহই। 'প্রাণময়' আত্মা—পঞ্চবিধ বৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণ, যাহা অন্নময় অপেক্ষা অন্তরঙ্গ এবং যাহার নির্গমনে জীবের মৃত্যু বলা যায়। এই প্রাণরূপী জড় আত্মা অপেক্ষাও 'মনোময়' আত্মা অন্তরঙ্গ; কারণ, চিৎসম্বন্ধহেতু ইহার জ্ঞান-সামর্থ্য বিদ্যমান। এই মনোময় আত্মা ইন্দ্রিয়রূপী। ইহা অপেক্ষা 'বিজ্ঞানময়' আত্মা অর্থাৎ 'জীব' অন্তরঙ্গ; যেহেতু বাহ্য ভোগাদিবিষয়ে কর্ত্তৃত্বহেতু পূর্ব্ববর্ত্তিগণের অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে। পুনরায় বলিতেছেন—আপনি 'পুরুষবিধ' অর্থাৎ অন্নময়াদি পুরুষগণের ন্যায় আপনারও শিরঃ, পক্ষ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। অথবা, যাহা হইতে অন্নময়াদি চতুর্ব্বিধ পুরুষের 'বিধা' অর্থাৎ রচনা হইয়াছে, সেই আনন্দময় পঞ্চম আত্মা আপনিই হ'ন। 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' (ব্রঃ সূঃ ১।১।১২) এই ব্রহ্মসূত্রে এইরূপই নির্ণীত হইয়াছে। এইরূপে সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতির সম্বন্ধরহিত ও পরিচ্ছেদাতীত পরমানন্দবস্তুই বিবক্ষিত হ'ন। 'আনন্দময়'—আনন্দ-প্রচুর; প্রাচুর্য্যার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'সূর্য্য—প্রকাশ-প্রচুর' এইরূপ বলিলে যেরূপ সূর্য্যে প্রকাশ-বিরোধী অপ্রকাশ-ভাবের সম্পর্ক প্রতীত হয় না, সেইরূপ 'আনন্দময়'

অর্থাৎ আনন্দ প্রচুর—এইরূপ বলিলেও তাহাতে আনন্দ-বিরোধী দুঃখভাবের যৎকিঞ্চিৎ সম্পর্কও আশঙ্কিত হইতে পারে না। সুতরাং তাহার আনন্দৈকস্বরূপত্বের কোন হানি হয় না। অথবা, এ স্থলে শ্রুতিতে ব্রহ্ম, মোদ, প্রমোদ, ইত্যাদি-রূপে আনন্দের যে সকল বিশেষ প্রকাশ উক্ত হইয়াছে, তদপেক্ষা আনন্দরূপ প্রকাশেরই প্রাচুর্য্যহেতু 'আনন্দময়' পদে প্রাচুর্য্যার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয় সুসমঙ্গতই হয়। অথবা, 'আনন্দময়' পদে স্বরূপার্থে 'ময়ট্' (অর্থাৎ তিনি আনন্দ-স্বরূপ)। তিনি জীবন্মুক্ত, সেবক, গুরুজন, বয়স্য ও প্রেয়সী-রূপ পঞ্চবিধ উপাসকগণের সম্বন্ধে যথাক্রমে ব্রহ্ম, মোদ, প্রমোদ, প্রিয় ও আনন্দস্বরূপে প্রকাশমান; আর, ঐ পঞ্চবিধ স্বরূপ যথাক্রমে তাঁহার পুচ্ছ, দক্ষিণপক্ষ, বামপক্ষ, শিরঃ ও আত্মরূপে নিরূপিত হন। এই স্থলে অন্নময় প্রভৃতি পূর্ব্ব-পদার্থ চতুষ্টয়ের উক্তি 'শাখাচন্দ্র-ন্যায়' অনুসারে (অর্থাৎ প্রথমতঃ স্থূলকে অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্মতত্ত্বে শিষ্যের বুদ্ধিকে উপনীত করিবার অভিপ্রায়েই) উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞানে আর্থিক ক্রমানুসারে এইরূপ ব্যাখ্যা হয়—জীবন্মুক্ত দ্বিবিধ। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর জীবন্মুক্তগণ ভক্তিশূন্য, নিজস্বরূপৈকনিষ্ঠ ও আত্মারাম। অপর জীবন্মুক্তগণ 'শান্ত ভক্ত'; তাঁহারা আত্মারামতা-সুখভোগী এবং ভগবৎকৃপায় শান্তরতির অধিকারী বলিয়া ভক্তগণের মধ্যে বিশেষ আদৃত নহেন। উক্ত দ্বিবিধ উপাসক-গণের মধ্যে প্রায়শঃ তাঁহাদিগের আত্মার অভিন্নরূপে (অদ্বৈত-

ভাবে) ভগবানের যে প্রাকট্য, তাদৃশ প্রকাশই ব্রহ্ম। তন্মধ্যে অদ্বৈতৈকনিষ্ঠ প্রথম উপাসকগণের সম্বন্ধে নিজ স্বরূপের নির্ব্বিশেষভাবে চিদ্রূপ ব্রহ্মই প্রকাশিত হ'ন; পরন্তু দ্বিতীয় উপাসকগণের সম্বন্ধে চিদ্‌ঘনস্বরূপ মূর্ত্তিমান পরব্রহ্মই প্রকাশিত হ'ন; কিন্তু ঘন বা অঘনভাবের বিশেষ বিবেক অর্থাৎ নির্দ্ধারণ থাকে না। এই দ্বিবিধ স্বরূপই চিদ্রূপে এক বলিয়াই এস্থলে অভিন্নরূপে এক 'ব্রহ্ম' পদেই উল্লিখিত হইয়াছেন; আর, নির্ব্বিশেষত্ব-নিবন্ধন স্বাদবিশেষের অভাবহেতু, অনুত্তম অঙ্গ বলিয়া তাঁহাকে 'পুচ্ছ' বলা হইয়াছে। এই ব্রহ্মই পুচ্ছরূপে প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ মোদ প্রভৃতির আধার। যদিও আনন্দময়ই সকলের প্রতিষ্ঠাস্বরূপ, তথাপি সেই নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ তত্ত্বের বস্তুগত ঐক্যাভিপ্রায়েই ব্রহ্মত্বকে প্রতিষ্ঠা বলা হইল। অনন্তর ন্যূন, অধিক ও সাধারণরূপে ত্রিবিধ ভাব বলা হইতেছে। তন্মধ্যে যাঁহারা নিজেকে অতি নিকৃষ্ট এবং ভগবান্‌কে সর্ব্বোৎকর্ষভাগী সর্ব্বাধিকরূপে অবগত হইয়া তাঁহার উপাসনা করেন, ভয় ও গৌরব জ্ঞানাদিবশতঃ নম্রভাবাপন্ন সেই উপাসকগণ উত্তরোত্তর রুচিজনক ও স্ফূর্ত্তিশীল এবং প্রীতিরতির সম্বন্ধীয় পরমাভীষ্ঠ প্রকৃষ্ট প্রেমের আস্বাদনরত হইলে তৎকালে তাঁহাদের তাদৃশ চমৎকারকারী আনন্দরূপে শ্রীভগবানের প্রকাশবিশেষই মোদ নামে অভিহিত হইত। পুচ্ছরূপী ব্রহ্ম অপেক্ষা তাঁহার বৈশিষ্ট্যহেতু তাঁহাকে দক্ষিণপক্ষ বলা হইল। যাঁহারা নিজেকে লালক ও পালক প্রভৃতিরূপে ভগবান্ অপেক্ষা অধিক এবং

ভগবান্‌কে নিজের লাল্য ও অনুগ্রাহ্য প্রভৃতিরূপে নিজ অপেক্ষা ন্যূন্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, পুত্রাদিভাবের উপাসক সেই শ্রীযশোদা প্রভৃতি বাৎসল্যরসাশ্রিত ভক্তগণ বাৎসল্য-রসের প্রকর্ষভূত প্রেমবিশেষ অনুভব করেন ; আর তাঁহাদিগের নিকটে তাদৃশ পরমানন্দরূপে ভগবানের যে প্রকাশ-বিশেষ, উহাই—প্রমোদ। পূর্ব্বাপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা হেতুই 'প্র'-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। যাঁহারা একত্র উপবেশন, শয়ন, ক্রীড়া, জয় ও পরাজয় প্রভৃতি ব্যাপারে ভগবানের সহিত অবিশেষভাবেই নিজের সাম্য এবং নিজের সহিত শ্রীভগবান্‌কে অন্যূন ও অনধিক জ্ঞান করিয়া উপাসনা করেন, শ্রীদাম প্রভৃতি বয়স্যগণই তাদৃশ ভক্ত। তাঁহারা ভয়, গৌরব বা অনুগ্রহাদি বুদ্ধিরহিত। তাঁহারা পরম স্বাদুতম মৈত্রী-ভাবাদিপূর্ণ পরম-প্রণয়হেতু প্রাদুর্ভূত সখ্যরতির প্রকর্ষ্যস্বরূপ উত্তম প্রেম অনুভব করিলে তাদৃশ ভাবানুসারে পরম প্রেমাস্পদরূপে ভগবানের যে প্রকাশ বিশেষ, তাহাই প্রিয় শব্দদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বতত্ত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব-হেতু ইহাকে শিরঃ বলা হইয়াছে। এইরূপে চতুর্ব্বিধ উপাসকের নিরূপন হইয়াছে। সম্প্রতিপঞ্চম শ্রেণীর উপসক-গণের নিরূপণ হইতেছে। যাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে পরমকান্ত, কন্দর্পকোটিরমণীয় এবং নিজ কোটি আত্মার ন্যায় প্রিয়-জ্ঞানে উপাসনা করেন, শ্রীব্রজদেবী-প্রমুখ প্রেয়সীগণই সেই পঞ্চম শ্রেণীর উপাসক। তাঁহারা নিরন্তর অসমোর্দ্ধ মাধুরীপরিপূর্ণ অনুরাগরাশি সর্ব্বদা আস্বাদন করিলে তাদৃশ মহাভাবের

অনুকূল পরম-প্রেষ্ঠরূপে শ্রীভগবানের যে প্রকাশবিশেষ, তাহাই আনন্দ-নামে উক্ত হইয়াছে। 'মোদ' প্রভৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বহেতু এই আনন্দ এস্থলে আত্মা বলিয়া বর্ণিত হইতেছে। এইরূপ সিদ্ধান্তপক্ষে প্রথমতঃ 'সৎ' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মত্ব ব্যাখ্যা, হইয়াছে। 'এষু' —এই পঞ্চ প্রকাশের মধ্যেও সেইরূপ আপনি সৎ ও অসৎ অপেক্ষা 'পর'। 'সৎ'—অন্নময়াদি স্থূলত্রয়। 'অসৎ'— বিজ্ঞানময় জীবরূপ সূক্ষ্মতত্ত্ব। (আপনি) এই উভয়ের 'পর' অর্থাৎ ব্রহ্ম। এইরূপে পঞ্চবিধ তত্ত্বমধ্যে ব্রহ্মত্ব নির্দ্ধারিত হইলে যাহা 'অবশেষ' অর্থাৎ অবশিষ্ট মোদ প্রভৃতি চারিটি তত্ত্ব, তাহাও আপনিই হ'ন। তন্মধ্যে সূর্য্যস্থানীয় ঘনানন্দমূর্ত্তির রশ্মিস্থানীয় ব্রহ্ম অমূর্ত্ত, আর উক্ত ঘনানন্দ-মূর্ত্তির প্রকাশ-স্বরূপ পরব্রহ্ম এবং মোদ প্রভৃতি চতুষ্টয়—মূর্ত্ত পদার্থ। এইরূপে শান্ত, প্রীত, বৎসল, প্রিয় ও উজ্জ্বল এই পঞ্চবিধ মুখ্যরসের বিষয়ীভূত শ্রীভগবান্ এক হইয়াও উপাসকগণের বৈচিত্র্য হেতু ব্রহ্ম, মোদ, প্রমোদ, প্রিয় ও আনন্দ—এই পঞ্চ প্রকারে উক্ত হইয়াছেন; কিন্তু অতুলনীয় পরমঘন আনন্দরূপে অনুভবহেতু উক্তস্বরূপ এই 'রস'ই ভগবান্। আনন্দময়াধিকরণে শ্রুতিও (তৈ ২।৭।১) এইরূপ—'তিনি রসস্বরূপই হ'ন আর তাঁহাকে রসরূপে অনুভব করিয়াই এই জীব আনন্দযুক্ত হ'ন।' উক্ত বিষয়টিকে যৎকিঞ্চিৎ বিশেষঅর্থযুক্তরূপে অনুকীর্ত্তন করিয়াই উপসংহারে বলিতেছেন—'ঋতম্' ইত্যাদি। শ্রুত্যুক্ত প্রতিষ্ঠা-স্থানীয় এই যে আনন্দময়, তিনিই 'ঋত' অর্থাৎ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত

সর্ব্ববিধ প্রকাশস্বরূপ বলিয়া সকলের প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ। গীতা-শাস্ত্রেও (১৪।২৬) "স গুণান্" ইত্যাদি বাক্যের পর বলিয়াছেন "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্" (গীতা ১৪।২৭) ইত্যাদি। ইহার অর্থ—তিনি ব্রহ্মজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক নিজ হইতে অভিন্ন জ্ঞানে ও শান্তভক্তগণ-কর্ত্তৃক ঘনীভূত ব্রহ্মজ্ঞানে উপাস্য এবং শ্রুতি-কর্ত্তৃক পুচ্ছরূপে বর্ণিত, সেই ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক বস্তুর প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়)-রূপে শ্যামোজ্জ্বল নিখিলানন্দমূর্ত্তি আমিই বিরাজমান। ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৫১) আদিপুরুষ-রহস্যস্তবেও বলিয়াছেন—"যস্য প্রভা প্রভাবতঃ" ইত্যাদি। এইরূপ ভক্তগণ কর্ত্তৃক পরমাভীষ্ট দৈবতরূপে পরম আরাধ্য যে শাশ্বত ধর্ম্ম—যাহা প্রীতিভক্তিরূপে খ্যাত, আমি তাহারও প্রতিষ্ঠা। এইরূপ 'মোদ' অর্থাৎ মদীয় প্রকাশ বিশেষের আমিই প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ এই মোদ-রূপে আমি সেবকগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হই। এইরূপ, গুরুজন কর্ত্তৃক প্রগাঢ় বাৎসল্যের বিষয়রূপে, অনুশীলিত 'অমৃত অব্যয়' বস্তুর অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপে বর্ত্তমান মাধুর্য্যের সারস্বরূপ 'প্রমোদ' নামক মদীয় প্রকাশবিশেষের আমিই প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ পরম অচিন্ত্য সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যাতিশয় দ্বারা পরিপূর্ণতা হেতু জগতের অনুগ্রাহক হইয়াও পূজ্যগণের নিকট পরম অনুগ্রাহ্য প্রমোদ-রূপেই প্রতিষ্ঠিত হই। পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাক্রমানুসারে সেবকগণের অনন্তর এই বৎসল ভক্তগণের নির্দ্দেশ উচিত হইলেও গীতা-শাস্ত্রে শান্তভক্তগণের পশ্চাতে ইহাঁদের নির্দ্দেশের কারণ এই যে—শান্ত ও বৎসল এই উভয় রসের আশ্রয়গণই পূজ্যরূপে সমান। আর, পরম-

প্রিয়গণ ও পরম প্রেয়সীগণ যাঁহার অনুশীলন করেন, সেই ঐকান্তিক সুখের অর্থাৎ শ্রুতিকর্ত্তৃক প্রিয় ও আনন্দ শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ্য পরম আত্যন্তিক সুখস্বরূপ মদীয় সর্ব্বোত্তম প্রকাশ বিশেষেরও আমিই প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ পরমপ্রেষ্ঠবর্গ ও পরম-প্রেয়সীবর্গের মধ্যে আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেষ্ঠরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছি। এই পঞ্চম তত্ত্ব অতি রহস্য বলিয়া এবং এস্থলে অর্জ্জুন উপদেশের পাত্র বলিয়া উভয় তত্ত্বকেই অপৃথগ্‌রূপে যুগপৎ সূচনা করা হইয়াছে। কাহারও মতে মহাবৈকুণ্ঠাধিপতি পুরুষোত্তমই 'আনন্দময়' শব্দবাচ্য এবং তাঁহারই চতুর্ব্যূহ, প্রিয় মোদ, প্রমোদ ও আনন্দ শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ্য হন। তাঁহার অমূর্ত্ত স্বরূপই 'ব্রহ্ম'। (শ্রীলসনাতনগোস্বামিপ্রভুকৃত শ্রীশ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণীর-(১০।৮৭।১৭) অনুবাদ।

স্ফোটের প্রকাশ তারতম্য—মুক্তিঃ—শ্রীল সনাতন-গোস্বামিপাদ-শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে বর্ণনা করিয়াছেন—"আরোগ্য রোগরূপ দুঃখের অভাবকেই যেরূপ সুখ, অথবা তমোময়ী সুষুপ্তিদশায় সুখের অনুভবের অভাবেও যেরূপ আমি 'সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই'—এইরূপ নানামনোরথ-স্বপ্নাদি-মনোবৈকল্যরূপ দুঃখাভাবকেই সুখ বলিয়া কল্পনা করা হয়, সেইরূপ সর্ব্বশূন্যতারূপ জন্মমরণাদি-সংসার-দুঃখের অভাবই—মোক্ষেও সুখ বলিয়া কল্পিত হয়। বস্তুতঃ, তাহাতে বাস্তব সুখ নাই, কেবল অনভিজ্ঞগণকেই ঐরূপ মোক্ষে প্ররোচিত করা হয়। কারণ, মোক্ষকে অজ্ঞানই বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ, মোক্ষের কোন সত্যতা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম-

স্কন্ধে শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন যে সংসার-বন্ধন ও মোক্ষ—এই দুইটি অজ্ঞান-পদবাচ্য, সুতরাং সত্যজ্ঞান হইতে ভিন্ন। ভগবদ্ভক্তগণের অনায়াসে ও আনুষঙ্গিকভাবেই মোক্ষ সিদ্ধ হয়। শ্রীভগবানের শ্রীনামের সেবা দূরে থাকুক, ভগবানের নামের-আভাসেই প্রতিবিম্ববৎ আনুকরণিক শব্দের দ্বারা নামের সামান্য ও কোনপ্রকারে একবারমাত্র জিহ্বাগ্রে উচ্চারণ-মাত্রেই অনায়াসে মোক্ষ লাভ হয়। ইহার সাক্ষ্য—শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঅজামিল ও বরাহপুরাণোক্ত নরখাদক ব্যাঘ্র এক ব্রাহ্মণ জলমগ্ন হইয়া ভগবানের নাম জপ করিতেছিলেন, এমন সময় একটি ব্যাঘ্র সেই ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করে। দৈবযোগে সেই ব্যাঘ্র একটি ব্যাধের শরনিক্ষেপে মরণোন্মুখ হইলে উক্ত ব্রাহ্মণের কণ্ঠনিঃসৃত নামশ্রবণফলে সেই ব্যাঘ্র মুক্তি লাভ করিয়াছিল। (শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২।২।১৭২-৭৩) ॥ শ্রীল সনাতন-গোস্বামিপাদ বিভিন্ন মতবাদিগণের দুঃখধ্বংসরূপ-মোক্ষের সম্বন্ধে এইরূপ বিচার করিয়াছেন,—একবিংশতি প্রকার দুঃখের লোপই— মোক্ষ, ইহা নৈয়ায়িকগণের মত। অতএব নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন, আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তির নাম মুক্তি ইত্যাদি। কোন কোন বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মতে অবিদ্যার ও কর্ম্মের ক্ষয়ই হইল মোক্ষ। বৈশেষিক, মীমাংসা ও সংখ্যাদিশাস্ত্রের মত উত্থাপিত হইল না। কারণ, তাঁহাদের দ্বারা মোক্ষর যে স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহাদের কল্পিত মোক্ষের অতি তুচ্ছতা স্বতঃই প্রকাশিত হইয়াছে। মায়াকৃত অন্যথা রূপের—সংসার-দশার, অথবা

ভেদজ্ঞানের ত্যাগ হইতেই আত্মরূপ ব্রহ্মের যে অনুভব, তাহাই—মোক্ষ ; ইহাই বিবর্ত্তবাদি-বৈদান্তিকগণের মুখ্য মত। তাঁহাদের মতের দ্বারাই জানা যায় যে, মোক্ষে দুঃখের অভাব ও দুখের কারণাভাব মাত্রই বিদ্যমান। ইহার দ্বারা বাস্তব সুখ-প্রাপ্তি নাই, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে। নির্ব্বিশেষবাদিগণ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের অনুভব করেন। সুতরাং তাঁহাদের অনুভূত সুখও অপরিচ্ছিন্ন হইবে না কেন ? ইহার উত্তর এই, তাঁহাদের ব্রহ্ম নির্গুণ অর্থাৎ করুণা প্রভৃতি গুণহীন ; তাঁহাদের ব্রহ্ম নিঃসঙ্গ, সুতরাং ভক্তজনের সঙ্গাদি-রহিত ; তাঁহাদের ব্রহ্ম নির্ব্বিকার, সুতরাং তাঁহার চিত্তের আর্দ্রতারূপ বিক্রিয়া নাই অথবা তিনি বিচিত্র শ্রীমূর্ত্তি-বৈভবাদি-পরিমাণ-রহিত ; তাঁহাদের ব্রহ্ম নিরীহিত অর্থাৎ বিচিত্র মধুর লীলাহীন। অতএব যে তত্ত্বে ভগবত্তার অভাব ও সচ্চিদানন্দঘনত্বের অভাব, সেই তত্ত্বের অনুভবের দ্বারা সুখও সেইরূপই হইবে। মুমুক্ষুগণ জন্মমরণাদি দুঃখের দ্বারা, সংসার-যাতনার দ্বারা এবং সর্ব্বদাই নানাবিধ উদ্বেগের দ্বারা সতত ব্যাকুলান্তঃকরণ বলিয়া তাঁহাদের চিত্তের আর্দ্রতা ও কোমলতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের চিত্তে প্রীতি-হীনতা, শুষ্কতা ও কাঠিন্য-ভাবই প্রবল। সংসারের উগ্রতাপে তাঁহাদের চিত্ত দগ্ধ হওয়ায় তাঁহারা কেবল দুঃখনিবৃত্তির জন্যই ব্যাকুল। তাঁহাদের রস-গ্রহণের সামর্থ্য নাই। মুমুক্ষুগণ সংসার-যাতনা হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য—সংসারজ্বালা নিবারণ করিবার জন্য, মোক্ষের শরণাপন্ন এবং মোক্ষকেই

সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া স্তুতি করেন। বস্তুতঃ, সংসারদুঃখ-নিবারণরূপ মোক্ষে সেরূপ কোন বাস্তব সুখ নাই। যেমন স্বর্গকামিগণ পতন-ভয়, স্পর্দ্ধা, নশ্বরাদি-দোষ থাকা সত্ত্বেও স্বর্গকেই চরম সুখ বলিয়া থাকেন, তেমনি মুমুক্ষুগণও সুখবৈচিত্রীর একান্ত অভাব থাকা সত্ত্বেও দুঃখমাত্র-নিবারক মোক্ষকেই পরম পুরুষার্থ বলেন। অপর দিকে, ভক্তিসুখ —ভগবৎপ্রেমবিলাসরূপা স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া পরম মহৎ হইলেও ক্ষণে ক্ষণে নূতন হইতেও নূতনরূপে, মধুর হইতেও সুমধুররূপে এবং অধিক হইতেও অধিকতররূপে ভক্তের দ্বারা অনুভূত হয়। মুক্তিতে যে ব্রহ্মসুখ, তাহা এইরূপ নহে। কেন না তাহা সীমাযুক্ত; তাহাতে বিচিত্রতা নাই—বিলাস নাই—পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধানবৈচিত্রী নাই। (বৃঃ ভাঃ ২।২।১৭২-৭৭,১৯০,১৯৩)

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণযুগল—সুখস্বরূপ ও সুখের আশ্রয়, উভয়ই ; যেরূপ মিছরির পিণ্ড একাধারে মিছরি (মিষ্ট দ্রব্য) ও মিছরির (মিষ্ট বস্তুর) আধার। কিন্তু ব্রহ্ম—কেবল সুখ-স্বরূপ, সুখের আধার নহেন ; যদি আধার বলা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মে ভেদ-ভাব অর্থাৎ আধার-আধেয় ভাব উপস্থিত হয়, সুখের বৈচিত্রী, তরঙ্গাদিও থাকে। কিন্তু ব্রহ্ম তাহা নহেন। অন্যদিকে, কোটী-সমুদ্রগম্ভীর, পরমাশ্চর্য্যমহিমান্বিত শ্রীভগবানে অচিন্ত্য ভেদাভেদাদিরূপ বিচিত্র বিরোধের প্রবাহ নিত্য বর্ত্তমান। এজন্য শ্রীভগবান্ পরমানন্দ-স্বরূপ হইয়াও পরমানন্দের আধার। (বৃঃ ভাঃ ২।৮।১৮১)।

গো, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ ও বেদাদির বিনাশক দৈত্যগণকে মুক্তি-কামিগণও নিন্দা করেন। সেই গো, বিপ্র, যজ্ঞাদি-ঘাতী কংসাসুরাদি দৈত্যগণকেও যখন মুক্তিলাভ করিতে দেখা যায়, তখন দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি কিরূপে প্রশংসনীয় হইতে পারে?--দুষ্ট ব্যক্তিগণের প্রাপ্য বস্তু শিষ্ট ব্যক্তিগণের গ্রহণীয় হইতে পারে না। ব্রহ্মানুভবকারী, আত্মারাম, জীবন্মুক্ত সিদ্ধগণেরও দুঃখাভাব-মাত্রই লাভ হয়, আর শ্রীভগবদ্ভক্তগণ বৈকুণ্ঠে গমন না করিয়াও এই জগতে পাঞ্চভৌতিক দেহে থাকাকালেও শ্রীভগবানের কৃপায় সর্ব্বক্ষণ সান্দ্রসুখবিশেষ অনুভব করেন। (ঐ ২।২।২০০, ২০৩)। অন্নাদি রন্ধন করিবার নিমিত্ত যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়, খাদ্য রন্ধন কার্য্যই সেই অগ্নির প্রকৃত উদ্দেশ্য ; কিন্তু উহার দ্বারা আনুষঙ্গিকভাবেই গৃহের অন্ধকার ও শীত নাশ হয়—এই দুইটিই অবান্তর ফল। তদ্রূপ, ভক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য—শ্রীভগবানের প্রীতি অর্থাৎ ভগবৎসুখানুসন্ধান, মুক্তিরূপ দুঃখনিবৃত্তি নহে। ভক্তের নিকট মুক্তি, আত্মারামতা, যোগসিদ্ধি ও জ্ঞানাদি অবান্তর ফলসমূহ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু ভক্ত ঐ সকল গ্রহণ করেন না। কারণ ভক্তির মুখ্যফল যে ভগবৎপ্রীতি, ঐগুলি তাহার বিরোধী। (ঐ ২।২।২০৯)

মুক্তি-সুখ সর্ব্বদাই একরূপ, আর শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য-বিশেষের প্রভাবে ভক্তিসুখ সর্ব্বদাই অদ্ভুত অর্থাৎ পরম অনির্ব্বচনীয় ও বিচিত্রতাপূর্ণ। অতএব সাযুজ্যরূপা মুক্তি হইতে ভক্তি-সুখ সর্ব্বতোভাবে বিপরীত। মুক্তিসুখ—শেষসীমাপ্রাপ্ত একরূপ, পরিপূর্ণ ও তৃপ্তিজনক। কিন্তু ভক্তিসুখ—অনেকরূপ,

অপরিচ্ছিন্ন এবং তৃপ্তিনিবারক অর্থাৎ যতই অনুভব করা যায়, ততই পরমেশ্বরের সুখানুসন্ধানের জন্য—তাঁহাতে প্রীতি করিবার জন্য, সহজ লালসারই উদয় হয়। ভক্তিসুখ প্রতিক্ষণে নূতন হইতে নূতন—মধুর হইতে মধুর বিচিত্ররূপে বর্দ্ধমান। 'যিনি তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি তাহা জানেন,—এই ন্যায়ে ভক্তি-বিলাস-মাধুর্য্যাতিশয়াত্মক যে সুখ, তাহা অনুভবকারী ব্যতীত অপরে বুঝিতে পারে না। সুতরাং দুঃখানুভূতিহীনতারূপঋণ-মুক্ত্যাত্মক মুক্তি হইতে পরমমনোহর মহান্‌ভক্তিবিলাসবৈভব-মাধুর্য্যাতিশয়রূপ পরমধনাত্মক বাস্তব ভক্তিসুখবৈচিত্রী সর্ব্বতোভাবে বিলক্ষণ। (ঐ ২।২।২১৭)। মোক্ষ লম্পট ব্যক্তির ন্যায়। লম্পটকে যেমন বাধা দিলেও সে ধৃষ্টতা করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে চায়, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে জীবন্মুক্ত ভক্তগণ অতি তুচ্ছবোধে মুক্তিকে পরিত্যাগ করিলেও মুক্তি যেন বলপূর্ব্বক ভক্তের অনুগমন করে অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের অতি আনুষঙ্গিকভাবেই সমস্ত দুঃখ-নিবৃত্তি, আত্মারামতা প্রভৃতি লাভ হয়। তাঁদের চিত্ত ভগবৎপ্রেমানন্দে সর্ব্বদা তন্ময়। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতীয় স্ফোট-দর্শনের প্রয়োজন ও সিদ্ধান্ত। (ঐ ২।৫।১৯৮)

অভিধেয়-বিচারে—ব্রহ্মসূত্রের সাধনাধ্যায়ে অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে উপাসনার প্রতিকূল বিষয়ে বৈরাগ্য, দ্বিতীয় পাদে প্রাপ্য বিষয়ের জন্য তৃষ্ণা, তৃতীয় পাদে উপাসনার প্রকার আলোচনা এবং চতুর্থ পাদে পরাবিদ্যা বা ভক্তির দ্বারাই পরম পুরুষার্থ-লাভের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। "অপি সংরাধনে

প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্' (ব্রঃ সূঃ ৩।২।২৪) ;—অপি (পূর্ব্বসূত্রে ব্রহ্মাকে অব্যক্ত অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বলা হইয়াছে, তথাপি) সংরাধনে (সম্যক্ আরাধনায় পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়) প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ (ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে জানা যায়)—এই সূত্রে 'সংরাধন'-শব্দে সম্যক্ আরাধন বা সাক্ষাদ্ ভক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শ্রুতি এবং অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি এ বিষয়ে প্রমাণ (ভগবৎসন্দর্ভ ৭৮, ১০১)। কঠোপনিষৎ (২।১।১, ১।২।২৩), মুণ্ডকোপনিষৎ (৩।২।৩), মাধ্বভাষ্য (৩।৩।৫৩)-ধৃতা মাঠরশ্রুতি প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্রে এবং শ্রীগীতায় (১১।৫৪, ১৮।৫৫) ইত্যাদিতে উক্তি হইয়াছে যে, ভক্তিসাধকের নিকটই ভগবত্তনু প্রকাশিত হন, ভক্তিই সাধককে ভগবদ্দর্শন করাইয়া থাকেন, ভগবান্ ভক্তি-বশ। অনন্যা বা পরাভক্তিদ্বারাই ভগবানের যথার্থ স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। অতএব ভক্তিই সর্ব্বোত্তম অভিধেয় (সাধন) বা সম্যক্ আরাধন। সেই ভক্তি ভগবানের স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনীভূত আনন্দরূপাই। ইহার দ্বারাই ভগবান্ স্বরূপানন্দের অনুভব করেন এবং সেই আনন্দদ্বারাই বিশেষ আনন্দ-যুক্ত হ'ন। আবার সেই ভক্তিদ্বারাই ভগবান্ ভক্তগণকেও সেই আনন্দ অনুভব করাইয়া থাকেন। (প্রীতি-সঃ ৬৫ অঃ)

'সংরাধন'-শব্দের অর্থ যে ভক্তি, ইহা শ্রীশঙ্করাচার্য্য-পাদ, শ্রীভাস্করাচার্য্যপাদ, শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যপাদ, ও শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদাদি সকল আচার্য্যই স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সংরাধন

বা সম্যক্ আরাধনরূপা ভক্তিকে 'হ্লাদিনী' নাম্নী শ্রীভগবৎ-স্বরূপশক্ত্যানন্দারূপা বা ভগবৎপ্রেমবিলাস রূপা বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার। স্বরূপশক্তি—'হ্লাদিনী' নাম যাঁহার॥ হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ॥ হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার 'ভাব'। ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম 'মহাভাব'॥ মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী। সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥ কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে॥ অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥ (ভাঃ ১০।৩০।২৮)॥ সুতরাং ব্রহ্মসূত্র 'সংরাধন' এবং তাঁহার অকৃত্রিমভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবত 'আরাধন'-শব্দে স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ বা অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব হইলেও তাঁহার স্বরূপশক্তি শ্রীরাধার কৃপাকটাক্ষস্নাত নিজ-জনের সেবা-সঙ্গ-ফলে প্রত্যক্ষীকৃত হ'ন; ইহা ঋক্‌পরিশিষ্ট, শ্রীগোপাল-তাপনী প্রভৃতি শ্রুতি এবং বৃহদ্‌গৌতমীয়, মৎস্যপুরাণ, শ্রীসনৎ-কুমার-সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র প্রমাণ হইতে জানা যায়। ব্রহ্ম-সূত্র ও তাহার স্বতঃসিদ্ধ ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধার পরম-নিগূঢ়-রহস্যময় নাম ঐরূপ ইঙ্গিতেই উক্ত হইয়াছে।

ভক্তির নিত্যত্ব—আ প্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্ (ব্রঃসূঃ-৪।১।১২) আ প্রায়ণাৎ (মুক্তি পর্য্যন্ত) তত্রাপি (মুক্তিতেও)

হি (নিশ্চয়) দৃষ্টম্ (ভগদুপাসনা দেখা যায়)। "সর্ব্বদৈনমুপাসীত যাবন্মুক্তি, মুক্তা হ্যেনমুপাসতে" [মাধ্বভাষ্য (৪।১।১২) ধৃত সৌপর্ণশ্রুতিমন্ত্র]—মুক্তি পর্য্যন্ত সর্ব্বদা ভগবানের উপাসনা করিবে ; যেহেতু মুক্তগণও তাহার উপাসনা করেন। "মুক্তানামপি ভক্তির্হি নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী" (শ্রীমহাভারত-তাৎপর্য্য- [১।১০৬] ধৃত শ্রুতি) অর্থাৎ মুক্তগণেরও নিত্যানন্দরূপিণী ভক্তি বিরাজমান।। "যৎ সর্ব্বেদেবা আনমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ" (নৃঃ পূঃ তাঃ ২।৪।২৬) এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় শ্রীশঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন,—মুক্ত (সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত) পুরুষগণও সেচ্ছায় বিগ্রহ ধারণ করিয়া ভগবদ্ভজন করেন। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—"কৃষ্ণো মুক্তৈরিজ্যতে বীতমোহৈঃ" অর্থাৎ—মোহবিমুক্ত মুক্তগণও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন। "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা * * * * মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্" (গীতা ১৮।৫৪) এই গীতাবাক্যেও ব্রহ্মভূত অর্থাৎ মুক্ত পুরুষকেই পরা ভক্তির অধিকারী বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণেও দৃষ্ট হয়, "পাতাললোক শ্রীপ্রহ্লাদ ও শ্রীবলি-প্রমুখ মহাভগবতগণের নিবাসস্থান বলিয়া বিমুক্ত পুরুষ মাত্রেরই প্রিয়। (শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ৭৮ অনু)। তস্য চ নিত্যত্বাৎ (ব্রঃ সূঃ ২।৪।১৭)—তস্য (বেদসার বর্ণাত্মক নামের) চ (ও) [নিত্যতা] নিত্যত্বাৎ (বর্ণসমূহ নিত্য বলিয়া)—বর্ণসমূহ নিত্য বলিয়া বেদের সারস্বরূপ বর্ণাত্মক শ্রীকৃষ্ণাদি নামের নিত্যতা সিদ্ধ হয়। বেদে (ঋক্‌সংহিতা (১।১৫৬।৩) ও শ্রুতিতে (ছা ২।২৩।৩ ; মাণ্ডূক্য ১।১ ; গোপালতাপনী পূঃ ৩০)· "শ্রীভগবন্নামের নিত্যত্ব" কথিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণাদি প্রসিদ্ধ

নামসমূহ নিখিল প্রমাণের অগোচর এবং বেদসমূহেরই আত্ম-রূপে স্বতঃ সিদ্ধ। পরমেশ্বরের অন্যান্য অবতারের ন্যায় এই শ্রীনাম ও তাঁহারই বর্ণরূপী অবতার—এই বিষয়টি সেই শ্রুতি-বলেই অঙ্গীকৃত হইয়াছে; আর শ্রীভগবানের সহিত অভেদ-হেতু সেইরূপ উক্তি সম্ভবপরই হয়। তাদৃশ ভগবন্নামাদি কিরূপে পুরুষের ইন্দ্রিয়জন্য হইতে পারে? তদুত্তরে—যেমন শ্রীভগবানের কৃপায়ই নিখিল বেদ পুরুষের ইন্দ্রিয়াদিতে আবির্ভূত হ'ন; পরন্তু উহা পুরুষের ইন্দ্রিয় দ্বারা উৎপাদনের যোগ্য নহেন, সেইরূপ শ্রীভগবৎকৃপায়ই সেবোন্মুখ জিহ্বাদিতে শ্রীনাম স্বয়ং স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হ'ন। (শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ৪৬)।

প্রয়োজন:—আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ (ব্রঃ সূঃ ৪।১।১)—আবৃত্তিঃ (কীর্ত্তন বা অনুশীলন) অসকৃৎ (বারংবার) [কর্ত্তব্য], উপদেশাৎ (শাস্ত্রের উপদেশপর বাক্য হইতে) [জানা যায়]। শ্রীনামের আবৃত্তি-বা অনুশীলনই 'সাধন' ও 'সাধ্য'। নামাপরাধ থাকাকালে শ্রীনামব্রহ্মের আবৃত্তির বিধান শাস্ত্রে যে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে জানা যায়। সিদ্ধপুরুষগণও শ্রীনামব্রহ্মের আবৃত্তি করেন। ঐ আবৃত্তি প্রতিপদে সুখ-বিশেষরই উদয় করায়। আর অসিদ্ধগণের যে আবৃত্তির নিয়ম, তাহা ফলপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত; অর্থাৎ অবিশ্রান্তভাবে নামের আবৃত্তি করিতে করিতে যখন শ্রীনামের কৃপায় তাহাদের অপরাধ দূর হয়, তখনই তাহাদের প্রয়োজন লাভ সম্ভব; আবৃত্তির অভাব হইলে ফলপ্রাপ্তির বাধক অপরাধ থাকিতে পারে।—"সিদ্ধানামাবৃত্তিস্তু প্রতিপদমেব সুখবিশেষোদয়ার্থা।

আসিদ্ধানামাবৃত্তিনিয়মঃ ফলপর্য্যাপ্তিপর্য্যন্তঃ ; তদন্তরায়েঽপরাধাবাস্থিতি-বিতর্কাৎ।" (ভক্তিসন্দর্ভ ১৫৩ অনু)

ফলাধ্যায়ের সর্ব্বশেষ সূত্র—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" (ব্রঃ সূঃ ৪।৪।২২)—"অনাবৃত্তিঃ (অপ্রত্যাবর্ত্তন) শব্দাৎ (শ্রুতি প্রমাণানুসারে) [দৃঢ়তার জন্য পুনরাবৃত্তি বা সমাপ্তিসূচক পুনরাবৃত্তি]। "ন চ পুনরাবর্ত্ততে ন চ পুনরাবর্ত্ততে" [ছাঃ ৮।১৫।১] "যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ" ভাঃ ৭।৪।২২ "যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" (গীতা ১৫।৬) ইত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণ হইতে মুক্তপুরুষগণের কর্ম্মাধীন জন্মের নিবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে মুক্তপুরুষগণের যে পুনরাবৃত্তির কথা শুনা যায়, তাহা প্রপঞ্চে ভগবদ্ধামসমূহের স্থিতি অপেক্ষায় বা ভগবল্লীলা-কৌতুকের অপেক্ষায়ই জানিতে হইবে অর্থাৎ শ্রীমথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীদ্বারকা, শ্রীঅযোধ্যাদি যে সকল ভগবদ্ধাম এই জগতে বিরাজমান আছেন, সেই সকল ধামে বিচরণ করিবার জন্য মুক্ত ভগবৎপরিকরগণও কখনো কখনো পরব্যোমস্থিত ভগবদ্ধাম হইতে অবতরণ এবং জয়-বিজয়ের ন্যায় কোন কোন পরিকর ভগবল্লীলা-কৌতুক-সম্পাদনের জন্য জগতে আগমন করেন। তাহা হইলেও তাঁহারা চিরকাল প্রপঞ্চে অবস্থান করেন না; পরে নিত্যসালোক্য প্রাপ্ত হন। (প্রীতিসন্দর্ভ ১০ অনু) এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীপ্রীতি সন্দর্ভে ১৩-১৬ অনু বহু শাস্ত্র বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে ৭।২৫।২ মুক্তপুরুষের সকল লোকেই স্বাচ্ছন্দগতি এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে (৪।৪।৬,২২) মুক্তপুরুষের যে পরমাত্মভাব

প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গ লইয়াই ব্রহ্মসূত্রে (৪।৪।১৭) উক্ত হইয়াছে যে, নিখিল চিদচিৎ সৃষ্টি-স্থিতি-নিয়মনরূপ জগদ্ব্যাপার একমাত্র ব্রহ্মেরই কার্য্য, এতদ্ব্যতীত সকল কার্য্যে মুক্ত জীবের কর্ত্তৃত্ব সম্ভব। এই ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩।৪১ "অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্য্য-গুণৈঃ সমম্।"—শ্লোকের প্রমাণ হইতে জানা যায়, সার্ষ্টি মুক্তি অর্থাৎ শ্রীভগবানের সমান ঐশ্বর্য্যের কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা গৌণ অর্থাৎ সার্ষ্টি মুক্তিতে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের আংশিক প্রাপ্তি হয়। সারূপ্যমুক্তিতেও কোন মুক্ত পুরুষই ভগবানের সমুদয় রূপ, চিহ্ন ও লক্ষণযুক্ত হইতে পারেন না। শ্রীবৎস, কৌস্তুভ ও শ্রীভগবানের শ্রীকরচরণের অসাধারণ চিহ্ন-সকল একমাত্র শ্রীভগবানেরই নিজস্ব। সাযুজ্যমুক্তিতে ভগবানের স্বরূপভূত আনন্দে নিমগ্নতার স্ফূর্ত্তিই প্রধান। কেহ বলেন, —শ্রীভগবানের শক্তিলেশ-প্রাপ্তিদ্বারা মুক্তপুরুষ অপ্রাকৃত ভোগলেশানুভব করেন; কিন্তু সর্ব্বতোভাবে ভগবানের ন্যায় ভোগ অনুভব করিতে পারেন না। সাযুজ্যমুক্তিতে সেবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের অভিপ্রেত নহে; এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে উহার স্পষ্ট উদাহরণ নাই। শিশুপাল ও দন্তবক্র সাযুজ্যমুক্তি পাইয়াছিলেন। সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেও স্বেচ্ছায় শ্রীভগবান্ লীলার জন্য নিজ শ্রীঅঙ্গ হইতে বাহিরে আনিয়া পুনরায় পার্ষদরূপে সংযোজিত করেন (ভাঃ ৭।১।৪৬। সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে সামীপ্যমুক্তিই শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাহা বহিঃসাক্ষাৎকারময়। আর সেব্য-

সেবক-ভাবের অভাবহেতু সাযুজ্যমুক্তি নিকৃষ্ট, তথাপি ব্রহ্ম-কৈবল্য হইতে শ্রেষ্ঠ। ভক্তগণ—'নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য-না লয়'। শ্রীকর্দ্দমের সামীপ্যমুক্তি (ভাঃ ৩।২৪।৪৩-৪৭), শ্রীগজেন্দ্রের সারূপ্যমুক্তি (ঐ ৮।৪।৬), জয়-বিজয়ের সালোক্য-মুক্তি (ঐ ৩।১৫।১৪), শ্রীদেবহূতির সার্ষ্টি মুক্তি (ঐ ৩।২৩।৮, ৭) ও শিশুপাল-দন্তবক্রাদির সাযুজ্যমুক্তির (ভাঃ ৭।১।৪৬) কথা শ্রীমদ্ভাগবতে পাওয়া যায়। শ্রীপরীক্ষিতের ব্রহ্মকৈবল্যের পর ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছিল (ভাঃ-১২।৬।৫-৭) ; শ্রীঅজামিলের (ভাঃ-৬।২।৪০-৪৪) এবং শ্রীভীষ্মের ব্রহ্মকৈবল্যের পর ক্রমভগবৎ-প্রাপ্তির রীতি-অনুসারে ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছিল (ভাঃ ১।৯। ৪৪, ৭।৭।৩৭)।

সপ্তম ক্রম

স্ফোট শরণাগত ব্যাকুল ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রথমে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররূপে স্ফূটিত হইয়া সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকাশিত হ'ন। সেই স্ফোট গায়ত্রীরূপে প্রকাশিত হইয়া ব্রহ্মাকে সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মে প্রয়োজিত করেন। ব্রহ্মা স্ফোট হইতেই সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন। ব্রহ্ম মন্ত্রাত্মক স্ফোটের আরাধনা করিলে স্ফোট কৃপাপূর্ব্বক নিজ পূর্ণস্বরূপ, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, মায়া ইত্যাদি প্রদর্শন করিলেন। ব্রহ্মা আবার শ্রীনারদকে, শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে উক্ত সকল বিষয় সঞ্চারিত করিয়া এজগতে ব্রহ্ম সম্প্রদায় বিস্তার করেন। এইরূপ শ্রীলক্ষ্মীদেবী, শ্রীরুদ্রদেব ও চতুঃসন স্ফোটতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া নিজ নিজ ধারায় প্রবাহিত করেন। স্ফোটের প্রকাশ বেদকল্প-বৃক্ষের বীজ,—'প্রণব,' অঙ্কুর—'গায়ত্রী' এবং

ফল—'চতুঃশ্লোকী' ভাগবত। বিশ্বসৃষ্টির প্রাক্কালে তত্ত্বজিজ্ঞাসু শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে চতুঃশ্লোকী ভাগবত প্রাপ্ত হন। শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদকে তাহা উপদেশ করেন এবং শ্রীনারদ এই চতুঃশ্লোকী শ্রীব্যাসদেবের নিকট কীর্ত্তন করেন। এইভাবে আম্নায়-পারম্পর্য্যে বিস্তার হয়। চতুঃশ্লোকীর প্রারম্ভে মূল বক্তব্য বিষয়ের মুখবন্ধরূপে দুইটি শ্লোক আছে। সুতরাং চতুঃশ্লোকী লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টি শ্লোক। বেদোক্ত 'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়' ও 'প্রয়োজন' তত্ত্ব আদি চতুঃশ্লোকী ভাগবতে দৃষ্ট হয়। ভূমিকা-স্বরূপ প্রথম শ্লোকটিতে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—তিনিই (শ্রীকৃষ্ণই) সম্বন্ধিতত্ত্ব, তাঁহার সম্বন্ধীয় জ্ঞান (যথার্থ নির্দ্ধারণ) এবং তাঁহার সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (অনুভব বা সাক্ষাৎকার) সম্বন্ধ-তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত। আর যাহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধ (সম্যক্ বন্ধন) স্থাপিত হয়, তাহাই 'রহস্য' অর্থাৎ প্রেমরূপ প্রয়োজন। রহস্যের যে অঙ্গ, তাহাই সাধনভক্তিরূপ 'অভিধেয়' তত্ত্ব। মুখবন্ধের দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীভগবান্ শ্রীব্রহ্মাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) কৃপায় সেই পরমগুহ্য জ্ঞান ব্রহ্মার চিত্তে স্ফূরিত হউক। তদ্দ্বারা শ্রীভগবান্ যে পরিমাণ বিশিষ্ট (বিভু, অণু বা মধ্যমাকৃতি), যে যে লক্ষণ (স্বরূপ ও তটস্থ)-যুক্ত এবং তাঁহার যে সমস্ত স্বরূপান্তরঙ্গ শ্যাম-চতুর্ভুজাদি রূপ, ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ ও লীলাসমূহ নিত্য বিদ্যমান, তাহার উপলব্ধি হইবে।

চতুশ্লোকীর প্রথম শ্লোকে বলিলেন,—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র তিনিই ছিলেন ; তাঁহার বিজাতীয় সৎস্বরূপ স্থূল জগৎ, অসৎ-

স্বরূপ সূক্ষ্ম জগৎ এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের কারণরূপ প্রধান বা প্রকৃতি কিছুই ছিল না। ব্রহ্মার নিকট যে পরম মনোহর শ্রীবিগ্রহরূপে উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, তিনি সেই শ্রীমূর্ত্তিতেই মহাপ্রলয়কালেও বর্ত্তমান ছিলেন। ইহা শ্রীব্রহ্মাকে বলিলেন। 'সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম'— শ্রীভগবানের এই উক্তিতে শ্রীভগবান্ তাঁহার ধাম ও পরিকরাদির সহিত সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিলেন—ইহা বুঝা যায়। সৃষ্টির পূর্ব্বে সমস্ত মায়িক ব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃতি ও পুরুষ সকলই শ্রীভগবানের লীন ছিল; তখন তাহাদের আর কোন পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না। সৃষ্টির পরেও বৈকুণ্ঠে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহরূপে এবং অন্যান্য ভগবদ্ধামে, তত্তদ্ধামোপযোগী স্বরূপে, আর প্রাপঞ্চিক ব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্য্যামিরূপে, কখনো কখনো বা মৎস্যাদি অবতাররূপে তিনি অবস্থান করেন।

চতুঃশ্লোকীর দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীভগবান্ তাঁহার নিজ-স্বরূপ ব্যতিরেকমুখে জানাইবার জন্য মায়ার লক্ষণ বলিয়াছেন। তিনিই (শ্রীকৃষ্ণই), 'অর্থ' অর্থাৎ পরমার্থভূত বস্তু। সেই পরমার্থবস্তু ব্যতীত যাহার প্রতীতি হয় অর্থাৎ তাঁহার প্রতীতি (প্রতি+ই+তি=প্রতিগমন বা উন্মুখতা) না হইলেই যাহার প্রতীতি হয়, তাহাই তাঁহার 'মায়া'। পরমাত্মার আশ্রয়-ব্যতীত মায়ার স্বতঃপ্রতীতি বা স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ইহার দ্বারা মায়া যে পরমাত্মার আশ্রিত শক্তি এবং পরমাত্মার বাহিরেই মায়ার প্রতীতি হওয়ায় তাহা যে পরমাত্মার বহিরঙ্গা শক্তি, ইহা প্রমাণিত হইল। মায়ার দুইটী বৃত্তি—'জীবমায়া' ও 'গুণমায়া'।

যে বৃত্তিটি বহির্ম্মুখ জীবের স্বরূপ-জ্ঞানকে আবৃত করিয়া রাখে এবং মায়িক বস্তুতে জীবের আসক্তি করায়, তাহাই জীবমায়া ; আর ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই গুণমায়া। জীবমায়াংশে মায়া—সৃষ্টির গৌণ 'নিমিত্ত'-কারণ এবং গুণমায়াংশে—সৃষ্টির গৌণ 'উপাদান'-কারণ। শ্রীভগবান্ 'সূর্য্যে'র দৃষ্টান্তের দ্বারা তাঁহার 'স্বরূপের', 'আভাসে'র দ্বারা 'জীবমায়ার' এবং 'অন্ধকারে'র দ্বারা 'গুণমায়া'র স্বরূপ ব্রহ্মাকে বুঝাইলেন।

চতুঃশ্লোকীর তৃতীয় শ্লোকে—শ্রীভগবান্ প্রেমের রহস্যত্ব বুঝাইলেন। 'মৃত্তিকা', জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ'—এই পঞ্চ-মহাভূতের দ্বারা প্রাণিগণের দেহ গঠিত। সুতরাং এই পঞ্চ-মহাভূত প্রণিগণের দেহে অনুপ্রবিষ্ট। আবার উক্ত পঞ্চমহাভূত প্রাণিগণের দেহের বহির্দ্দেশেও মৃত্তিকা, জল প্রভৃতিরূপে অবস্থিত বলিয়া প্রাণীর দেহে অপ্রবিষ্ট। শ্রীভগবান্ও প্রণত (ভক্ত) জনের অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বদা স্ফূরিত হন। অবশ্য শ্রীভগবান্ অন্তর্য্যামিস্বরূপে সকল প্রাণীর মধ্যেই প্রবিষ্ট আছেন ; আবার নিজস্বরূপে স্বীয়ধামেও বিরাজমান আছেন। সুতরাং তিনি প্রাণিগণের বহির্ভাগেও আছেন। অন্য প্রাণীর মধ্যে শ্রীভগবান্ নির্লিপ্তভাবে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করেন, তথায় তিনি কেবল সাক্ষিস্বরূপে উদাসীন ; কিন্তু প্রণত জনের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ ভক্তের প্রেমরস আস্বাদন করিয়া স্বয়ং আনন্দিত হ'ন এবং স্বীয় স্বরূপ-শক্ত্যানন্দের দ্বারা ভক্তগণকেও আনন্দিত করেন। আবার প্রণত জনের বাহিরে যখন তিনি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হ'ন, তখনও তিনি তাঁহাদের প্রেমরস আস্বাদন করিবার জন্য

এবং স্বীয় সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য ভক্তকে আস্বাদন করাইয়া তাঁহাকে আনন্দিত করিবার জন্যই সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকেন। ইহাই প্রেমের স্বভাব। এই প্রেমভক্তিই—'রহস্য'।

চতুঃশ্লোকীর চতুর্থ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—বিধি ও নিষেধদ্বারা যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে, আমার তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিগণ তাহাই শ্রীগুরুদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন। উক্ত শ্লোকে শ্রীভগবান্ পরমরহস্য ভগবৎপ্রেমের অঙ্গ-স্বরূপ ক্রমলব্ধ 'সাধন-ভক্তি'র উপদেশ করিয়াছেন। এই সাধনভক্তি প্রয়োজন-সাধক বলিয়া নিজেও 'রহস্য'। এই সাধনভক্তি বা উপায়টিতে অন্বয় (বিধি) ও ব্যতিরেক (নিষেধ), অন্যনিরপেক্ষতা, সার্ব্বত্রিকতা ও সদাতনত্ব সিদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া ইহা অভীষ্টসিদ্ধির নিশ্চিত উপায়। ভক্তি—'অন্যনিরপেক্ষ'। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি সাধন—ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করিলে অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারে না; ইহা শ্রীগীতা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। কিন্তু ভক্তি অন্যনিরপেক্ষ হইয়া আভাসের দ্বারাই কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির প্রাপ্য যাবতীয় ফল অনায়াসেই প্রদান করিতে পারেন এবং স্বয়ং পরম ফল যে 'প্রেমা', তাহা দান করেন। ভক্তির 'সার্ব্বত্রিকতা' স্বতঃসিদ্ধ। সদাচারী ও দুরাচারী, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, বিরক্ত ও আসক্ত, মুমুক্ষু ও মুক্ত, সাধক ও সিদ্ধ, পার্ষদতাপ্রাপ্ত ও নিত্যপার্ষদ—সর্ব্বপাত্র-নির্ব্বিশেষে ভক্তির অধিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী প্রভৃতিও ভক্তি-

প্রভাবে উর্দ্ধগতি, এমন কি বৈকুণ্ঠগতি লাভ করিতে পারে। ভক্তি—সকল দেশে ও সকল অধিকারীতে এবং সকল সময়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ভক্তি—'সদাতন'। কর্ম্ম—সন্ন্যাস ও ভোগপ্রাপ্তি-পর্য্যন্ত, তাহার পরে নহে; যোগ—সিদ্ধি-পর্য্যন্ত এবং সাংখ্য—আত্মজ্ঞান-পর্য্যন্ত; তাহার পরে উহাদের প্রয়োজন নাই। জ্ঞান-সাধন—মুক্তিকাল-পর্য্যন্ত, সুতরাং উহারও নিত্যতা নাই; কিন্তু ভগবদ্ভক্ত নিত্যসিদ্ধদেহে ভগবদ্ধামে নবনবায়মান বিচিত্রতার সহিত ভক্তির নিত্যকাল অনুষ্ঠান করেন। সকল অবস্থায়ই ভক্তির যোগ্যতা, যথা—গর্ভে অবস্থানকালে প্রহ্লাদাদির, বাল্যকালে ধ্রুবাদির, যৌবনে অম্বরীষাদির; বার্দ্ধক্যে যযাতি প্রভৃতির, দেহত্যাগকালে অজামিলাদির এবং স্বর্গ-গতাবস্থায় চিত্রকেতু প্রভৃতির ভক্তিতে অধিকার দেখা যায়। নৃসিংহপুরাণোক্তি হইতে নরকে অবস্থানকালেও হরিভজনে অধিকারের কথা জানা যায়।

সমগ্র ঋগ্‌বেদের সংক্ষেপ-স্বরূপ যে উহার প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রথম শ্লোকে; সমগ্র যজুর্বেদের সংক্ষেপ স্বরূপ যে উহার প্রথম মন্ত্র তাহার অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে; সমগ্র সামবেদের সংক্ষেপ-স্বরূপ যে উহার প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবতের চতুর্থ শ্লোকে, সমগ্র অথর্ব্ববেদের সংক্ষেপস্বরূপ যে উহার প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ চতুশ্লোকী ভাগবতের তৃতীয় শ্লোকে এবং চতুর্ব্বেদের রহস্যভূত-মন্ত্র, শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের

পঞ্চমাধ্যায়স্থ 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং"—এই পরম-রহস্যভূত শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

স্ফোটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ স্বরূপ মহামন্ত্র ইজ্যা, ব্রত, অধ্যয়ন ইত্যাদি সমস্ত পারমার্থিক অনুশীলনের চালক। কলিযুগ পাবনাবতারী শ্রীগৌরহরি এই মহামন্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। ইহা একাধারে কলিযুগের তারক ও পারক-ব্রহ্মনাম। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ-সঙ্কলিত শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে ১১৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—"তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেম-ভক্তিশ্চ পারকাৎ॥" মায়াদেবী শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন,—"মুক্তি-হেতুক তারকব্রহ্ম হয় রামনাম। কৃষ্ণনাম পারক হঞা করে প্রেমদান॥" (চৈঃ চঃ অঃ ৩।২৫৫)। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোথাও 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরকে 'মহামন্ত্র' বলিয়া সর্ব্বক্ষণ অনুশীলনের কথা নাই। শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ে "শ্রীমন্নারয়ণচরণৌ শরণং প্রপদ্যে", "শ্রীমতে নারায়ণায়"—এই নাম সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তনীয় এবং অষ্টাক্ষর প্রণবপুটিত মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিকের সময় তুলসীমালায় জপ্য। উক্ত সম্প্রদায়ের শ্রীরামানন্দি-শাখায় দীক্ষামন্ত্রই আহ্নিকের সময় জপ করা হয়। সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তনীয় কোন নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র নাই। তত্ত্ববাদিগণের মধ্যেও ঐরূপ বিচার। শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ে "শ্রীকৃষ্ণ শরণং মম" বাক্যকে মহামন্ত্র বলা হয় এবং উহা তুলসীমালায় গোমুখীর (মালার থলের) মধ্যে জপ করা হয়। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে শ্রীকেশব কাশ্মীরীর প্রশিষ্য শ্রীহরিব্যাসদেবজীর সময় হইতে

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অনুকরণে "রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে। রাধেশ্যাম রাধেশ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে ॥"—বাক্য মহামন্ত্ররূপে তুলসীমালায় জপ্য হইয়াছে।

'কলিসন্তারক' বা 'কলিসন্তরণ'-উপনিষদে,—উহাদের প্রারম্ভে "ওঁ শ্রীমদ্বিশ্বাধিষ্ঠান-পরমহংসগুরু-রামচন্দ্রায় নমঃ' এবং উপসংহারেও ঐরূপ পদের সহিত 'রামচন্দ্রায়ার্পণমস্তু' বাক্য দৃষ্ট হয়। কোন কোন পুঁথির প্রারম্ভে শ্রীরামচন্দ্রের প্রণাম-সূচক শ্লোকও দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত অযোধ্যাদি স্থানে শ্রীরামলীলার সংকীর্ত্তনমণ্ডলী ও কুম্ভমেলায় সমবেত রামোপাসকগণ উক্ত কলিসন্তরণোপণিষদের ক্রমানুসারেই শূদ্রাদি জাতিনির্ব্বিশেষে উক্ত নাম সংকীর্ত্তন করেন। কোনও রামোপাসক ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের দ্বারা ঐ গ্রন্থ সঙ্কলিত বলিয়া অনুমান করা যায়।

অষ্টম ক্রম

স্ফোটে শব্দ বিজ্ঞানঃ—সাঙ্কর্ষণসূত্রে দুইটি সূত্র আছে, তাহার মূল কথা এই—১। শব্দ ও শব্দী ভিন্ন নহে। ২। শব্দমাত্রই শব্দী। অর্থাৎ শব্দমাত্রই বিষ্ণুবোধক। শব্দকে মাপা যাইবে না। যেখানে মাপা যায়, সেখানেই বহির্জগৎ, ইতরব্যোম—পরব্যোম নহে। আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ও প্রবৃত্তি কেবল বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই যখন নিযুক্ত, তখনই তাহা সেবায় উন্মুখ ; আর যাহা অপরের নিকট হইতে সেবা আদায় করে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামনার তৃপ্তির আকারে, তাহাই সেবার বিরোধী ব্যাপার বা নাস্তিকতা। এই নাস্তিকতা বহুরূপিণী মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইতে পারে

Altruism, Utilitarianism, Positivism, Pantheism ইত্যাদি নানা আকারে উপস্থিত হয়। এ সকল দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" হরিনাম গ্রহণ ছাড়া অন্য alternative আছে, ইহাই তর্কপথ। হরিনামের আর অন্য কোন প্রকার alternative নাই। Alternative কল্পনা করিলেই এই পৃথিবীর চিন্তাস্রোত। হরিনাম-গ্রহণ কারিগণকে একটা Party মনে করিয়াছেন যাঁহারা, আর হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনই একমাত্র পথ নহে যাঁহারা মনে করিতেছেন, তাঁহারা অপ্রাকৃতকে মাপিতে যাইতেছেন, তাঁহারা মাপার দল বা মায়ার দল—অভক্তসম্প্রদায়।

সর্ব্বাগ্রে নাম জিনিষটা কি, তাহা জানা দরকার। শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু বলিয়াছেন—"নিখিল-শ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতি-নীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত। অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥" নাম একটী অচেতন পদার্থ নহেন। যেখানে নাম অচেতন পদার্থের বাচক হয়, নাম-নামী ভেদ হয়, সেখানে 'হরিনাম' সম্বন্ধে বলা হয় না। হরিনাম আভিধানিক শব্দ কিম্বা প্রাকৃত ব্যাকরণ-নিষ্পন্ন শব্দ ন'ন। অন্য যাবতীয় শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তু স্বতন্ত্র,—শব্দ স্বতন্ত্র। 'হরিনাম' কথা বল্‌তে পারেন। যিনি হরিনাম গ্রহণকারী, তিনি চেতনময় বস্তু। তিনি বল্‌ছেন,—"হে হরিনাম! আমি তোমার দাস, তোমার আনুগত্য স্বীকার কর্‌লাম।" যিনি হরিনাম কর্‌তে প্রবৃত্ত হ'ন, তিনি হরিনাম-প্রভুর ভৃত্য। জগতের শব্দমাত্রই হরিভিন্ন

অন্যবস্তুকে উদ্দেশ করে। যে-সমুদয় বস্তু জাগতিক শব্দ-দ্বারা উদ্দিষ্ট হ'য়েছে, তা' অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোচিত হ'য়ে তা'দের সম্বন্ধে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার মোট তাৎপর্য্য মনদ্বারা গৃহীত হচ্ছে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিও স্বতন্ত্র। শব্দ জিহ্বা-দ্বারা উচ্চারিত এবং কর্ণদ্বারা শ্রুত হয়। কিন্তু জিহ্বা-দ্বারা উহা আস্বাদনীয় নয়, ত্বকের দ্বারা উহা স্পর্শ করা যায় না। শব্দ কেবল কর্ণেন্দ্রিয়েরই গ্রাহ্য। হরিনাম ঐরূপ শব্দের সহিত সমান ন'ন। অন্য শব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র অন্য চারিটি ইন্দ্রিয় তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয়। শব্দ শব্দীকে লক্ষ্য করে। জাগতিক শব্দের শব্দী বহির্জ্জগতের কোন বস্তু—যা' ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। শব্দ কাণে গিয়া অন্য ইন্দ্রিয়দিগকে বলে যে, তোমরা বুঝে নেও—বস্তুটি কি। সসীম জিনিষের যেমন একটা সংজ্ঞা আছে, সেইরূপ যা' সীমাবদ্ধ নয়, তা'রও একটা সংজ্ঞা আমরা ব্যতিরেকভাবে কর্‌তে পারি। সীমাবিশিষ্ট বস্তু সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়দিগের মেপে নেওয়া একটা কার্য্য উপস্থিত হয়। যা'র সীমা নেই চেষ্টা ক'রেও আমরা তা'র কোন কিনারা পাই না। এইরূপ ব্যাপারকে অসীম (infenity) ব'লে একটা শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করি। যদি শব্দ-দ্বারা জ্ঞাতব্য বস্তু সীমাবিশিষ্ট হয়, তা' হ'লে সেই বস্তুকে জান্‌বার জন্য বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলিকে নিযুক্ত করি। হরি বস্তু সীমাবিশিষ্ট ন'ন। তিনি সীমাবিশিষ্ট বস্তুর সীমাকে হরণ করেন। অসীমকে যখন তিনি হরণ করেন, তখন তিনি সীমাবিশিষ্ট। সসীম বস্তু কখনও অসীম নহে। দেশ সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। সীমাবিশিষ্ট ব্যাপারে যে

অবরতা আছে, হরিতে তা' আরোপ কর্‌তে হ'বে না। অসীম বস্তুর অভ্যন্তরে 'সীমা' ব'লে একটা ব্যাপার আছে; কিন্তু সসীম এবং অসীম শব্দ হরিতে যুগপৎ প্রযুক্ত হ'তে পারে। সমস্ত জিনিষ যিনি নিয়ে নেন, তিনিই সেই হরি।

সূর্য্যকে 'কপিঃ' (কং জলং পিবতি ইতি কপিঃ) বলা হয়, যেহেতু তিনি জলকে টেনে নেন্। হরি শুধু জল টেনে নেন্ না। জড় জগতের যত বস্তু আছে—ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—সব তিনি হরণ কর্‌তে—আকর্ষণ কর্‌তে পারেন। 'অভাব' ও 'ভাব'-যুক্ত উভয়বিধ জিনিষকে তিনি হরণ, আকর্ষণ করেন। হরণ-কার্য্যের নির্ব্বিশেষ বিচার গ্রহণ কর্‌তে হ'বে না। সবিশেষ আকর্ষণ বিচারে হরিকে 'বিষ্ণু' বলা হয়। বর্ত্তমানতা ও অবর্ত্তমানতা উভয়কেই তাঁর হরণ কর্‌বার ক্ষমতা আছে। 'বিষ্ণু' ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হ'ন। আমরা এই হরিকে না বুঝ্‌তে পেরে অন্যরূপে অনেক কথা বলি—হরিকে নির্ব্বিকার, নিরাকার বলি। চক্ষু ইন্দ্রিয় অসীম বস্তুকে গ্রহণ কর্‌তে সমর্থ নহে। চক্ষু ইন্দ্রিয়ের যা' অগ্রাহ্য, এরূপ অসীম আকারবিশিষ্ট বস্তুকে আমরা নিরাকার বলি। কিন্তু আকাশকে অসীম বল্‌লে অসীম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'য়ে যায়—সসীমের অন্তর্গত হ'য়ে যায়—সসীমের গুণফল (multiple of semething definite) বিচার হ'য়ে যায়—চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির সীমাটা তখন পরিমাপক হয়। বিকারশীল জগতে আমরা নির্ব্বিকার বস্তু দেখি না; নেতি নেতি ক'রে মনে ক'রি,—নির্ব্বিকার। আমার ধারণার বাহিরের বস্তু নির্দ্দেশ কর্‌তে গিয়ে

ধারণার মধ্যের বস্তুকে লোপ (Rub out) করি। দৃশ্য বিষয় (Phenomena) কে এরূপভাবে বিদায় কর্‌লে দৃশ্য বিষয়েরই অপরদিক আমাদের উদ্দিষ্ট বস্তু হয়।

জড়বৈজ্ঞানিকগণ বিচার কর্‌তে পারেন যে, তাঁরা সব বুঝে নিয়েছেন। তাঁ'রা যা' বুঝ্‌তে পেরেছেন, তা' 'ঈশ্বর' শব্দ বাচ্য হ'বে না—সে-সব 'বান্দা' হ'য়ে যায়। এরূপ মনে করাটাও থাকে না। এই সমুদয় শব্দ অর্থাৎ নিরাকার, নির্ব্বিকার, ব্যক্তিহীন ইত্যাদি শব্দগুলি ব্যবহার দ্বারা ভগবানের ব্যক্তিত্ব অপলাপ করা হয়। আমার বশীভূত যা' নয়, তাঁ'কে উদ্দেশ ক'রে একটা শব্দ প্রয়োগ করা হয় মাত্র—যে শব্দটা জিনিষ থেকে আস্‌ছে না। ইহ জগতের জিনিষকে ছেড়ে দিয়ে তা'র অভাব-বোধক অন্য জিনিষকে যে শব্দ-দ্বারা লক্ষ্য করি, আমরা সে শব্দকে 'বড়' ব'লে মনে করি। কিন্তু সে শব্দটা পূর্ণ অদ্বয়বস্তুর একটি আংশিক প্রতীতি মাত্র। Undefined Portion of the angle কে যেমন Complementary, Supplementary angle ব'লে। অর্দ্ধেক কথা নিয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা; অপর অর্দ্ধেকের কথা আমরা জানি না। আমরা দেখি—ইন্দ্রিয়গুলো দেখে—বৃত্তার্দ্ধ (hemisphere), বৃত্তের অন্য অর্দ্ধ (other moiety) সর্ব্বদা অস্বীকৃত হচ্ছে। দেশের সম্বন্ধে এইসব কথা হচ্ছে।

আবার কালের সম্বন্ধে ইতিহাসে অনেক কথা লেখা আছে। সূর্য্যের ভ্রমণ, গ্রহ-নক্ষত্রাদির ভ্রমণ, জাগতিক সমুদয় ব্যাপারের ঘটনাকাল ইত্যাদি কালবিচারের অন্তর্গত। এই কালের

রাজ্যের বিচার বাদ দিয়ে কালাতীত রাজ্যের বিষয়কে 'মহাকাল' ইত্যাদি শব্দদ্বারা অভিহিত করি। মহাকাল কালের অব্যবহিত অভিজ্ঞান (Uninterrupted Cognesance of time)। তিন বৎসর, সাড়ে তিন বৎসর ইত্যাদি খণ্ডকালকে লক্ষ্য করে। অন্য অংশকে বাদ দিয়ে একটা অংশ বলা হয়। খণ্ডকালকে হরণ করেন ব'লে তাঁকে মহাকাল বলা হয়। মহাকালকে হরণ করেন ব'লে তাঁকে খণ্ডকাল বলা যায়। তিনি খণ্ডকালের মধ্যে তাঁ'র অন্তর্গতরূপে আস্‌তে পারেন না, ইহা সর্ব্বব্যাপকত্ব কথা হ'তে পারে না। তিনি কাল মহাকাল —উভয়কেই হরণ করেন।

পাত্র সম্বন্ধে বিচার দেখা যায় যে, পাত্র-দ্বারা বিশিষ্ট জিনিষকে (individuality) বুঝায়—যা' কাল এবং দেশ জাতীয় ব্যাপারকে (in corporates the factors of time and space) অন্তর্ভুক্ত করে। খণ্ডিত পাত্র—যেমন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি (individual), অর্থাৎ খণ্ডকাল এবং খণ্ডদেশ অবকাশকে ঢেকে রেখে যে মানুষটা হয়, তা'কে ব্যক্তিবিশেষ ব'লে অভিহিত করি। অন্য মানুষ—বর্ত্তমানের এবং ভবিষ্যতের মানুষ অন্তর্ভুক্ত করে' 'বিরাট' কল্পনা করা হয়। 'এক' পাত্র বিভিন্ন হ'য়ে বহু' পাত্র। যেমন এক গ্লাস জলে আলোক প্রতিফলিত হ'য়েছে—এক হাজার গ্লাসে প্রতিফলিত হ'য়েছে—সমান্তর আয়নাতে প্রতিফলিত হ'য়েছে। একটা জিনিষই বহু হয়েছে। জিনিষটার বহুত্ব হয় নাই—তা'র সাদৃশ্য বহু হ'য়েছে। তা'তে জিনিষটার একত্ব বিনিষ্ট হয় না। বিশিষ্ট

অবকাশের (Particular Span) মধ্যে বিষ্ণুর বিগ্রহের (Figure) অধিষ্ঠান হ'তে পারে। বহির্জগতের দৃশ্য বস্তুর সঙ্গে ভুলক্রমে সাম্য বিচার কর্‌তে হ'বে না। তিনি তদপেক্ষা অধিকতর শক্তিবিশিষ্ট। তিনি জগতের সমস্ত ব্যক্তির সমুদয় যুক্তিকে নিরাস ক'রে বিরাজ কর্‌তে পারেন। তিনি পাত্রকে হরণ কর্‌তে পারেন, নিত্যকাল আত্মবৃত্তিতে রেখে দিতে পারেন। অল্পকাল স্থায়ী বিমুখ মানব-জীবনকে হরণ ক'রে নিত্য আত্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে পারেন। তিনি যে কেবল সসীম জিনিষকেই হরণ কর্‌তে পারেন, এমন নয়।

সমস্ত শব্দ—হরি। হরি ব্যতীত অন্য কোন শব্দ নাই। 'হরি' শব্দে হরণ করা ধর্ম্ম আছে। যে হরি শব্দে হরণ ধর্ম্ম নাই, তা' হরি নহে। যেমন আভিধানিক অর্থবাচক ঘোড়া ইত্যাদি শব্দ। অনেকে রূপক, ঐতিহাসিক, আধ্যাত্মিক ইত্যাদি অর্থ বুঝ্‌তে চায়। 'হরি' যেটুকুমাত্র পাত্রত্ব নহেন। হরিতে যুগপৎ ব্যক্তিত্ব ও অ-ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য আছে। তথাকথিত যুক্তিমার্গ-বিচার-দ্বারা নানারকমের সে-সমুদয় শব্দ উপস্থিত হ'য়েছে, 'হরি' শব্দে সে-সমুদয় শব্দ অপেক্ষা বিশেষত্ব আছে। সেই হরিশব্দ যখন কাণে প্রবেশ করেন তা'র এতটা শক্তি আছে যে, তখন তা' অন্য সকল প্রকার অভিজ্ঞান দূর করে দেন। শব্দ যখন পূর্ণতাকে উদ্দেশ করে, তখন ক্ষুদ্রত্বকে বুঝায় না—এরূপ নহে। 'ব্রহ্ম' শব্দ ক্ষুদ্রত্বকে রক্ষা করে না। অতি বৃহত্ত্বকে মাত্র লক্ষ্য করে। শব্দ যখন কেবল অতি বৃহত্ত্বকে লক্ষ্য করে, তখন মানুষের ইন্দ্রিয়

নিষ্ক্রিয় (benumbed) হ'য়ে যায়। ঐ শব্দটা এতটা অধিক শক্তি দেখায় যে, মানুষের সব অভিজ্ঞতা নিস্তব্ধ ক'রে দেয়। ইহা শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তির পূর্ণ পরিচয় নহে। আবৃতবিশেষ-পরিচয় পূর্ণতাকে লক্ষ্য করে না। অন্য বস্তু হ'তে পৃথক্ ক'রে ৪ চার বলা হ'ল—১, ২, ৩ এবং ৫, ৭ ইত্যাদিকে বাদ দেওয়া হ'ল। শব্দের স্থিতি-স্থাপকতামাত্র লক্ষ্য করা হচ্ছে, যেখানে-সেখানে 'বৈকুণ্ঠ' শব্দ হ'ল না—হরিজ্ঞাপক হ'ল না। আমরা মেপে নেওয়ার মধ্যে প'ড়ে গেলাম।

হরিই—নাম। কর্ম্মধারয় সমাস "হরিশ্চেতি নামচাসৌ"। হে হরিনাম! তোমাকে আমি সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় কর্‌লাম—অন্য সব ছাড়্‌লাম। 'হরি' শব্দকে আশ্রয় কর্‌লাম। মুক্তকুল—যাঁরা মুক্তিলাভ ক'রেছেন, তাঁরা উপাসনা কর্‌ছেন—ইহ জগতে যাঁ'দের আর কোন কৃত্য নাই, তাঁহারা শ্রীহরিনাম করেন। 'হরিনাম' অচেতন কিম্বা কল্পিত পদার্থ ন'ন—দৃশ্যপদার্থবিশেষ ন'ন—দৃশ্য-জগতের কোন বস্তু ন'ন। আমরা হরিনামকে সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় কর্‌ব, আর কারো কাছে যা'ব না। বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় কর্‌ব। তোমাকেই—হরিশব্দকেই আশ্রয় কর্‌ব। নাম-নামীর মধ্যে প্রভেদ নাই; নামই—নামী—সেই জিনিষটিই। সেই তোমাকেই আশ্রয় কর্‌লাম।

যে-সমুদয় বৈকুণ্ঠ শব্দ বিদ্বদ্রূঢ়িতে প্রকাশিত হ'য়েছে, হরিনাম তৎসমুদয় শাস্ত্রকে অঙ্গীভূত করেছেন। যদি কোন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বলেন যে, তাঁ'র শাস্ত্র পৃথক্, 'নিখিল'-শব্দ-দ্বারা তা'র সম্ভাবনা নিরস্ত হ'য়েছে। যে-সবশাস্ত্র ইহজগতে

অবতরণ করেছেন যেগুলি আসেন নাই—খণ্ডকালের মধ্যে অবতরণ কর্‌বেন না, যে-সমুদয় শব্দশাস্ত্র হরিনামকে উদ্দেশ করেছেন। তাঁ'দের শীর্ষভাগসমূহের রত্নমালা—'রত্ন' যা' হ'তে আলোক উচ্ছুরিত হচ্ছে—হরিনামের 'নিরাজন'—আরতি কর্‌ছে। শ্রীবিগ্রহকে শীতল জলে ধু'য়ে দেওয়া—স্নান করিয়ে দেওয়া হ'ল—আচমনীয় দেওয়া হ'ল। পা'টা ধু'য়ে দেওয়া হ'ল। ঐ যে ঠাণ্ডা জল্‌টা লাগ্‌ল, উহাতে নাতিশীতোষ্ণ ভাবটা আন্‌বার জন্য অল্প গরম সেক্ দেওয়া হ'ল। এর নাম নীরাজন। 'পা'—হরি নামের পাদপদ্ম। তাঁ'র অন্তপ্রদেশ নিরাজিত হচ্ছে। কোনো কর্দ্দমাদি মলিনতা এসে কলঙ্কিত না কর্‌তে পারে। ধু'য়ে দেওয়া হচ্ছে। এই হরিনামকে আশ্রয় কর্‌তে হবে, ইহা আচার্য্যের উপদেশ।

আর যে হরিনাম নিজের কোন সুবিধা ক'রে দিচ্ছে, সে হরিনাম বদ্ধজীবের একটা জাগতিক চেষ্টা-মাত্র। হয়ত' কেউ বল্লেন,—"আমি বাঙ্গালী, বাংলাদেশের লোক, আমার হরিনাম।" আবার সেইরূপ অপরে বল্‌ছে,—"আমি অন্য দেশবাসী, আমার জন্য অন্য শব্দ।" এইরূপ বিচার অবলম্বন ক'রে জাতিগত, দেশগত ধর্ম্ম-দ্বারা ভিন্ন জাতি, ভিন্ন-দেশের ধর্ম্ম হ'তে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা আমাদের আবশ্যকীয় বিষয় নহে। সে রকম শব্দ প্রেমাভাব উৎপন্ন করে। সেরূপ-ভাবে নামের ভজন হ'তে পারে না। নামভজন ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা হ'তে পারে না। 'মুক্ত জীবের উপাস্য' অর্থে—বদ্ধজীবের ধারণা সুবিস্তার হ'য়ে সেখানে পৌঁছুক, এরূপ কথা বলা

হচ্ছে। বৈকুণ্ঠ নামে রুচি হোক্। অবৈকুণ্ঠ নামে রুচি হোক্, একথা বলা হচ্ছে না। যে হরিকীর্ত্তন-দ্বারা কলেরা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি ভাল হ'বে, সে হরিনাম কর্‌তে হ'বে না। হরিনামের দ্বারা কলেরা ভাল কর্‌তে গেলে, হরিকে চাকর ক'রে ফেলা হয়—সে কথা আছে—ভিন্ন ভিন্ন অপেক্ষাযুক্ত অবস্থায় আছে—থাকুক্। তদপেক্ষা উচ্চ কথাটা শোনা যাক্। সত্য কথা অন্য কিছুর অপেক্ষা করে না, যা শুন্‌লে লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষেপে যা'বে। বৈকুণ্ঠে একটা সিংহ একটা মানুষকে খেয়ে ফেল্‌লে। মায়িক জগতে ইহা প্রবল দুর্দ্দৈব; কিন্তু বৈকুণ্ঠে সেরূপ অসুবিধা হয় না। এ জগতে কর্ম্মফলে একজনের প্রার্থনা এক প্রকার, আর এক জনের প্রার্থনা অন্য প্রকার হ'য়ে পড়ে; কিন্তু নিত্যজগতে সেবাই নিত্যকর্ম্ম। স্বল্পদৃষ্টি হ'তে ফলটা সঙ্গে সঙ্গে পা'বে, এরূপ ইচ্ছা ভোগপর কর্ম্মবাদীর। তাই ব'লে 'বৈকুণ্ঠ' শব্দের সত্যকথাটা উড়িয়ে দেবো—এরূপ বিচার সঙ্গত নহে। এই দেহটা কতদিন থাক্‌বে? দেহে ফল পাবে মনে কর্‌তে পারা যায়। কিন্তু উহা অবিবেচনা, সুশিক্ষার অভাব, বিচার কর্‌তে হ'বে। এইগুলো নিয়ে যদি থাকা যায়, তা'হ'লে যা'দের এসব অভাব থেমে গেছে, তাঁ'দের কথা শোনা হয় না। তাঁ'দের কথাটা শুন্‌তে হ'বে। নিজের সুবিধা ব'লে যে জিনিষটা, তা' এ সব কথা নয়। নিজে যখন বুঝা যাইবে তখন যা' সঙ্গত তাহাই করিতে হইবে। শ্রবণ ক'রে যতদিন না নিত্য-সত্যে রুচি হয়, ততদিন বৈকুণ্ঠনাম শ্রবণ কর্‌তে হ'বে।

বদ্ধাবস্থায় বুঝা যাইবে না। নেশার বশে থাক্‌লে রুচি হ'বে না। অনর্থযুক্ত অবস্থায় উন্মাদের বিচার বাঞ্ছনীয় নহে। সে বিচার কতক্ষণ স্থায়িত্ব হ'বে? তা ছাড়া বাদবাকী বিচার ও খানিকক্ষণ পরে আপনিই ছেড়ে দিতে হ'বে। অপরিবর্ত্তনীয় ব্যাপারের সঙ্গে পরিবর্ত্তনীয় ব্যাপার এক করিতে হইবে না। তা' কর্‌লে বুঝ্‌তে হ'বে যে, চৈতন্যচরিতামৃতের 'অ' আ'র মধ্যে প্রবেশ হয় নাই। এ ভাষা ত' এখনও এদেশে আসে নাই। কিন্তু এই কথাটাই সত্য। যখন Realise কর্‌তে পার্‌বেন তখন বুঝ্‌তে পার্‌বেন—জন্ম-জন্মান্তরে বুঝ্‌বেন। ভগবান্ কেবলই বঞ্চিত ক'রে রাখ্‌বেন, এরূপ নয়। গাছের ফল নয় যে, আস্‌লেন আর পেড়ে নিয়ে গেলেন; জন্ম-জন্মান্তরের কত সংস্কার, কত কথা সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছেন। সে-সব না কেটে গেলে শুন্‌তে পাবেন কেমন ক'রে? মহাপ্রভু যা'কে-তা'কে দিলেন। যদি মনে করেন, যা'কে-তা'কে দিয়ে গেছেন, আমি তা'র থেকে একটু ভাল, তা' হ'লে পাবেন না। মহাপ্রভু যাঁ'কে দিলেন, তাঁ'কে উহা গ্রহণের জন্য আগে শক্তিসঞ্চার কর্‌লেন। মহাপ্রভু যখন যা'কে দয়া করেন, তখন সে দয়াটা এসে পড়্‌লে সুবিধা হয়। কিন্তু দয়ার প্রয়োজন নাই—এরূপ যতক্ষণ মনে থাকে, ততক্ষণ দয়াটা এসে পড়্‌লেও ধর্‌তে পারা যায় না। বি, এ, ক্লাসের পাঠ্য পাঠশালার ছাত্রকে কখনই বুঝিয়ে দেওয়া যায় না।

স্ফোটের স্বরূপ ও চেতন-ধর্ম্মের পূর্ণ অভিব্যক্তি—স্ফোট স্ফুটিত হইয়া যখন নামরূপে গুরুমুখ হইতে

অনুগত শিষ্যের চিৎকর্ণে ভগবৎকীর্ত্তন-রূপে প্রবিষ্ট হইবে তখন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, মন, বাক্, পাণি প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়গুলিই সংশোধিত, সংযমিত ও সৎপথে চালিত হইবে। চেতনময় কীর্ত্তন কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে বহির্দ্দর্শন ও জড়হস্তের স্পর্শ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া পূর্ণবস্তুর দর্শনলাভ হইবে। ভগবদ্বস্তুর দর্শন, আরাধনা প্রয়োজনীয়। কিন্তু বর্ত্তমানে ভগবদ্বস্তুর দর্শন হইতেছে না। বহির্জ্জগতের দর্শন 'ভগবদ্দর্শন' নয়। ভগবান্ প্রকাশিত হইলে প্রকাশ-বাধ ইন্দ্রিয়সকল আর বাধা প্রদান করিতে পারে না। সেই বাধা একমাত্র শ্রবণের দ্বারাই স্ফোটের স্ফুরণ শক্তির প্রবেশে অপসারিত হইতে পারে। শ্রবণফলে জীব ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ ও ভগবৎকৃপালাভের অধিকারী হয়,—স্ফোটের মহা-আকর্ষণী শক্তিপ্রভাবে। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" এজন্য শ্রীগৌরসুন্দর জড়জগতে জীবের বর্ত্তমান অনুভূতিতে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্তরে অবস্থানের উপদেশ দিয়েছেন এবং অভাব, অসুবিধা, বিপত্তিতে সর্ব্বতোভাবে সহিষ্ণুতার আবশ্যকতা জানিয়েছেন। বাহিরের উপদেশ ব্যতীত অন্তরের সংযম-জন্য—'অমানী ও মানদ' হইয়া অনুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিবারই আদেশ দিয়াছেন। হরিকীর্ত্তন ও বিশ্বের কথা কীর্ত্তনের মধ্যে পার্থক্য আছে। বিশ্বকথা-কীর্ত্তন অনিত্য। কিন্তু হরিকীর্ত্তন এবং তাঁহার কীর্ত্তনীয় বস্তু উভয়ই নিত্য। সেই কীর্ত্তনে স্বতঃই ইন্দ্রিয়সমূহ সংযমিত ও নিয়মিত হয়। এই সকল কথা আলোচনার নামই হরিকথা আলোচনা। যাঁহারা এই হরিকথার আলোচনাকে প্রাধান্য ও মুখ্যতার

আসনে স্থান দেন, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ পরমারাধ্য ব্যাপার। এইরূপ বিচার যাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান, তাঁহারাই বরেণ্যে। সেইরকম ভগবদ্ভক্তের পূজার দ্বারাই পূজ্য বস্তুর পূজার পূর্ণতা সাধিত হয়। কেবল ভগবানের পূজায় পূর্ণতা সাধিত হয় না। তাহাতে বাকী থে'কে যায়। ভগবদ্ভক্তের পূজায়ই ভগবানের পূজার পূর্ণতা সাধিত হয়। কারণ স্ফোটের শক্তি জীবের প্রতি তাঁহাদের কৃপায়ই সঞ্চারিত হইলে তবে জীব ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। এবং তাঁহাদের কৃপার প্রকাশই সর্ব্বত্র দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া মনে করেন,—"সকলেই ভগবানের সেবা করিতেছেন, আমিই কেবল ভগবানের সেবা করিলাম না। আমা অপেক্ষা ছোট আর কেহ নাই।

কৃষ্ণকে অনেকে 'ঐতিহাসিক', 'রূপক' প্রভৃতি মনে করেন। কিন্তু কৃষ্ণ ঐতিহ্যসম্পাদিত কোন বস্তু কিংবা কাল্পনিক রূপক পদার্থের সঙ্গে সমতা-প্রদর্শনের জন্য আবির্ভূত হন না। কৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। কৃষ্ণপাদপদ্মে সকল রসেরই কথা পূর্ণভাবে বিরাজিত। অনেক সময় বিশ্ব হইতে গৃহীত বিচারে বাসুদেবকেই পরতত্ত্ব বলিয়া বিচার করা হয়। বাসুদেবের সহিত মহালক্ষ্মীর, সীতা-রাম প্রভৃতির উপাসনার কথাও প্রচারিত আছে। কিন্তু শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা ব্যতীত রসের পরিপূর্ণতা কোথাও পাওয়া যায় না। শান্ত, দাস্য এবং গৌরবসখ্যার্দ্ধের দ্বারা ভগবানের উপাসনা অপেক্ষা যেখানে নিকট-সম্বন্ধে বিশ্রম্ভাবস্থায় ব্রজবালকগণ সর্ব্বারাধ্য বস্তু কৃষ্ণের

স্কন্ধে পদবিক্ষেপ করেন, তালগাছ হইতে তাল সংগ্রহ করেন এবং সেই তালের উচ্ছিষ্টানুচ্ছিষ্ট কৃষ্ণকে প্রীতিভরে প্রদান করেন, সেইরকম প্রীতিময়ী চেষ্টাই অধিকতর সেবাময়ী। কেহ কেহ আরাধ্য বস্তুকে মাতৃপিতৃরূপে বিচার করিয়া থাকেন। কিন্তু মাতাপিতার নিকট আমরা দ্রব্যাদি আকাঙ্ক্ষা করি, আমাদের নিরুপায় অবস্থায় তাঁহারা আমাদের সেবা করিয়া থাকেন, আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের পূজনীয় বলিলেও এবং আমাদিগকে তাঁহাদের সেবক বলিলেও কার্য্যতঃ তাঁহাদিগের দ্বারা আমাদের অধিকতর সেবা করাইয়া থাকি। আমাদের জন্মের পূর্ব্ব হইতে, জন্মের পরে শৈশব, বাল্য, কৈশোর, পৌগণ্ড, যৌবনাদি অবস্থায়ও নানাভাবে পিতামাতার দ্বারাই সেবা করাইয়া থাকি। কিন্তু ভগবানের পুত্রত্ব-বিচারে মাতাপিতা নিত্যকাল ভগবানের বিশ্রম্ভসেবা করিতে পারেন। মাতাপিতা পুত্রের জন্মাবার পূর্ব্ব হইতেই এবং পরমুহূর্ত্ত হইতেই পুত্রের সেবা করিতে পারেন। ভগবানের পিতৃত্ব-বিচারে সেরূপ সৌন্দর্য্য ও রসমাধুর্য্য নাই।

আবার গোপীগণ সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণানুশীলনের যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সকল রসের যুগবৎ পূর্ণাবস্থান প্রকটিত হইয়াছে। যখন বিরহবিধুরা গোপললনাসকল কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা অগাধবোধ যোগিগণের ন্যায় ধ্যান করিয়া কৃষ্ণকে দূর হইতে দর্শন করিতে চান না। দূরের জিনিষকেই লোকে ধ্যান করে। যে জিনিষ একমাত্র

গোপীর নিজস্ব—করায়ত্ত—সহজ—সুলভ, সে জিনিষের ধ্যান তাঁহারা কেন করিবেন? গোপীসকল গৃহ ত্যাগ করিয়া কঠোর বৈরাগ্য তপস্যাদি দ্বারাও তাঁহারা ভজন করিতে চা'ন না। তাঁহারা কৃষ্ণ-গৃহব্রতা। কৃষ্ণকে নিয়ে তাঁহাদের সংসার। তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে কান্ত কৃষ্ণের ভজনা করেন। এই সর্ব্বাঙ্গীন, সার্ব্বকালিক, সর্ব্বরসে কৃষ্ণানুশীলন একমাত্র গোপললনাগণের আরাধনাতেই ব্যক্ত হইয়াছে। বালকৃষ্ণের উপাসনা অপেক্ষা কিশোর-কৃষ্ণের উপাসনা অধিকতর চমৎকারিতাময়ী।

সাধারণ আধ্যক্ষিক নৈতিক বিচারে—জাগতিক প্রত্যক্ষ দর্শনের অনুমানোত্থ জ্ঞানের প্রতিফলনে যে রাধাগোবিন্দের উপাসনা পরম হেয় বলিয়া দৃষ্ট হয়, সেই বিকৃত, প্রতিফলিত হেয় বিচারকে বিনষ্ট করিয়া যে শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনা একমাত্র বাস্তব পরমোপাদেয়ত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনার আলোচনা যাঁহারা করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। তাঁহাদের আরাধনা করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য। তাঁহাদের কৃপায় স্ফোটের যে প্রকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ ও প্রভাব লাভ করা যায় তাহা অন্যত্র কুত্রাপি লভ্য নহে। এই কার্য্যে যাঁহাদের চিত্ত ব্যস্ত হইয়াছিল, তাঁহারা ইহজগতে থাকিলেও আমরা তাঁহাদের সেবা করিব—নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইলেও তাঁহাদেরই সেবা করিব। তাঁহাদের ইহজগতে অবস্থান-কালে অনেক সময় আমরা অপরাধ করিয়া বসি। আমরা তাঁহাদের 'উপদেশক', 'গুরু' প্রভৃতি মনে করিয়া বসি। কিন্তু যে সময়

তাঁহারা আর এ' জগতে আমাদের সেবার জন্য অধিকার পান না, এমন সময় এ জগতে অবস্থানকালেও আমরা তাঁহাদের সেবা করিবার সুযোগ পাই। ভগবান্ যাঁহাকে দয়া করেন, তাঁহাকে নিত্যলীলার সঙ্গে সঙ্গে নিত্য সেবাধিকার দেন। অনেকে মনে করেন, 'রামের গুরু শিব, শিবের গুরু রাম'—এটা একটা বিরুদ্ধ কথা। কিন্তু রাম যদি ভক্তবাৎসল্যহেতু মহাদেবের সেবা করেন—ভগবদ্ভক্তের উপাসনা করেন, তাহাতে শ্রীরামের ভগবত্তা কিছু কমিয়া যায় না। তৃণাদপি সুনীচ, নিজে উত্তম হইয়াও মানহীন এবং মানদ হইলেই হরিকীর্ত্তনের অধিকার লাভ করা যায়।

স্ফোটের বলদেবত্ব—শ্রীবলদেব স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব। পরমেশ্বর বস্তু প্রকাশিত না হইলে তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অখিলরসামৃতসিন্ধু; সেই কৃষ্ণচন্দ্রের স্বয়ং-প্রকাশ-বিগ্রহ অভিন্নবস্তু বলদেব; তিনিও 'ব্রজরাজকুমার' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে-সকল কথা আছে, তাঁহাতেও তাহাই আছে, তবে তাঁহাকে কৃষ্ণ বলা হয় না, 'বলরাম' বলা হয়। নিখিল বিষ্ণুতত্ত্ব যাঁহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন—দেবাসুর যাঁহার উপাসনা করেন, তিনিই স্বয়ং-প্রকাশবস্তু। সুরাসুরগণ স্বয়ং রূপবস্তুর উপাসনা না করিয়া স্বয়ংপ্রকাশবস্তুর উপাসনা করেন, যেহেতু স্ফোটের স্বয়ংরূপত্ব প্রকাশদ্বার ব্যতীত স্ফুরিত হইয়া স্বয়ং নিজের পরিচয় দেন না। সেই স্বয়ংপ্রকাশ দ্বারই বিগ্রহরূপে—শ্রীবলদেব প্রভু।

মানব-জ্ঞানে যাহা জানা যায়, তাহা সঙ্কীর্ণ—বলদেবের বলের কিঞ্চিৎ আভাসময় অংশ মাত্র। বলদেব প্রভু সর্ব্ব-শক্তিমান্—সকল বল যাঁহার পদনখে অবস্থিত—যে সর্ব্বশক্তি-মত্তা হইতে দূরে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ংরূপের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। মর্য্যাদাপথে ভগবান্‌কে জানিবার ইচ্ছা হইলে আমরা বলদেব প্রভুর পাদপদ্ম পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারি, তাঁহার অতিরিক্ত আমরা দর্শন করিতে পারি না। এখানে যাহা অতিদুর্ল্লভ—এখানে যাহা আংশিক, চিজ্জগতে তাহার আকর বস্তু সম্পূর্ণরূপে অবস্থিত। বলদেব প্রভুর বলে আমরা তাহা আলোচনা করিতে সমর্থ হই। আমরা মায়িক জগতের অন্তরালে অবস্থিত—আমাদের কথা খণ্ডিত হইয়া যাইতেছে। যে বল আমাদিগকে অভিভূত করে, আমরা তাহার আনুগত্য স্বীকার করি। আমরা দুর্ব্বল—সামান্য শক্তি লাভের জন্য আমরা কত যত্ন করি শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—'তৃণাদপি সুনীচ' হও, বৃক্ষের ন্যায় সহ্যগুণসম্পন্ন হও, নিজের চেষ্টায় বলবান্ হইবার দুর্বুদ্ধি না করিয়া যিনি বল-প্রদাতা, সেই বলদেব প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ কর। যাঁহার বল, তিনি বলদেব প্রভু; কৃষ্ণচন্দ্র বলদেবের অনুগত জন কর্ত্তৃক সেব্য হইতে ইচ্ছা করেন। বলদেব প্রভুর অনুগ্রহ ব্যতীত কৃষ্ণসেবা পাইবার উপায় নাই। যাঁহারা বলদেব প্রভুর সেবক হইতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে বলবান্ হন। আমরা যদি অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যাই, তাহা হইলে বলদেব প্রভুর সেবা করিবার পরিবর্ত্তে আমরা নিজেদের সেবা প্রার্থী হইয়া যাই। আমরা দুর্ব্বল

জীব—৫০টি গুণ অতি অল্প পরিমাণে আমাদের আছে। ৬০টি গুণ সম্পন্ন বিষ্ণুবস্তুর আনুগত্য ব্যতীত আমরা তত্তদ্‌গুণবিশিষ্ট হইয়া বাস করিব মাত্র; কিন্তু তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে পূর্ণতা লাভ করিব। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যে কোন অবস্থায় থাকি না কেন, তাঁহার আনুগত্য ব্যতীত আমরা বলবিহীন হইয়া থাকিব। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্—যাঁহা হইতে মানব পূর্ণবিচারশক্তি লাভ করিয়া কৃষ্ণদর্শনের সুযোগ প্রাপ্ত হন—যিনি সুরাসুর-বন্দ্য—সকল বেদ যাঁহাকে স্থির নিশ্চয় করিতে পারে না, তিনিই বলদেব। তাঁহারই বাহ্য-অঙ্গ হইতে এই জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। বাহ্য-অঙ্গ—পরিবর্ত্তনশীল। অন্তর অঙ্গ—নিত্য। সন্ধিনী—'সৎ'—বর্ত্তমান। সেই বলদেব প্রভু একমাত্র পালনকারী—সকল মঙ্গলের মূল বিধাতা; তাঁহার মূল বস্তু কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ বলদেব প্রভুর সেব্য। তিনি সখা, ভাই, শয়ন, ব্যজন, আবাহন, গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, ভূষণ, আসন প্রভৃতিরূপে কৃষ্ণের সেবা করেন। বলদেব, বলভদ্র, বলরাম প্রভৃতি শব্দ দ্বারা তাঁহার সকল প্রকারের বলের কথা বলা হইয়াছে। তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে বৈকুণ্ঠ, গোলোক, বৃন্দাবনাদি প্রকাশিত হইয়াছে; তাঁহার বহিরঙ্গা-শক্তি-পরিণাম—এই জড় ব্রহ্মাণ্ড; আর তাঁহার তটস্থাশক্তি-পরিণতি—অনন্ত জীবগণ।

যে প্রভুর কিঞ্চিৎ বল পাইলে এই জীবকুল তাঁহার আনুগত্যে পারমার্থিক বলে বলীয়ান্ হন—কৃষ্ণসেবা লাভ করেন, সেই বলদেব প্রভু—সন্ধিনীশক্তিমদ্‌বিগ্রহ; কৃষ্ণচন্দ্র

—সম্বিদ্‌বিগ্রহ ; তিনি—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, তন্মধ্যে সন্ধিনীশক্তি। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বিচার সুষ্ঠু হওয়ার জন্য মধ্যবর্ত্তী যাহা থাকে তাহা সৎ। সচ্চিদানন্দবস্তু—বলদেবপ্রভু, সচ্চিদানন্দ-বস্তু—কৃষ্ণচন্দ্র ; সচ্চিদানন্দবস্তু—বার্ষভানবী—ইহাঁরা সকলেই সচ্চিদানন্দময়বস্তু। "অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন"। সর্ব্বশক্তিমান্ বলদেব প্রভুতে সকল বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ আছে। চিদ্‌বস্তু যখন সচ্চিদানন্দময় বস্তুর জ্ঞান গ্রহণের জন্য ব্যস্ত থাকেন, তখন বহির্জ্জগতের অন্যান্য কথার সহিত তাঁহার সামঞ্জস্য করা সঙ্গত নয়। এরূপ করিলে আমরা নানারূপ অমঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া যাইব।

আমরা জড়জগতে আছি—তটস্থাশক্তিপরিণত জীবকুল আমরা কৃষ্ণবৈমুখ্য-বশতঃ এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বলের অভাব-হেতু এখানে আমরা প্রত্যেকের দ্বারা আক্রান্ত ; জড়সম্বন্ধ আমাদিগকে নানা ভাবে বিক্ষিপ্ত করিতেছে। বলদেব প্রভুর আনুগত্য ব্যতীত আমাদের গতি নাই। বলদেবপ্রভু চেতনময় বলের প্রদানকারী অচিৎএর নিকট হইতে আমরা যে বল—যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা যিনি ধ্বংস করিতে পারেন, তাঁহার নিকট হইতে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের যে বোধশক্তি, যে বল আছে বিচার করিতেছি, তলবকার উপনিষদে উমা-হৈমবতী-সংবাদে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, পবন, প্রভৃতি দেবগণের সেরূপ বলের নিরর্থকতা ভগবান্ প্রদর্শন করিয়াছেন। এ সমস্তই অচিদ্‌বল মাত্র। বলদেবের বলে বলীয়ান্ না হইলে এসমস্ত বল ব্যর্থ হইয়া যায়—ইন্দ্রাদি দেব-

বৃন্দের সমস্ত বল ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল, বলদেবের বল লাভ না করায়।

আমাদের বর্ত্তমান বল প্রতিমুহূর্ত্তে নষ্ট হইতেছে। বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধানের জন্য বলদেবের আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমার অবাস্তব বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য অপরের নিকট হইতে যে-সমস্ত পরামর্শ প্রাপ্ত হই, তাহার মূল্য অন্ধকপর্দ্দক-মাত্র। যাহা পরিবর্ত্তনশীল, নশ্বর, এরূপ জ্ঞানের প্রতি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আস্থা স্থাপন করেন না। মনোধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে শ্রেষ্ঠত্ব বিচার আমরা করি—অনিমাদি অষ্টসিদ্ধির প্রার্থী হই, তাহা প্রাকৃত বুদ্ধির পরিচয় মাত্র। আমরা যখন বলদেব প্রভুর আনুগত্যে কার্য্য করি, তখন কৃষ্ণসেবা হয়। বলদেবপ্রভুর একমাত্র কৃত্য—কৃষ্ণসেবা। সেব্য-সেবকের পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়—কান্ত-কান্তা, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়—পুত্র-পিতামাতা, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়—বন্ধু, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়—সেব্য-সেবক, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়--নিরপেক্ষ শান্ত। সেবক যখন সেব্যর দিকে অগ্রসর হ'ন, তখন তাঁহাকে বলদেবপ্রভুই সাহায্য করেন। বলদেব প্রভুর বল লাভ না করিলে আধ্যক্ষিকতা প্রবল হইয়া নানারূপ মতবাদ সৃষ্ট হয়। তখন—"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"—তখন আমাদের বিচার-প্রণালী দুষ্ট হইয়া পড়ে—তখন অহংগ্রহোপাসনা-দ্বারা 'আমরাই সেই বস্তু' মনে করি। নিজে অমানী-মানদ হওয়াই

আমাদের স্বাস্থ্য, তাহাতেই আমাদের নাম-ভজনের যোগ্যতা হয়, নতুবা আমাদের যোগ্যতা থাকে না। নামের বদলে শব্দ উচ্চারণ করিয়া আমরা যে অমঙ্গল বরণ করি, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর গয়া হইতে আসিয়া নবদ্বীপের পুরুষোত্তম সঞ্জয়ের বাড়ীতে ছাত্রগণকে ব্রাহ্মী ভাষায় যে ব্যাকরণ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাতে সকল শব্দকেই কৃষ্ণরূপে বর্ণন করিয়াছেন। স্ফোটের বিদ্বদ্রূঢ়ি ও অবিদ্বদ্রূঢ়ি বলিয়া দুইপ্রকার বৃত্তি আছে। বিদ্বদ্রূঢ়িতে যাবতীয় শব্দ কৃষ্ণ-পাদপদ্মকে লক্ষ্য করে; আর অবিদ্বদ্রূঢ়ি দ্বারা ভগবদিতরবস্তু লক্ষিত হয়। কৃষ্ণজ্ঞানের দুর্ভিক্ষে--নানাপ্রকার কাল্পনিক চিন্তাস্রোতে কৃষ্ণবৈমুখ্যধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা বলদেব-প্রভুর কৃপায় পুনরায় কেবলজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে পারি—"কৈবল্যৈক-প্রয়োজনম্" বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি—ভাগবতকে বেদান্তসার বলিয়া জানিতে পারি। সেই বলদেব-প্রভুর সর্ব্বতোভাবে অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। এই বলদাতাপ্রভুর আনুগত্য করা—তাঁহার নিকট হইতে চিদ্বল সঞ্চয় করাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"। সেই বলদেব প্রভুর বল ব্যতীত আমাদের কোন সম্বল নাই।

আমরা ত' অচিদ্বল লাভের জন্য অনেক যত্ন করিলাম, কিন্তু তাহা সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইতেছে; কেন নষ্ট হইয়া যায়, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। বলদেব প্রভু বিরুদ্ধ-

শক্তি হইতে উদ্ধার করেন, যেমন প্রহ্লাদকে করিয়াছিলেন। মনোধর্ম্মের পিপাসা তিনি মুষলের দ্বারা উৎপাটন করেন। তাঁহার কিঞ্চিৎ অনুগ্রহে সমস্ত মঙ্গল হইয়া যায়। তাঁহার আবার আবির্ভাব কিরূপ? নিঃশক্তিক থাকিবার যোগ্যতা তাঁহার আছে, কাল্পনিক নিঃশক্তিক নহে—সর্ব্বশক্তিমত্তা-বিচার দূরে রাখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ লীলাবিশিষ্ট হইয়া থাকেন। যখন সেই বস্তু জ্ঞেয়রূপে প্রকাশিত হন, তখন আমরা ক্রম বুঝিতে পারি—বাসুদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, রামসীতা, রুক্মিণী-দ্বারকেশের সেবার ক্রম। জন্ম-স্থিতি-স্বীকার রামচন্দ্রের সেবা-দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। রুক্মিণীশের সেবা-লাভে—দ্বারকা, মথুরাও গোকুলে সর্ব্বত্রই বলদেব প্রভু আমাদিগকে সাহায্য করেন। তাঁহার কৃপায় মানবোচিত ভাব-সমূহ ঈশ্বরে আরোপ করিয়া কদর্থ করার হাত হইতে আমরা রক্ষা পাই। এরূপ কদর্থ গর্হণযোগ্য। প্রাকৃত সাহজিক-সমাজ এটাকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। চিজ্জগতের বিকৃত প্রতিফলনে এখানকার সমস্ত উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু সেইবস্তু যাঁহার বহিরঙ্গাশক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়া সত্যের প্রতিফলনকে সত্য বলিয়া অনুভূত করাইতেছে, সেই মূল আকর বস্তু আমাদের আলোচ্য হউক, নচেৎ বৌদ্ধবিচার, অর্হৎ-বিচার ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া অষ্টবসুর অন্যতম উপরিচরবসুর বিচার অবলম্বন না করিলে অক্ষজবিচার হইবে। কিন্তু বলদেব প্রভু অধোক্ষজবস্তু। তিনি অন্তর্য্যামিসূত্রে অবিচার ধ্বংস করেন। কৃষ্ণের কথা আলোচনাকালে সব সুবিধা হইবে। তখন কৃষ্ণের প্রকাশ-

বিগ্রহের বিষয় উপলব্ধি হইবে। ক্রম-উপলব্ধি হইয়া উন্নত হইতে পারিব। রাবণের সিঁড়ি বাঁধা ছাড়িয়া দিব। জগতের জ্ঞান হইতে inductive process রূপ কাল্পনিক পথ অবলম্বন করিব না। সূর্য্যের আলোক অক্ষিতে আসিলে তদ্দ্বারা সূর্য্যকে দেখিব। আলোকে সূর্য্য কল্পনা করা apotheosis. আমরা কপটতা করিয়া একটা মানুষকে ভগবান্ সাজাইতে দৌড়াইব না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥" আমার স্বরূপ, আমার রূপ, গুণ ও লীলা যে প্রকার, সেই সকলের তত্ত্ববিজ্ঞান আমার অনুগ্রহে তুমি প্রাপ্ত হও।

ভগবৎকৃপাক্রমে সেই ভগবদ্বস্তু প্রকাশিত হন। অক্ষজ-জ্ঞানে তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না। বলদেব প্রভু ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহাকে জানাইতে পারে না। আমরা নিজ চেষ্টায় সেইবস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে অসমর্থ,—"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্। স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভির্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥" একমাত্র ভক্তিবলেই সর্ব্বসিদ্ধি হইতে পারে।

পরাভক্তি ব্যতীত আমাদের আর উপায় নাই বলদেব প্রভুর অনুগ্রহ ব্যতীত মঙ্গলের পন্থা নাই। আর সমুদয় বিচার অক্ষজ—মানব-জ্ঞান-কল্পিত। 'প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥" নির্ব্বিশেষবাদী মনে করেন,—অক্ষজ জ্ঞানের দ্বারা বর্ত্তমান জড়ীয় অবরতা

অতিক্রম করিয়া চেতনময় জগতে যাইতে পারি এরূপ চিন্তা স্রোতের অকর্ম্মণ্যতা বলদেব প্রভুর কৃপায় বুঝিতে পারা যায়। বলদেব প্রভুর অনুগ্রহ লাভ করিলে চিদ্‌বল ও অচিদ্‌বল যে এক একটি আলাদা জিনিষ, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বদ্ধজীবের হৃদাকাশে—চিদাভাবে—জড়ীয় মনে বস্তুর কোন ক্রিয়াকলাপ নাই। জড়েররূপ—জড়ের চিন্তাস্রোত সেখানে লইয়া যাইতে হইবে না,—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন।" সেই বস্তুটি শ্রীচৈতন্যদেব ব্যতীত অন্য কোন জিনিষ নহে। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তি নিজ নিজ বৃত্তি পরিত্যাগ করিলে ভক্ত হইতে পারে। দুর্ব্বলতা গ্রহণ করিয়া আত্মবঞ্চনা করা আমাদের কর্ত্তব্য নয়। বাস্তব সত্যের অনুগ্রহই আমাদের একমাত্র মৃগ্য। চিদ্‌বলে বলীয়ান্ হওয়া কর্ত্তব্য। দাম্ভিকতা, অহঙ্কার, অচিদ্‌বলে বলীয়ান্ হওয়া আত্মমঙ্গলের পন্থা নহে। শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের এরূপ চিন্তাস্রোতের অকর্ম্মণ্যতা দেখাইবার জন্য বলিলেন,—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা॥ অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

সর্ব্বদা বিষ্ণুরই কীর্ত্তন করিতে হইবে। মায়ার কীর্ত্তন করিতে হইবে না। বৈকুণ্ঠরাজ্যে বাস করিতে হইবে—সর্ব্বক্ষণ মায়ায় বিমোহিত হইলেও আমাদের মায়াতীত রাজ্যে বিচরণ করার বলই বলদেব প্রভুর কৃপায় অর্জ্জন করিতে হইবে। যাঁহাদের চিদ্বল, চিদ্‌বিলাস লাভ হইয়াছে, তাঁহারা বাস্তব সত্যের প্রচারের জন্য যত্ন করেন। এখানকার অনন্ত-

বিগ্রহের বিষয় উপলব্ধি হইবে। ক্রম-উপলব্ধি হইয়া উন্নত হইতে পারিব। রাবণের সিঁড়ি বাঁধা ছাড়িয়া দিব। জগতের জ্ঞান হইতে inductive process রূপ কাল্পনিক পথ অবলম্বন করিব না। সূর্য্যের আলোক অক্ষিতে আসিলে তদ্দ্বারা সূর্য্যকে দেখিব। আলোকে সূর্য্য কল্পনা করা apotheosis. আমরা কপটতা করিয়া একটা মানুষকে ভগবান্ সাজাইতে দৌড়াইব না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥" আমার স্বরূপ, আমার রূপ, গুণ ও লীলা যে প্রকার, সেই সকলের তত্ত্ববিজ্ঞান আমার অনুগ্রহে তুমি প্রাপ্ত হও।

ভগবৎকৃপাক্রমে সেই ভগবদ্বস্তু প্রকাশিত হন। অক্ষজ-জ্ঞানে তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না। বলদেব প্রভু ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহাকে জানাইতে পারে না। আমরা নিজ চেষ্টায় সেইবস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে অসমর্থ,—"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্। স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভিযে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥" একমাত্র ভক্তিবলেই সর্ব্বসিদ্ধি হইতে পারে।

পরাভক্তি ব্যতীত আমাদের আর উপায় নাই বলদেব প্রভুর অনুগ্রহ ব্যতীত মঙ্গলের পন্থা নাই। আর সমুদয় বিচার অক্ষজ—মানব-জ্ঞান-কল্পিত। 'প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥" নির্ব্বিশেষবাদী মনে করেন,—অক্ষজ জ্ঞানের দ্বারা বর্ত্তমান জড়ীয় অবরতা

অতিক্রম করিয়া চেতনময় জগতে যাইতে পারি এরূপ চিন্তা স্রোতের অকর্ম্মণ্যতা বলদেব প্রভুর কৃপায় বুঝিতে পারা যায়। বলদেব প্রভুর অনুগ্রহ লাভ করিলে চিদ্‌বল ও অচিদ্‌বল যে এক একটি আলাদা জিনিষ, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বদ্ধজীবের হৃদাকাশে—চিদাভাবে—জড়ীয় মনে বস্তুর কোন ক্রিয়াকলাপ নাই। জড়েররূপ—জড়ের চিন্তাস্রোত সেখানে লইয়া যাইতে হইবে না,—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন।" সেই বস্তুটি শ্রীচৈতন্যদেব ব্যতীত অন্য কোন জিনিষ নহে। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তি নিজ নিজ বৃত্তি পরিত্যাগ করিলে ভক্ত হইতে পারে। দুর্ব্বলতা গ্রহণ করিয়া আত্মবঞ্চনা করা আমাদের কর্ত্তব্য নয়। বাস্তব সত্যের অনুগ্রহই আমাদের একমাত্র মৃগ্য। চিদ্‌বলে বলীয়ান্ হওয়া কর্ত্তব্য। দাম্ভিকতা, অহঙ্কার, অচিদ্‌বলে বলীয়ান্ হওয়া আত্মমঙ্গলের পন্থা নহে। শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের এরূপ চিন্তাস্রোতের অকর্ম্মণ্যতা দেখাইবার জন্য বলিলেন,—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা॥ অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

সর্ব্বদা বিষ্ণুরই কীর্ত্তন করিতে হইবে। মায়ার কীর্ত্তন করিতে হইবে না। বৈকুণ্ঠরাজ্যে বাস করিতে হইবে—সর্ব্বক্ষণ মায়ায় বিমোহিত হইলেও আমাদের মায়াতীত রাজ্যে বিচরণ করার বলই বলদেব প্রভুর কৃপায় অর্জ্জন করিতে হইবে। যাঁহাদের চিদ্বল, চিদ্‌বিলাস লাভ হইয়াছে, তাঁহারা বাস্তব সত্যের প্রচারের জন্য যত্ন করেন। এখানকার অনন্ত-

কোটী ধন, বিদ্যা, জ্ঞান, সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট হইবার দরকার নাই। যাঁহারা এগুলোকে বহুমানন করিতেছেন, আমরা দূর হইতে তাঁহাদিগকে দণ্ডবৎ করি। তাঁহাদের নিজ-মঙ্গল-লাভের জন্য আদৌ ইচ্ছা নাই। যাঁহারা অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, অসত্যাশ্রয়ী, তাঁদের বিচার-প্রণালী প্রশংসনীয়া নহে। আমরা মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি—জগতের কোটী কোটী লোকের কথা শুনিতেছি; কিন্তু তাঁহারা মরিবে, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইবে। খানিকক্ষণ পরে তাঁহারা আর সাহায্য করিতে পারিবেন না। সুতরাং আমরা ইহাঁদের আনুগত্য করিয়া আর প্রতারিত হইব না। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্—যাঁহার আনুগত্যে আমাদের সর্ব্ব অমঙ্গল দূর হইবে—নিত্যকাল যাঁহার কৃপা আমাদের উপর বর্ষিত হইবে, সেই বলদেব প্রভুর আশ্রয় আমরা গ্রহণ করিব। যদিও বর্ত্তমানে মায়ার অভিভূত হইবার যোগ্যতালাভ করিয়াছি, তথাপি সেই দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে বলদেব প্রভুর কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হই তজ্জন্য বলদেব প্রভুর অনুগতজনের আশীর্বাদই সম্বল। তাহা হইলে স্ফোটের কৃপা লাভ ও স্ফোট বিজ্ঞান লাভে কৃতকৃতার্থ হইতে পারা যাইবে।

স্ফোটের অপ্রাকৃতত্ত্ব :—যাহা প্রপঞ্চাতীত (Beyond Physical), তাহাই অপ্রাকৃত। সেই অপ্রাকৃত বস্তু চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিত্বের সহিত নিত্য বর্ত্তমান। তাহা নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ এবং মুক্ত। প্রাকৃত বিশেষে যে-সকল নাম-রূপ-গুণাদি আছে, তাহাদের নিত্যত্ব নাই, তাহারা অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর, অশুদ্ধ,

খণ্ডিত ও বদ্ধ আপেক্ষিকতাযুক্ত। কিন্তু অপ্রাকৃত নামের উপাসনা নিত্য। তাহা সর্ব্ববিধ মায়িক বন্ধনের হেয়তো হইতে পরিমুক্ত। অপ্রাকৃত শ্রীনাম—পরিপূর্ণ বস্তু। তাঁহাতে সকল শক্তি নিহিত। অর্থাৎ অপ্রাকৃত নামই স্বয়ং নামী, অপ্রাকৃত নামই রূপী, অপ্রাকৃত নামই গুণী, অপ্রাকৃত নামই লীলাময়, অপ্রাকৃত নামই পরিকরবান্। এই চারিপ্রকার বৈশিষ্ট্য অপ্রাকৃত বস্তুতেই নিত্য বর্ত্তমান। অপ্রাকৃত বস্তু যখন কৃপা-পূর্ব্বক শ্রীনামাচার্য্যের শ্রীমুখ হইতে আমাদের সেবোন্মুখ কর্ণে অবতীর্ণ হন, তখনই আমরা স্ফোটাত্মক অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মকে ধারণা করিতে পারি, নতুবা প্রাকৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া অপ্রাকৃতের ধারণা কখনই সম্ভব নহে। প্রত্যেক প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত চিন্ময় নিত্য ইন্দ্রিয়সমূহ আবৃত থাকায় বহির্জগতের আবরণমুক্ত-দর্শনে যে সেবোন্মুখতা আছে, তাহারই ধারণা গৃহীত হয়। শ্রীনামাচার্য্যের কৃপায় শ্রীনামই স্ফুটিত হইয়া আমাদের কর্ণকে নিয়মিত করিয়া আমাদের যাবতীয় প্রাকৃত ভোগানুকূল ভাবগুলিকে নিরাস করিয়া থাকেন।

নির্ব্বিশেষ বাদিগণের অনুমান ও কল্পনাজাত বিচারে ক্লীবত্বই অপ্রাকৃত বা নির্গুণের লক্ষণ। নিত্য পরা শান্তির রাজ্যে সবিশেষত্ব বলিয়া কোন ব্যাপার নাই। সেখানে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের গতি, যাবতীয় নাম-রূপ-গুণ স্তব্ধ হইয়াছে। সেখানে সকলই শূন্য ও নির্ব্বিশেষ। ইহা প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতাকে অপ্রাকৃত জগতে বহন করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হইতে

উদিত। তাহারা প্রপঞ্চের অভিজ্ঞতাকে প্রপঞ্চাতীত রাজ্যে চালনা করিয়াছে। তাহারা এই প্রপঞ্চের নাম-রূপ-গুণ-লীলার হেয়ত্ব ও অনিত্যত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা হইতে অনুমান করিতেছ যে, প্রপঞ্চাতীত রাজ্যেও যদি নাম-রূপ-গুণ-লীলার অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে তাহা প্রাকৃত জগতেরই ন্যায় অনিত্য ও হেয় হইয়া পড়িবে। সুতরাং নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতি প্রপঞ্চেরই ব্যাপার, তাহাদের প্রপঞ্চাতীত অস্তিত্ব নাই। নাম-রূপ-গুণ-লীলার অস্তিত্ব-রাহিত্যই প্রপঞ্চাতীতের লক্ষণ! এইরূপ বিচারে অভিজ্ঞতাবাদোত্থ অনুমান এবং ব্যতিরেক একদেশী বিচারের অবাস্তবতা রহিয়াছে। ইহাতে বাস্তব জগতের যে অবতারের বিচার বা শ্রৌতপন্থা, তাহা সম্পূর্ণরূপে অনাদৃত হইয়াছে। নির্ব্বিশেষবাদীর অনুমান—তেতালার উপরে ব্যাঘ্র নাই! কেননা, যেখানে ব্যাঘ্র, সেখানে মনুষ্যের অবস্থান থাকিতে পারে না। কিন্তু অবতারবাদী তেতালা হইতে নামিয়া আসিয়া বলিতেছেন—তেতালায় ব্যাঘ্র আছে। কিন্তু সেই ব্যাঘ্রের হিংস্র স্বভাব নাই। অবতারবাদীর শ্রৌত উক্তি—তেতালায় যে বাস্তব বিষয় রহিয়াছে, তাহা অভ্রান্ত ও অটুটভাবে জগতে প্রকাশিত করিয়া দিতেছে। বৈষ্ণবগণ—অবতারবাদী, শ্রৌতপন্থী। তাঁহারা আরোহবাদী, তর্কপন্থী নহেন। শ্রীনাম নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারেন। যাহা নিজেই প্রেরণা দিতে পারে, তাহা সর্ব্বতোভাবে নিরপেক্ষ এবং স্বতঃপ্রবৃত্তি-বিশিষ্ট।

জড়ীয়নাম অপ্রাকৃত নামের বিকৃত হেয় প্রতিফলন। অপ্রাকৃতের অবিকৃত অবতার—জড়তা নহে। অপ্রাকৃতের স্বরূপ-প্রতিবন্ধক প্রতিবিম্বিত নামই-প্রাকৃত নাম-সমূহ। আমরা বর্ত্তমানে তৃতীয় মানের রাজ্যে অবস্থিত। তুরীয়মানে আমাদের প্রবেশাধিকার নাই। অপ্রাকৃতের অসম্পূর্ণ-দর্শন মধ্যস্থিত আবরণ হইতেই উৎপত্তি লাভ করে। উহাই প্রাকৃতদর্শন মাত্র। অপ্রাকৃত শুভ্রতার বাধক প্রাকৃত সবুজ আরণকে নিরাকৃত করিয়া স্বয়ংই স্ব-স্বরূপে প্রকাশিত হইতে পারেন, ইহাই অপ্রাকৃতের যোগ্যতা। প্রাকৃতের সেই যোগ্যতা নাই। শ্রৌত-প্রণালী ও সাধারণ্যে প্রচলিত গণগড্ডলিকার মতবাদ তুইটী ভিন্ন বস্তু। শ্রৌতবিষয়-শ্রবণে সহিষ্ণুতা ও শ্রবণোন্মুখতা আবশ্যক। শ্রবণোন্মুখতার অভাবেই জগতে নানা অশ্রৌত মতবাদ প্রবিষ্ট হইয়াছে। নাম-সংকীর্ত্তনই একমাত্র উপায়। এতদ্ব্যতীত অধোক্ষজ রাজ্যে প্রবেশের অন্য কোন উপায় নাই। নাম-সংকীর্ত্তনই একমাত্র লক্ষ্যের একমাত্র উপায়। নাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নাই। আর নাম সংকীর্ত্তনে যে প্রেমালভ্য হয়, তদ্ব্যতীত অন্য কোন পরম লক্ষ্যও নাই। এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—"হরের্নাম-হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" অন্য কোন উপায় নাই, নাই, নাই তিনবার নিষেধ করা হইয়াছে। কিন্তু ভক্তিভরে অবিরাম শুদ্ধ নাম গ্রহণ করিলে যাবতীয় প্রতিবন্ধক বিদূরিত হইবে। জড়মিশ্র অক্ষর বা শব্দ গ্রহণ করিলে নাম গ্রহণ হইল না।

যদি আমরা নামের সহিত ঐতিহাসিক, আধ্যাত্মিক বা রূপক কোনপ্রকার সম্বন্ধ সংযুক্ত করি, তাহা হইলে নামের স্বরূপ বুঝিতে পারিব না। চিত্ত বা মন জড়জগতের মলিনতা ও আবর্জ্জনা হইতে নির্ম্মুক্ত না হইলে কি করিয়া নাম গ্রহণ করা যাইবে? নাম গ্রহণ কোন প্রকার মানসিক বা শারীরিক ক্রিয়া বিশেষ নহে। নাম গ্রহণের জন্য অন্য কোন প্রকার কৃত্রিম উপায়ের আবশ্যকতা নাই। যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা শ্রীনাম-কীর্ত্তনই সাধন করিবেন অর্থাৎ নাম কীর্ত্তনই সকল অপ্রাকৃত অনুভূতি আবাহন করিবেন ও তৎসহ বাহ্য অসম্পূর্ণ ধারণা-মুক্ত করাইবেন।

নবম ক্রম

নামভজনে নামাপরাধ, নামাভাস ও নাম—এই তিন প্রকার বিচার আছে। যখন আমরা আমাদিগকে কর্ম্মী মনে করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কামলাভের জন্য নাম-গ্রহণের ছলনা করি, তখন আমাদের নামাশ্রয়ের পরিবর্ত্তে নামাপরাধই হয় ও জড়বিচারের মঙ্গল লব্ধ হয় মাত্র। যখন আমরা আমাদিগকে মোক্ষকামী মনে করি, তখন নামাভাসের চেষ্টা প্রদর্শিত হইলেও 'নামাভাস' মোক্ষাকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইয়া উদিত হয় না, তৎফলে স্বাভাবিক বদ্ধবিচার ভোগ হইতে মুক্তি হয়। মোক্ষাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া নাম-গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে যখন অনর্থের নিবৃত্তি হয়, তখনই 'নামাভাস' উদিত হইয়া থাকে। নামাপরাধ আমাদিগকে পাপ-পুণ্যের পথে

লইয়া যায়। অধর্ম্ম অনর্থ ও কামের অপূরণ অথবা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই সকল নামাপরাধের ফল। কিন্তু ইহা শুদ্ধ নামোচ্চারণের প্রতিবন্ধক। সুতরাং নামাপরাধ হইতে সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হইবে। পবিত্র, অপবিত্র, পুণ্য, পাপ সমস্তই জড়জগতের পরিভাষা ও বিচার। পবিত্রতা ও পুণ্যবুদ্ধিও অপ্রাকৃত শ্রীনাম-গ্রহণের প্রতিবন্ধক। ধর্ম্ম-কামনা, পুণ্য-কামনা, পবিত্রতাকামনা বা অধর্ম্মকামনা, পাপকামনা ও অপবিত্রকামনা—সমস্তই অনর্থও নামোচ্চারণের প্রতিবন্ধক। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম লাভের জন্য সমাজনীতি পালন করি; বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আমাদিগকে পবিত্রতা ও সাধুতা প্রদান করে। কিন্তু এই সকল বিধি—আত্মধর্ম্ম নহে। ঐরূপ বুদ্ধিতে আবদ্ধ থাকিলে শুদ্ধনামোচ্চারণ হয় না। নামাভাসে আমাদের অনর্থমুক্তি হয়। নামাভাস—নামোদয়ের প্রগাবস্থা, নামসূর্য্যের অরুণোদয়স্বরূপ। নানাভাসের পরে আমরা নামের উদয় লক্ষ্য করি। আমরা এখন নামাপরাধে পতিত। কেননা, আমরা নামের সহিত প্রপঞ্চের সম্বন্ধ-সমূহ সংযোজিত করিবার চেষ্টা করিতেছি, আমরা ফলাকাঙ্ক্ষী। যখন আমরা নামের নিকট ধর্ম্ম-অর্থ-কামের প্রার্থী হই, তখন নামাপরাধ উদিত হয়। যখন আমরা কোন প্রকার ইন্দ্রিয়পরায়ণতার ভূমিকায় দণ্ডায়মান হইয়া নামগ্রহণের চেষ্টা দেখাই, তখন তাহা নামাপরাধ হয়। নামোচ্চারণ- প্রণালীকে একমাত্র প্রণালী বিচার করিয়া না করিয়া বহুবিধ প্রণালীর অন্যতম মনে করা—'নামাপরাধ'। নাম-গ্রহণ প্রণালীতে লোককে আকর্ষণ করিবার জন্য ঐরূপ

নামের অর্থবাদ কল্পিত হইয়াছে, এইরূপ বিচার—নামাপরাধ। নামাচার্য্য গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, নামকে অনিত্য-জ্ঞান, নাম-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক শাস্ত্রকে অন্যান্য রাজস-তামস শাস্ত্রের সহিত সমজ্ঞান, নামকে ভগবানের স্বরূপ-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট-লীলা হইতে ভিন্ন জ্ঞান, দেহে আত্মবুদ্ধির সহিত-নামোচ্চারণের চেষ্টা প্রদর্শন, নামবলে পাপবুদ্ধি প্রভৃতি—নামাপরাধ।

নামাভাস—বৈকুণ্ঠ-নাম এবং মায়িক নামের মধ্যে তটস্থ জীবের একটি তাটস্থ্য-ভাব আছে। বৈকুণ্ঠ-নামের আভাস—মধ্যবর্ত্তীস্থানে অবস্থিত। একদিকে অপরাধ, অপরদিকে মূর্ত্ত নিরপরাধ, মধ্যবর্ত্তীস্থানে অপরাধ-নির্ম্মুক্তিরূপ নামাভাস অর্থাৎ একদিকে 'নাম,' অপরদিকে নামাপরাধ, মধ্যে নামাভাস। নামের সেবা করিতে গিয়া প্রপঞ্চে বা ইরতব্যোমে নামাপরাধ এবং উহার ও পরব্যোমের মধ্যবর্ত্তীস্থানে নামাভাস এবং বৈকুণ্ঠে নাম অবস্থিত। অনর্থযুক্ত অবস্থায় নামাভাস বা নামের অবস্থিতি নাই। অপরাধমুক্ত অবস্থায় এবং নামভজনে যোগ্যতারাহিত্যরূপ সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে যে নামোচ্চারণ, তাহাই নামাভাস-শব্দে উদ্দিষ্ট হয়. প্রাপঞ্চিক জীবের বদ্ধাবস্থায় নাম-গ্রহণ-যোগ্যতা হয় না; নামাভাস করিবার যোগ্যতায় অপরাধ হয় না। এইজন্যই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন,—বৈকুণ্ঠনাম সর্ব্বাগ্রে উচ্চারিত হইবামাত্রই সকল পাপ বিনিষ্ট হয় এবং সর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়, তাহার-পর নামগ্রহণের প্রেমোদয় হয়। নামোদয়ের পূর্ব্বে নামাভাস

হয় অর্থাৎ নামাভাসের পরে নামোদয় হয় ; তবে যে নামাভাস হইবার পর জাগতিক দর্শনে মুক্তপুরুষের চরিত্রে বদ্ধভাব প্রাপঞ্চিক নয়নে দৃষ্ট হয়, তাহা বাস্তব নহে, উহা ভক্তির পরিপোষক। উহা মুক্তপুরুষের চরিত্রে যখন প্রতিভাত হইতেছে, তখন তাহাকে নামাপরাধের ফল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে না ; কিন্তু তাই বলিয়া যাবতীয় নামাপরাধী তাহাদের প্রথম উচ্চারিত নামকেই 'নামাভাস'-জ্ঞানে আপনাদিগকে "মুক্তবৈষ্ণব অজামিল" মনে করিয়া স্ব-স্ব অপরাধকেই ভক্তির পরিপোষক জ্ঞান করিবেন না, করিলে নামবলে পাপপ্রবৃত্তি-হেতু নিশ্চয়ই নিরয়ে পতিত হইবেন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। তাহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-মহোদয় বলেন,— "যদিও অজামিলের প্রথম নামোচ্চারণে সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তকর, সর্ব্বানর্থনাশক নামাভাস সম্বন্ধে শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বিচার-প্রণালীতে পরিদৃষ্ট হয় এবং কাল-প্রভাবে বীজ হইতে বৃক্ষের ফলধারণকাল পর্য্যন্ত যে ব্যবধান, তাহা অনন্ত-কালবিচারে নিতান্ত স্বল্প, তথাপি নামাভাসের অব্যবহিত পরেই নামসেবা আরম্ভ না হইয়া আর কিছু সংসাধিত হইলেই তাহাকে ভক্তিপরিপোষক বলিয়া স্বীকার করা হইবে না। সকলেই 'অজামিল' নহেন এবং বহির্দৃষ্টিতে অজামিলের কদর্য্যা-নুষ্ঠান অমুক্ত পুরুষের সমদর্শনে দৃষ্ট হইলে শুদ্ধ নামোচ্চারণে বিলম্ব হইয়া যাইবে, সুতরাং প্রথম নামোচ্চারণ তাঁহার

নামাভাস হইলেও নামোচ্চারণের পূর্ব্ববর্ত্তী নামই ভগবৎ-সেবার স্মৃতি বা অনুভব উৎপাদন করিবে। যদিও অজামিলের আদি-নামোচ্চারণরূপ নামাভাসফলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া জীবগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য বিষ্ণুদূতগণকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং অজামিলের দ্বারা ভগবৎপ্রেরণাক্রমে নানাবিধ পাপাচার নামভজনের অন্তরায়রূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল, তথাপি অজামিল ব্যতীত অন্যান্য পরবর্ত্তী সাধকের সেই বিচার-ছলে আপনাদের সহিত অজামিলের মমতা-প্রয়াস এবং আপনাদিগের পাপাচারগুলিকে অপরাধোত্থ না জানিয়া ভক্তিপরিপোষকরূপে উপলব্ধি-হেতু অমঙ্গলপ্রসূ না হয়, তজ্জন্য প্রথম নামোচ্চারণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমোদয়-কালের পূর্ব্বপর্য্যন্ত যে' শেষ-নামোচ্চারণকেই 'নামাভাস' সংজ্ঞা দিলে প্রাকৃত সহজিয়াকুলের –সহজবিচারবিষয়ে অসুবিধা হয় না। নামপরাধে ত্রৈবর্গিক ফল-লাভ ঘটে, নামাভাসে মোক্ষ-লাভ ঘটে এবং নামভজনে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" বা "অনুগ্রহায় ভক্তানাং" প্রভৃতি শ্লোকে 'ভক্ত' শব্দের প্রয়োগে বা "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকে 'অনন্যভাক্' শব্দের প্রয়োগে সেবা-বৈমুখ্যকেই ভক্তিরস-জ্ঞানরূপ ভ্রান্তি হইতে রক্ষা পাইতে হইলে জানা উচিত—'অনন্যভক্ত' শব্দের অর্থচতুর্ব্বর্গানুসন্ধান-প্রিয়তায় আবদ্ধ নহে, পরন্তু তাদৃশ চতুর্ব্বর্গানুসন্ধান হইতে ব্যতিরেকভাবে জীবকুলকে নিষেধ করিবার উদ্দেশ্যেই ভগবদি-চ্ছাক্রমে বিহিত। যদি কেহ স্বীয় অনর্থযুক্ত অবস্থায় আপনাকে

শুদ্ধভক্ত বলিয়া অভিমান করেন, তাহা হইলে তাহার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।" শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের মতে, অজামিলের প্রথম নামোচ্চারণের পরে তাঁহার যে-সকল দুষ্ক্রিয়ার উল্লেখ আছে, ইন্দ্রিয়তর্পণপর সেইগুলি আদরের সহিত গ্রহণীয় বা-অনুকরণীয় নহে; পরন্তু ব্যতিরেক-বিচারে তাহাই তাহাদের পরিহার করা কর্ত্তব্য। মুক্তপুরুষের ঐগুলি 'দোষের বিষয়' না হইলেও অমুক্তব্যক্তির পক্ষে উহা কখনই 'আদর্শ' হইতে পারে না। অর্থাৎ নামাপরাধ, নামভাস ও পরে শুদ্ধ নাম—এক-শ্রেণীর মহাজনের কথা, আবার অপরশ্রেণীর মহাজনের কথা,—প্রথমেই মুক্ত-পর্য্যায়ে নামাভাস ও মুক্তি, তারপর নাম বা শুদ্ধ-সেবা; উভয়ে সমতাৎপর্য্য বিশিষ্ট হইলেও শেষোক্তমতের 'তাৎপর্য্য এই যে,—সর্ব্বাগ্রে নামাভাস পরে ভোগময়-ধর্ম্মবর্জ্জিত ভগব-দিচ্ছাক্রমে দুরাচারাদি অপরাধ-প্রতিম অনুষ্ঠানের হেয়ত্বদর্শন পরিহারপূর্ব্বক উহাকেই 'ভক্তিপোষক' বলিয়া জ্ঞান হইলেও উহা ফলোদগমকালাপেক্ষা-মাত্র, তৎফলে ঐ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ-কালে তাদৃশ অবস্থার অনধিষ্ঠানে নাম-ভজনারম্ভ দৃষ্ট হয়। এতদুভয় মতই পরস্পর এক উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপক। অজামিলের নামোচ্চারণকালে অর্থবাদ বা অর্থ-কল্পনারূপ 'সাক্ষাৎ অপরাধ' ছিল না; সুতরাং ঐ অপরাধদ্বয়ে অপরাধী অনভিজ্ঞ স্মার্ত্তকুলের বহুজন্মব্যাপী কোটী কোটী নামোচ্চারণের সহিত অজামিলের নামোচ্চারণ কখনই একপর্য্যায়ে বিচারাধীন হইতে পারে না।

নামাভাসের পরে অমারা অপ্রাকৃত নামের বিচার দেখিতে

নাই। অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম—চিন্তামণি, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য ও মুক্ত বস্তু। অপ্রাকৃত নাম ও নামী অভিন্ন। অপ্রাকৃত নামের দেহ ও অপ্রাকৃত নামের দেহীতে কোন ভেদ নাই। ইহা Subject and Object এর কথা নহে। ইহা প্রকৃত সত্য অধিষ্ঠানের (entity) কথা বাচ্য ও বাচকের কথা। বাচক বস্তু নাম- বাচ্য বস্তু নামী হইতে অভিন্ন। বাচক নামই —বাচ্য নামী। আমাদিগের নিকট বাচ্য হইতেও বাচক-স্বরূপের অধিকতর উপযোগিতা। কিন্তু বাচকের নিকট কোন প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকামনা আমাদিগকে বাচকের স্বরূপবিজ্ঞান হইতে দূরে নিক্ষেপ করে। ভুক্তিকামনা ও মুক্তিকামনা—ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথা। আমার মুক্তিকে আমার স্বার্থপরতা থাকিতে পারে, আপনার তাহাতে কি স্বার্থ আছে? যেখানে কৃষ্ণের পরিপূর্ণ সুখের অনুসন্ধান হয়, কৃষ্ণের কাম-চরিতার্থ হয়, সেখানে শুদ্ধ নামের উদয়। সেরূপ নামের উদয়ে আনুষঙ্গিক-ভাবে আমার যাবতীয় প্রকৃত স্বার্থপরতা এবং অন্যান্য জীবেরও শুদ্ধ স্বার্থপরতার যুগপৎ সিদ্ধি হয়। কৃষ্ণের কামের চরিতার্থতা যেখানে নাই, তাহা অভক্তি; নামাশ্রিত ব্যক্তিগণ সেরূপ অভক্তির জন্য লালায়িত নহেন। ভক্তি আমাদের আত্মার নিত্যা বৃত্তি। আমাদের স্বরূপ নির্ণয় আমাদিগকে ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন ইতর সাধন বা সাধ্যে উপনীত করে না। আমি কার্ষ্ণ—আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস, আমি আমাকে ব্রাহ্মণকুলজাত; ক্ষত্রিয়কুলজাত, বৈশ্যকুলসম্ভূত বা শূদ্র, অন্ত্যজ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম প্রভৃতি কোন

কুলজাত মনে করি না। আমি আমাকে কামস্কাট্‌কা, আমেরিকা, ইউরোপ বা ভারতবর্ষের অধিবাসীও মনে করি না। আমি আমাকে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ—কোন আশ্রমীও জ্ঞান করি না। এগুলি সকলই সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা মাত্র। আমি—আত্মা, চেতন; আমি বিভুচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস। পূর্ব্বোক্ত পরিচয়গুলি মায়িক পরিচয় মাত্র। মায়িক পরিচয় আমার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিলে আমার মুখে শ্রীনাম প্রকাশিত হইতে পারেন না। কোন প্রকার জড়ীয় অনুষঙ্গ যেন আমাদিগকে অপ্রাকৃত অভিসারে বাধা প্রদান না করে। আমরা যেন জড়-সম্বন্ধের যূপকাষ্ঠে মস্তক প্রদান না করি। স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা নামের উচ্চারণ হয় না; কিন্তু কেবল চেতন আত্মার সেই চেষ্টার উদয়েই অর্থাৎ ভগবৎসেবার উন্মেষণ হইতে মনের দ্বারা চালিত হইয়া বহির্জগতে নাম-সেবা সম্ভবপর হয়। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥" শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতি প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণ-রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বা মনের দ্বারা গ্রাহ্য নহেন। জীব যখন সেবোন্মুখ হন, তখন সেই সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ংপ্রকাশ নাম স্ফূর্ত্তি লাভ করেন। বর্ত্তমানে আমাদের আত্মা নিদ্রিত, আত্মার প্রতিভূ বা কর্ম্মাধ্যক্ষ মন সুপ্ত-প্রভুকে প্রতিমুহূর্ত্তেই বঞ্চনা করিতে চাহিতেছে। সুতরাং মন যাহা কিছু করিবে, তাহা আত্মার স্বার্থে নহে, —নিজের অপস্বার্থে। মন যদি নাম-গ্রহণের ছলনা দেখায়, কিম্বা মনের আজ্ঞাবাহক স্থূলকার্য্যসাধক শরীর যদি নামোচ্চারণের

ব্যায়াম প্রদর্শন করে, তাহা হইলে উহা তাহাদের কোনও না কোন অভিসন্ধিমূলক ইন্দ্রিয়তর্পণমাত্র হইবে। আত্মা তাহার কোন ফল লাভ করিবে না। কিন্তু যখন শ্রীনামাচার্য্য শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আত্মার উন্মুখতাবৃত্তি উদিত হয়, তখন আত্মাকে জাগরিত দেখিয়া আত্মার প্রতিভূ ও কর্ম্মকর্ত্তা মন এবং স্থূল দেহ—তাহাদের দুষ্ট অভিসন্ধি ও বিমুখতা সংরক্ষণ করিতে পারে না। তাহারাও পরমাত্মার সেবোন্মুখ আত্মার আনুগত্যে যে-সকল কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা আত্মা বা পরমাত্মারই নিজ-সুখ-সাধক হইয়া থাকে। শ্রীনামাচার্য্য শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে এই সকল কথা জানাইয়াছেন। আমরা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীনামাচার্য্যের উপদেশ গ্রহণ করিলেই মঙ্গললাভ করিতে পারি। যিনি অনুক্ষণ শতকরা শত পরিমাণ কৃষ্ণসেবায়—কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্যে নিখিল চেষ্টা নিয়োগ করিয়াছেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। উৎকৃষ্ট জাগতিক আভিজাত্য, পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্য্য, কিম্বা ঐশ্বর্য্য—শ্রীগুরুদেবের গুরুত্বের লক্ষণ নহে। অবৈষ্ণব কখনই 'গুরু' হইতে পারে না। 'বৈষ্ণব' বলিতে যিনি শতকরা শত পরিমাণ বিষ্ণুর সেবা করেন। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বিষ্ণুমায়া হইতে প্রসূত। এই অচিৎসর্গের কোন বস্তু, ব্যাপার বা চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্য যাঁহাকে বিষ্ণুর পরিপূর্ণ সেবা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না, তিনিই বৈষ্ণব বা গুরুদেব। বিষ্ণু অধোক্ষজ বস্তু। যদি কেহ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানজাত বস্তুকে বিষ্ণু মনে করিয়া তাহার সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'বৈষ্ণব' বা 'গুরু' বলা যাইতে পরে না। বিষ্ণু কখনও আমাদের

ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের নিকট আত্মসমর্পণ করে না। যদি তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের নিকট কখনও আত্মসমর্পণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই প্রপঞ্চের অন্যতম বস্তু জ্ঞানে আমরা তাদৃশ প্রভুরই প্রভু বলিয়া নিজত্বের বিচার করিতাম। বিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তি স্বয়ং বিষ্ণুর স্বরূপ হইতে অভিন্ন। অর্চ্চাবতারকে 'কাঠ', 'পাথর' ইত্যাদি মনে করা, কিম্বা কোন কুম্ভকার, সূত্রধর, ভাস্কর প্রভৃতির সৃষ্টবস্তু ধারণা করা—বিষ্ণুমায়ার দর্শনে ভোগীর ভোগ-পিপাসা-মাত্র। যাঁহারা বিষ্ণুমায়ার কুদর্শনের কবল হইতে উদ্ধৃত হইয়া সুদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহারা শ্রীঅর্চ্চাবতারকে—শ্রীনামকে প্রাকৃত বস্তু জ্ঞান করেন না। তাঁহারা নায়কপূজা বা পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেন না। বিষ্ণুর বহিরঙ্গা মায়ার কবলিত ব্যক্তিবিশেষকে ঈশ্বর বা গুরুরূপে কল্পনা করা বিচারকে ইংরাজী পরিভাষায় Onthropomorphism বলা হয়। আমরা কখনই বিষ্ণুমায়ার কবলে কবলিত জাগতিক ব্যক্তিবিশেষকে গুরু বা ঈশ্বর মনে করিয়া anthropomorphismএর আবাহন করিব না। পরব্যোম বা পরাকাশের বিচার গ্রহণ করিতে গেলে এখানকার অণু-পরমাণুসমূহ আমাদিগের অপ্রাকৃত রাজ্যে অভিজ্ঞানের পথে বাধা প্রদান করে। সুতরাং আমরা বস্তুর বাহ্য স্থূল দর্শন ও সূক্ষ্ম দর্শন উভয়কেই নিরাকৃত করিয়া আত্ম-দর্শনের রাজ্যে অগ্রসর হইব। নির্ব্বিশেষবাদীর ত্রিপুটী বিনাশ—জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই ত্রিবিধ ব্যাপারের বিনাশ-চেষ্টা আমাদের বিচার্য্য বিষয় নহে। অপ্রাকৃত জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—এই তিনই নিত্য।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ যে জড়জগতের নশ্বর ভাবোত্থ ত্রিপুটী বিনাশকে তাঁহাদের সিদ্ধি মনে করেন ; ইহা তাঁহাদের জগতের তিক্ত অভিজ্ঞতার ধারণা হইতে গৃহীত। তাঁহারা কল্পিত শান্তির স্বপ্ন দেখিয়া জড়-বৈচিত্র্যের বিপরীত বা প্রতিযোগী অবস্থাকেই শান্তিধাম কল্পনা করেন। জড়জগতে সবিশেষধর্ম্ম অত্যন্ত অশান্তি ও ক্লেশ প্রদান করিতেছে। সুতরাং নির্ব্বিশেষ তার কোন কাল্পনিক ভাব তাহাদিগকে ক্লেশের দাবানল হইতে রক্ষা করিবে—এইরূপ কল্পনায়ই তাহাদের-বিচিত্রতা বিনাশের চেষ্টা বা নির্ব্বিশেষবাদ সৃষ্ট করে। যেমন জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, জাগতিক দুঃখ-কষ্টে অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও জর্জ্জরিত হইলে কেহ কেহ তিক্ত বিচিত্রতার অনুভূতিযুক্ত জীবনকে বিনাশ করিয়া অর্থাৎ আত্মহত্যাদি করিয়া শান্তির আশা করিয়া থাকে। মায়াবাদিগণের বিচারও তাহাই। তাহাদের 'ঘটাকাশ' ও 'পটাকাশে'র বিচার ঐরূপ অজ্ঞতা-বিজৃম্ভিত। ঘটাকাশ বা পটাকাশ কখনই মহাকাশের সহিত একীভূত হইতে পারে না, সমজাতীয়তা লাভ করিয়াও নিজ বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করে ; তবে সেই অপহৃত বৈশিষ্ট্য আমাদের বোধগম্য হয় না। স্থূলতার বিচার তাহা বিশ্লেষণ করিতে না পারিলেও সুসূক্ষ্ম বিচারকগণ তাহা ধরিতে পারেন। অংশ কখনই অংশী বা সমগ্র বস্তু নহে। 'ভূতাকাশ' ও 'মহাকাশের' বাগ্‌বৈখরী আমাদিগের বিমুখ বুদ্ধিমত্তাকে অধিকতর বিপথ-গামী করিয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নাম, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ত্রিপুটী। ত্রিপুটী বিনষ্ট হইলে নামের আর অস্তিত্ব থাকে না—

এই বিচারে শ্রৌত বা অবতার-পথ স্বীকৃত হয় নাই। অনুমান ও শ্রুতির বিকৃত অর্থ হইতে এইরূপ তর্কপথের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা শ্রৌতপথে কেবলমাত্র ব্যতিরেকী বিচারই পাই না, অন্বয় বিচারও প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাই। শ্রীনামের অনুশীলনের মধ্যে আমরা উপাদেয়তা এবং নবনবায়মান চমৎকারিতার অন্বয়মুখী বাস্তব বিচার দেখিতে পাই। ব্রহ্মের বিচার কেবলমাত্র ব্যতিরেকী বা নেতি-নেতি বিচারের ভাব-বিশেষ। কিন্তু বিষ্ণুর বিচারে অন্বয়-ব্যতিরেক-মুখে বেদ্য-বাস্তব বস্তুর বিচিত্রতা ও চমৎকারিতার অনুসন্ধান নিহিত।

নাম-সংকীর্ত্তনই সাধন এবং সাধ্য, উপায় এবং উপেয়। যাঁহারা নামসাধন ব্যতীত ইতরসাধন-প্রণালী গ্রহণ করেন, তাঁহাদের উপেয় হইতে উপায় পৃথক্। নির্ব্বিশেষ অনুভূতি বা আত্মহত্যাই উপেয় এবং অন্যান্য যে-কোন ইন্দ্রিয়তর্পণপর কল্পিত মত বা পথ তাহাদের উপায়। লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার পরের কৃত্য—শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিচারে আড়াই প্রকার রসে বিষ্ণুর সেবা মুক্ত পুরুষগণের কৃত্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। শান্ত, দাস্য এবং গৌরব সখ্যরসে তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করেন। বিশ্রম্ভ সখ্য শ্রীরামানুজাচার্য্যের সখ্যরসের বিচারে স্থান পায় নাই বলিয়া তদীয় সখ্যরস-বিচারকে অর্দ্ধ-বিচার-মাত্র বলা যায়। দিব্যসূরিগণ মুক্ত হইয়াও নিত্যকাল বিষ্ণুর ঐরূপ উপাসনা করিয়া থাকেন। গোলোক-নিম্নার্দ্ধের আড়াই প্রকার রস এবং গোলোক-পরার্দ্ধের পঞ্চরসের পরিপূর্ণতা। নিম্ন হইতে সম্ভ্রম-যুক্ত সেবা ব্যতীত উপরার্দ্ধস্থিত

দিক্‌টা দৃষ্টির বিষয় হয় না। কিন্তু পরার্দ্ধে আরোহণ করিলে বিশ্রম্ভপূর্ণ সেবার দিক্‌টা দর্শনের বিষয় হয়। সখাগণ কিরূপে পরাৎপর ভগবানের স্কন্ধের উপর পদস্থাপন করিয়া উচ্চ তাল-বৃক্ষ হইতে তালফল সংগ্রহ করেন এবং সেই তালফল ক্রমে-ক্রমে নিজেরা আস্বাদন করিতে করিতে সর্ব্বশেষ উচ্ছিষ্ট পরম প্রীতিভরে কৃষ্ণকে প্রদান করিতে পারেন, তাহা সম্ভ্রমযুক্ত সখ্য-রসের রসিকগণের নিকট অপরিজ্ঞাত। বালকৃষ্ণের উপাসনায় মাতা-পিতা—কৃষ্ণকে তাঁহার আবির্ভাবের সূত্র হইতেই পূর্ণ প্রীতি-ভরে সেবা করেন। কিন্তু দাস্য বা সখ্যরসে সেই ভাব পরিদর্শনের যোগ্যতার সম্ভাবনা নাই। সকল ভাবগুলিই প্রেমের বিচিত্রতা হইলেও তটস্থ বিচারে ইহাদেব তারতম্য আছে। আমাদের কোন পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়াছেন,—সংসার-ভয়ে ভীত ব্যক্তিগণ কেহ বেদকে, কেহ ধর্ম্মশাস্ত্রকে কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করেন—করুন। আমি কিন্তু এই বৃন্দাবনে একমাত্র নন্দের ভজনা করি—যিনি স্ফোটের পরিপূর্ণতম বাচ্য ও বাচক শ্রীকৃষ্ণকে বারান্দায় হামাগুড়ি প্রদান করাইতে পারেন। আবার বালকৃষ্ণের উপাসনা অপেক্ষা কিশোর কৃষ্ণের উপাসনায় ব্রজবধূগণের যে প্রীতি-পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়, তাহার কথা সাধারণ ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন না। এজন্য আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য আরও বলিয়াছেন,—"এই কথা কাহাকেই বা বলিতে পারি, আর ইহাতে কাহারই বা প্রত্যয় হইবে যে, কালিন্দী-তটকুঞ্জে গোপবধূ-লম্পট পরব্রহ্ম লীলা করিয়া থাকেন।" এই সকল

কথা সম্ভ্রম-সেবায় আসক্ত বুদ্ধির নিকট রুদ্ধ রহিয়াছে। ভগবান্ একজন, বহু নহেন। কিন্তু তিনি তাঁহার অবিচিন্ত্য শক্তিবলে লীলাবৈচিত্র্য প্রকট করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর স্বয়ং-রূপ অধিষ্ঠানেই কৃষ্ণ।

মুক্তপুরুষগণই অবিমিশ্রা ভক্তি যাজন করিতে পারেন। অমুক্ত ব্যক্তিগণের চেষ্টা অভক্তি বা মিশ্র ব্যাপার। 'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।' মুক্তপুরুষগণও স্বেচ্ছায় শরীর পরিগ্রহ করিয়া ভগবান্‌কে ভজনা করিয়া থাকেন। ভক্তির তিনটী অবস্থা—সাধনাবস্থা, ভাবাবস্থা ও প্রেমাবস্থা। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির নববিধ অঙ্গ প্রথমে সাধনভক্তিতেই ক্রীয়মান হয়। শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে অনর্থসকল যত হ্রাস পাইতে থাকে, ততই শ্রদ্ধাবৃত্তি ক্রমশঃ নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও 'স্থায়ীভাব রতি' নামে পরিচিত হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুশীলনে সেই রতি যত গাঢ় হইতে থাকে, ততই প্রেমাদি নাম ধারণ করে। ক্রমশঃ প্রেম-বৃদ্ধিক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। যেমন ইক্ষুরস যতই গাঢ় হয়, ততই প্রথমে গুড়ত্ব, পরে খণ্ডসারত্ব, শর্করাত্ব, সিতোপলত্ব ও উত্তম সিতাবস্থা লাভ করে। এই স্থায়ীভাবে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—এই চারিটী ভাব মিলিত হইলে রসোদয় হয়। কৃষ্ণভক্তি-ব্যাপারে স্থায়ীভাবে ঐ সকল সামগ্রীযুক্ত কৃষ্ণভক্তিরস হয়। স্থায়ীভাবই রসোদ্দীপন-কার্য্যে মুখ্য আধার। তাহার সহিত বিভাবাদি চারিটী

সামগ্রী সংযুক্ত হয়। বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন পুনরায় দুইপ্রকারে বিভক্ত—বিষয় ও আশ্রয়। কৃষ্ণ-ভক্তিরসে ভক্তই আশ্রয়—কৃষ্ণই বিষয় এবং কৃষ্ণের গুণসমূহই উদ্দীপন। এইভাবে স্ফোট রস প্রকাশ করিয়া ভক্ত-ভগবানের লীলা পুষ্টি করিয়া থাকে।

নির্ব্বিশেষবাদিগণ পরাৎপরতত্ত্বকে ক্লীবত্বে আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চিন্ময় বিলাস-বৈচিত্র্যের অবতারণা ব্যতীত বিচারের সুষ্ঠুতা কেবল ক্লীবধারণা-মাত্রে সাধিত হইতে পারে না। Old Testmentএ Jewদিগের It-Godএর ধারণা, কিম্বা মায়াবাদিদিগের ক্লীবব্রহ্মের ধারণা অথবা ভাণ্ডারকার প্রভৃতির একল বাসুদেবের বিচার—জাগতিক সম্বন্ধ ও অনুমানমূলে কল্পিত অপসাম্প্রদায়িক মতবাদ-মাত্র। ইহাপেক্ষা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে শ্রীরামানুজা-চার্য্যের শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। বিষয়বিগ্রহ নারায়ণ আশ্রয়বিগ্রহ মহালক্ষ্মীর সহিত বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল সম্ভ্রমরসের সেবকগণের দ্বারা সেবিত। মহালক্ষ্মী কখনও জীবকোটির অন্তর্গত নহেন। নির্ব্বিশেষবাদের গন্ধ থাকা পর্য্যন্ত কেহ আস্তিক পদবাচ্য হইতে পারেন না। যাঁহারা বিষ্ণুর নিত্য সবিশেষবিগ্রহত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা কখনও আস্তিক সংজ্ঞায় অভিহিত হইতে পারেন না। বৈকুণ্ঠে শতসহস্র মহালক্ষ্মী ভগবান্ বিষ্ণুর সেবায় নিয়ত রহিয়াছেন। বৈকুণ্ঠধাম—নিত্য, বৈকুণ্ঠের সেবকগণ—নিত্য, বৈকুণ্ঠপতি এবং বৈকুণ্ঠপতির সেবকগণের নাম-রূপ-স্বরূপ-গুণ-

ক্রিয়া—সকলই নিত্য। পরাৎপরতত্ত্ব—নিঃশক্তিক নহেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তিনি চিদচিৎ শক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বর। শ্রীরামানুজাচার্য্যের দর্শনে এইরূপ ভাবেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনে চিৎশক্তিকে আরও সুসূক্ষ্ম বিচারে অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যস্থা তটস্থা শক্তি বলা হইয়াছে। ইহাই এক মাত্র সিদ্ধান্ত। বৈষ্ণবধর্ম্ম 'Cult' শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। তাহা কোন মানব-কল্পিত সাম্প্রদায়িক মতবাদে আবদ্ধ নহে। 'অসাম্প্রদায়িক' বলিতে কুসাম্প্রদায়িকগণ যে অসাম্প্রদায়িকতার ধারণা পোষণ করেন, 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' তাদৃশ অসাম্প্রদায়িক নহে। শ্রৌত আম্নায়-প্রণালীতে বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম্ম সৎসাম্প্রদায়িক।

গীতায় একমাত্র ভগবদ্ভক্তিকেই নিরপেক্ষ উপায় ও উপেয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি উপায়ের নিরপেক্ষতা কীর্ত্তন করেন নাই। বদ্ধদশায় কবলিত ব্যক্তি-গণের কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিবদ্ধ চেষ্টাকে ভক্তির কৈঙ্কর্য্যের উদ্দেশ্যে চালিত করিয়া চরমে নির্ম্মল করিবার জন্যই প্রথম মুখে সেই কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিকে গৌণভাবে স্বীকার করিয়া উহাদিগের ভক্তিসঙ্গ-পক্ষত্বই সর্ব্বথা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভক্তিব্যতীত ঐ সকল চেষ্টার কোন সার্থকতাই নাই। শ্রীগীতা একমাত্র ভগবদ্ভক্তিরই মুখ্যতা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিকেই একমাত্র পরম উপায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভক্তিকে গীতার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় মাত্র বলা হয় নাই—একমাত্র নিরপেক্ষ উপায়

বলা হইয়াছে। গীতা কর্ম্মবাদের নিরাস করিতেছেন,—ন বুদ্ধিভেদং.........তৎকুরুস্ব মদর্পণম্॥ গীঃ ৩।২৬—৩০ ও ৯।২৭। যোগের স্বতন্ত্রতা নিরাস করিয়া বলিতেছেন,—তপস্বিভ্যো.........(৬।৪৬-৪৭), ময্যাসক্তমনাঃ...(৭।১) এবং দৈবী হ্যেষা গুণময়ী...(৭।১৪)। জ্ঞানের স্বতন্ত্রতা নিরাস-পূর্ব্বক বলিতেছেন—১২।৫, ১৪।২৬-২৭ ও ১৮।৫৪ শ্লোকে। ভগবদ্ভক্তির নিরপেক্ষতা, গুহ্যতমতা এবং সর্ব্ব সাধন নিরাস-পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়নীয়তা গীতা-শাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন,— ১৮।৬৪-৬৬ ও ৯।১৪, ১০।৯-১০ শ্লোকে।

কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-ধ্যান-ধারণা-ধৃতি-সংযমাদি অতি আনুষঙ্গিকভাবে নামসংকীর্ত্তনকারী পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই অনুষ্ঠান করিয়াছেন। "যাঁহার জিহ্বাগ্রে নাম অর্থাৎ নামাভাস-মাত্র উদিত হইয়াছে, তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বহু যজ্ঞ, কর্ম্ম, দান, ব্রত, তপস্যা, জ্ঞানাভ্যাস, তীর্থে স্নান, বেদাধ্যয়ন, যোগাভ্যাস, সংযম—সমস্ত বহু বহু সাধনাই সম্পন্ন করিয়াছেন।" "যাঁহার জিহ্বায় নাম উচ্চারিত হয়, তাঁহাকে সাধারণ জাতি-সামান্যে দর্শন করিতে হইবে না। তিনি দৈন্যভরে আপনাকে নীচকুলে আবির্ভূত করাইয়া নীচকুলজাত ব্যক্তিদিগকে হরিনাম-গ্রহণের যোগ্যতার ভরসা প্রদানের জন্য তাঁহার মহাবদান্যতা বিস্তার করিতে পারেন। তিনি যে-কোন কুলে আবির্ভূত হউন না কেন, সকল মহাগুণ তাঁহার করতলগত—তাঁহার সেবার জন্য অপেক্ষাযুক্ত!

অষ্টম ক্রম

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়াছেন যে, যাঁহারা পারমার্থিক জীবনের যোগ্যতার জন্য নিষ্কপটভাবে অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই একমাত্র পরম উপায়। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে পরমার্থ-জীবন-যাপনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ্যতা লাভ হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী এইরূপ,—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্ শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্। আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্॥

ভগবদ্ভক্তির যতপ্রকার অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই একমাত্র প্রধানতম ও পরম প্রয়োজনীয় অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণ-নামের সেবা প্রকৃতপ্রস্তাবে ও সর্ব্বতোভাবে সাধন করিতে হইলে আমাদিগকে শ্রীনামপরায়ণ মহাজনগণের পদাঙ্কানুসরণ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণনামে সকল জিনিষই পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ-নামে সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বশোভা, সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষার পরিস্ফূর্ত্তি এবং সর্ব্বসাধনের চরম-ফল ও সিদ্ধি নিহিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, পরিকর, ধাম, লীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণের নাম সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের নাম-সেবা-দ্বারাই তাঁহার স্বরূপ, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর—সকল বিষয়ই জীবের চেতনের বৃত্তিতে স্ফূটিত হইয়া প্রকাশিত হয়। অপ্রাকৃত শ্রীনামই—নামী, রূপী, গুণী,

লীলাময়রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম শ্রীকৃষ্ণের নাম-সেবার দ্বারাই পরিপূরিত হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের নামে আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াভিনিবেশ, যাবতীয় প্রবৃত্তি, যাবতীয় চিন্তা, যাবতীয় ধারণা—সকলই নিয়মিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের নাম আমাদের জিহ্বাগ্রে উদিত হইলে আমরা নশ্বর জগতের যাবতীয় কৃত্য, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, নশ্বর জগৎ ভোগ করিবার প্রবৃত্তি এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি সমস্তই অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারি। আমরা তখন আমাদের নিখিল চেষ্টাকে শ্রীকৃষ্ণের কাম-সেবায় নিযুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম-শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে জীবন যাপন করিতে পারি।

কৃষ্ণেতর বস্তুর নাম বা জাগতিক আভিধানিক শব্দসমূহ আমাদের সম্মুখে আমাদের নিত্যানন্দ লাভের পথে যে-সকল অর্গল আনিয়া দেয়, শ্রীকৃষ্ণনামেই সেই সকল অর্গলও অনায়াসে তিরোহিত হইয়া যায়। সেই শ্রীকৃষ্ণনাম আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ, নিখিলচেষ্টা, সর্ব্বপ্রকার অভিনিবেশ, অধ্যবসায়—সকলের উপরে বিজয় লাভ করুন। সকল সাধনের শিরোদেশে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন নৃত্য করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-নাম কেবল-মাত্র সাধন-ব্যাপার নহেন, তাহা সাধনের ফল সাধ্যবস্তুও বটে। এজন্য যাহাদের সর্ব্ববিধ জাগতিক তৃষ্ণা সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই সকল মহামুক্ত মহামহিম-গণও একায়ন পদ্ধতিতে এই শ্রীকৃষ্ণনামেরই নিরন্তর উপাসনা করেন। সমস্ত বেদের শিরোভাগ ও সারভাগ যে শ্রুতিসমূহ,

তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রভুর নখশোভাকে নিরন্তর আরতি করিয়া থাকেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু প্রমাণোদ্ধার-মুখে লিখিয়াছেন,—"যেন জন্মশতৈঃ পূর্ব্বং বাসুদেবঃ সমর্চ্চিতঃ। তন্মুখে হরিনামানি সদা তিষ্ঠন্তি ভারত॥" যিনি শত শত পূর্ব্বজন্মে সম্যগ্‌রূপে বাসুদেবের অর্চ্চন করিয়াছেন, বর্ত্তমান জন্মে তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নামসমূহ অনুক্ষণ নৃত্য করিয়া থাকেন। শ্রী-সম্প্রদায় যে অর্চ্চনের কথা পরমাদরের সহিত বরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ বাসুদেবের অর্চ্চন শত শত জন্ম করিবার পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের দাসানুদাসগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণ-নাম-শ্রবণ-পূর্ব্বক তাহা অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিবার রতি লাভ হয়।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু আরও বলিয়াছেন,—"জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারের্বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদিযত্নম্। কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ পরমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥" যে শ্রীকৃষ্ণনামের সেবায় বর্ণাশ্রমাদি নিজ-ধর্ম্মযাজন, ধ্যান, পূজাদির চেষ্টা সহজেই বিরত হইয়া যায়, এইরূপ অপ্রাকৃত আনন্দকন্দস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে-কোনরূপে গৃহীত হইলেই অর্থাৎ নামাভাস-মাত্রেই প্রাণিগণের মুক্তিদান করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-নামই একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ, ইহাই জীবের জীবন—চেতনের পরম ভূষণ।

শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুও বলিয়াছেন,—"যদ্‌ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কৃতিনিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ। অপৈতি নাম-

স্ফুরণেন তত্তে প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥” ‘অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মধ্যানের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ-ব্যতীত বিনষ্ট হয় না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-নামের আভাস-মাত্রেই সেই সকল প্রারব্ধ কর্ম্ম অনায়াসে নির্ম্মূল হইয়া যায়। ইহাই বেদ পুনঃ পুনঃ তার-স্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন।’ অতএব শ্রীকৃষ্ণের নামই পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-নামের এমনই স্বভাব যে, উহা একবার কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে তিনি জীবের জিহ্বাকে দ্বার করিয়া স্বয়ং আপনাকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করাইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-নামের আবৃত্তিতে আমরা সাতপ্রকার ফল পাইয়া থাকি।

চিত্তদর্পণ মার্জ্জন ঃ—আমাদের চিত্ত মুকুরের ন্যায় স্বচ্ছ ও বস্তু-প্রতিফলনের যোগ্যতাবিশিষ্ট হইলেও তাহা বর্ত্তমানে জাগতিক অসংখ্য আগন্তুক ধূলিকণার দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। আমরা আমাদের চিত্তদর্পণে অবিকৃত নিত্যবস্তুর দর্শন পাইতেছি না। আমাদের চিত্ত সর্ব্বতোভাবে মার্জ্জিত করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই মার্জ্জন-কার্য্যে কেহ কেহ অষ্টাঙ্গ-যোগাদির প্রণালী অবলম্বন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন, কেহ বা প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্ম-প্রণালীর ব্যবস্থা দিয়াছেন, কেহ বা নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত-তপস্যাদির, কেহ বা জ্ঞান-চর্চ্চাদির দ্বারা চিত্তের ধূলিরাশি বিদূরিত করিবার উপায়-সমূহ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা সহিষ্ণু ও নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিতে পারেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, ঐ সকল প্রণালিগুলি—সকলই কৃত্রিমতা ও অসম্পূর্ণতা-দোষে দুষ্ট।

চেতনের দর্পণকে নীরজীকৃত করিবার বা চেতন পর্য্যন্ত
পৌঁছিবার সামর্থ্য ঐ সকল কৃত্রিম সাধন-প্রণালীর কোনটীরই
নাই। প্রাণায়ামাদির দ্বারা চিত্তকে নির্ম্মল করিবার প্রণালীতে
চিত্ত বিষয়-মলশূন্য হয় না; কেবল সাময়িক শুদ্ধভাব প্রকাশিত
হয় মাত্র। সুতরাং ঐরূপ চিত্ত বহুক্লেশ, কৃচ্ছ্রতা প্রভৃতির
দ্বারা সাময়িক শুদ্ধভাব অবলম্বন করা সত্ত্বেও পুনরায় কোন
কারণে ঈষৎ বিক্ষুব্ধ হইলেই যাবতীয় রোগ আরও দ্বিগুণতর
বেগে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ করে। ঐ সকল উপায় কেবল বৃথা
কালক্ষেপন করিবার হেতু মাত্র। উহার দ্বারা কখনও চিত্তের
মল তিরোহিত হইতে পারে না। এই কথা শ্রীমদ্ভাগবত
অসংখ্য স্থানে অসংখ্যভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—"যমাদি-
ভির্যোগপথৈঃ—(ভাঃ ১।৬।৩৬) "যুঞ্জানানামভক্তানাং" (ভাঃ
১০।৫১।৬০)। অন্তরায়ান্ (ভাঃ ১১।১৫।৩৩)। "জ্ঞানে প্রয়াস-
মুদপাস্য" (ভাঃ১০।১৪।৩)। "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ" (ভাঃ ১।২।৩২)
ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণনামের আভাসেই অনায়াসে চিত্তদর্পণের যাবতীয়
মলিনতা বিনষ্ট হয়। যে-সকল আগন্তুক আবরণ আমাদিগের
স্বরূপের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা নিরাকরণে একমাত্র
শ্রীকৃষ্ণ-নামের আভাসই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন। স্বরূপ-নির্ণয়ের প্রশ্ন
ধর্ম্মজগতে একটি সমস্যাপূর্ণ প্রশ্নরূপে গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সমস্ত সমস্যার প্রহেলিকা ও বিভীষিকাকে
তিরোহিত করিয়া ঐ প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।
তিনি জানাইয়াছেন,—স্বরূপনির্ণয়ে সকলেই 'কৃষ্ণদাস'।

অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের দ্বারা অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণের অপ্রাকৃত কামের সেবাই স্বরূপ-নির্ণয়ের ফল। কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জিত হইলে জীবের এইরূপ চেতন-স্বরূপ বিকশিত হয়।

ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ—এই জগৎ আমাদিগের নিকট যে তিক্ত অভিজ্ঞতা আনয়ন করিয়াছে, তাহাতে আমরা ন্যূনাধিক ঐ তিক্ত অভিজ্ঞতার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য কোনও না কোনরূপে ব্যগ্র। জগতের ত্রিবিধ ক্লেশে হরি-বিমুখ জীবমাত্রেই নিয়ত তপ্ত হইতেছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ক্লেশের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য পতঞ্জলি প্রভৃতি যে-সকল ব্যবস্থা দিয়াছেন, তদ্দ্বারা জীবের চেতনতা-বিনাশেরই ব্যবস্থা হইয়াছে। চেতনতা-বিনাশের ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অনন্ত নিষ্ঠুর দণ্ড, ভীষণ ক্লেশ আর কি হইতে পারে? চেতনতা বিনষ্ট হইলে জীবের জীবত্ব ধ্বংস হইল। চেতনতাই স্বাধীনতার মূল। চেতনতা বিনষ্ট হইলে স্বাধীনতাকেও যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হইল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব জীবের চেতনতা বা স্বাধীনতা বিনাশের ব্যবস্থা দেন নাই। তিনি জীবের ক্লেশ-মোচনের নামে সর্ব্বাপেক্ষা ক্রূরতা-পূর্ণ ক্লেশে ও নিষ্ঠুরতম দণ্ডে দণ্ডিত করিবার কপটতা প্রদর্শন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—জীব পূর্ণচেতন শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ, জীবের নিত্যসত্তা, নিত্যচেতনতা, নিত্য আনন্দ-সম্পদ্ রহিয়াছে; জীব শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে অভিষিক্ত হইলে তদীয় নিত্যসত্তা, নিত্য চেতনতা এবং নিত্য আনন্দের পরিপূর্ণ

বিকাশ নবনবায়মানভাবে সাধিত হইতে পারে। অন্য উপায়ে জীবের চেতনতা এবং স্বাধীনতা স্তব্ধ ও বিনষ্টই হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ-নামের আভাসেই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি-ভৌতিক ত্রিতাপ অচিরে অনায়াসেই সমূলে নির্ম্মূলিত হয়। শ্রীকৃষ্ণনামকীর্ত্তনকারীই বিশ্বকে নিত্য ও পূর্ণ সুখের আগাররূপে অনুভব ও দর্শন করিতে পারেন। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের আভাসেই মহাদাবাগ্নিতুল্য এই সংসারানল নির্ব্বাপিত হইতে পারে। অন্যান্য যাবতীয় অভক্তি-উপায়ের আশ্রয়ে ভবমহাদাবাগ্নি কোনমতেই বিনষ্ট হয় না, অপিচ কোন না কোনভাবে লুপ্ত তুষাগ্নির ন্যায় অন্তরে দাহ্যমান থাকিয়া পরিণামে জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করে।

শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রেয়ঃকুমুদবিকাশক চন্দ্রিকা বিতরণ করিয়া থাকেন,—শ্রীকৃষ্ণনামে সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ প্রস্ফুটিত হয়। আমরা শ্রুতিতে "শ্রেয়ঃ" ও "প্রেয়" এই দুইটি শব্দ শুনিতে পাই। যাহাতে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ নিহিত এবং যাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণ নাই তাহাই 'প্রেয়ঃ', আর যাহাতে শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের পরিপূর্ণতা এবং আমার বহির্ম্মুখতার আপাত অপ্রিয়তা, তাহাই শ্রেয়ঃ। যাঁহাদের 'প্রেয়ঃ' ও 'শ্রেয়ঃ পৃথক্ নহে, তাঁহারাই মুক্ত। তাঁহাদের জিহ্বাতেই শ্রীকৃষ্ণের নাম নিরন্তর নৃত্য করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন ব্যতীত তাঁহাদের পৃথক্ কোন প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ বিচার নাই। আমাদের বাস্তব সুখের দ্বারাই সমৃদ্ধ হওয়া উচিত। জগতে 'যে সুখের কল্পিত সন্ধান হয়, তাহাতে কেবল ক্লেশের

তীব্রতাকে সাময়িকভাবে হ্রাস করিবার চেষ্টা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। কিন্তু কেবল কষ্টের সাময়িক মোচন বা কষ্টের তীব্রতা লঘুকরণ বাস্তব সুখের স্বরূপ হইতে পারে না। প্রকৃত সুখ—অবসান-রহিত, অপরিবর্ত্তনীয় এবং নিরবচ্ছিন্ন। শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রেয়ঃকুমুদ-বিকাশক চন্দ্রিকা বিতরণ করিয়া থাকেন। তীব্র সূর্য্যালোকে কুমুদের কোমলতা বিনষ্ট হয়; বিশেষতঃ সূর্য্যের তীব্ররশ্মি চক্ষুর পীড়াদায়ক। কিন্তু চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না কুমুদ বিকাশের অনুকূল এবং ইন্দ্রিয়ের স্নিগ্ধকারক। শ্রেয়ঃকুমুদ ইতর তীব্র-সাধন-প্রণালী-দ্বারা মলিন হইয়া পড়ে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের স্নিগ্ধ চন্দ্রিকায় শ্রেয়ঃকুমুদ বিকশিত ও সম্বর্দ্ধিত হয়। শ্রেয়ঃকুমুদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের স্নিগ্ধ চন্দ্রিকার যেরূপ পরম অনুকূল সম্বন্ধ, শ্রেয়ের সহিত অপর সাধন-প্রণালীর সেরূপ সম্বন্ধ নাই। এজন্যই শ্রেয়ঃকৈরব চন্দ্রিকা-শব্দের উল্লেখ। যদিও আমাদের আলোক প্রয়োজন, তথাপি তীব্র আলোক বা তাপ প্রয়োজন নহে। অনুকূল স্নিগ্ধালোকই প্রয়োজন। ইতর সাধন-প্রণালিগুলি আলেয়ার মত আলোক-প্রদানের ছলনাযুক্ত অথবা হরিসেবাবিমুখ কৃচ্ছ্রতার তীব্রতাপযুক্ত। উহাতে শ্রেয়ঃকুমুদ কখনই বিকশিত হয় না। পরন্তু শ্রেয়ঃ লুপ্ত হইয়া পড়ে।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন—বিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ। আমরা জ্ঞানার্জ্জনের জন্য আকাঙ্ক্ষা-বিশিষ্ট। অভিজ্ঞতার প্রণালী জাগতিক জ্ঞানার্জ্জনের সেতু, কিন্তু এই

অভিজ্ঞতার প্রণালী নানা দোষদুষ্ট ও অসম্পূর্ণ। অভিজ্ঞতার প্রণালী-দ্বারা আমরা যে জ্ঞানার্জ্জন করি, তাহা চিরস্থায়ী ফল প্রসব করিতে পারে না। যখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, তখন আমাদের আহৃত প্রচুর জ্ঞান-ভাণ্ডার আমাদের আয়ত্ত থাকে না। অভিজ্ঞতার প্রণালী কিয়ৎকাল পরেই অসম্পূর্ণতা-দোষে দুষ্ট বলিয়া মনে হয়। অভিজ্ঞতার প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক অর্দ্ধশতাব্দির সাধনার পর আমরা যে জ্ঞান অর্জ্জন করি, সেই জ্ঞানভাণ্ডার শতাব্দির সাধনার পর অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক বলিয়া দৃষ্ট হয়। কিন্তু অপরিবর্ত্তনীয় ও সম্পূর্ণ জ্ঞান-ভাণ্ডারই সুবুদ্ধি-মান্ ব্যক্তিগণের কাম্য। যখন আমাদিগের স্বরূপ-নির্ণয় হয়, তখন আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে, জাগতিক অভিজ্ঞতা-দ্বারা সংগৃহীত ও সঞ্চিত শত শত শতাব্দির জ্ঞানভাণ্ডারও কত দরিদ্র, অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক। ঐ সকল অসম্পূর্ণ জ্ঞান আমাদের কোন সাময়িক প্রয়োজন সাধন করিতে পারে, কিন্তু তাহারা কখনই আমাদিগের নিত্য আকাঙ্ক্ষা, নিত্যমঙ্গলসাধনে সমর্থ নহে। আমরা কেবল যদি বর্ত্তমানের আপাত প্রয়োজনীয়তাকেই বড় মনে করি এবং তাহা পরিপূরণেই বিব্রত থাকি, তাহা হইলে আমাদিগকে 'মনুষ্য' নামে অভিহিত করা কি সঙ্গত? আমাদিগকে নিত্য প্রয়োজনের জন্য মনোযোগী হইতে হইবে। আমরা আমাদের সর্ব্বশক্তি, চেষ্টা, সামর্থ্য যোগ্যতা—নিত্যপ্রয়োজনের পরিপূর্ত্তি সাধনেই নিয়োগ করিব। আমাদের চেতনের বিকাশ-সাধন

ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় চেষ্টা নশ্বর, তাহারা কিয়ৎক্ষণের জন্য আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অল্পকালের মধ্যেই আত্মগোপন করে। শ্রুতি এইগুলিকে অপরাবিদ্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন। আত্মার অপ্রতিহতা আকাঙ্ক্ষাময়ী বৃত্তিই পরা বিদ্যা। সেই পরা বিদ্যা নিখিল সদ্‌জ্ঞানের জননী। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন সেই পরাবিদ্যার জীবাতু-স্বরূপ। পূর্ণজ্ঞান একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণনাম—পূর্ণতম সম্বিদ্‌বিগ্রহ। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান, বাসুদেব-জ্ঞান, লক্ষ্মী-নারায়ণ-জ্ঞান, কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষিরোদকশায়ীর জ্ঞান, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধের জ্ঞান, রাম-নৃসিংহাদি অবতারের জ্ঞান, বৈকুণ্ঠ ও গোলোকের যাবতীয় জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণনামেই অনুস্যূত রহিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণনাম ব্যতীত ইতর শব্দ ইতরব্যোমে বিচরণ করিয়া বহির্ম্মুখ জীবের নিকট আবৃতজ্ঞান প্রকাশ করিতেছে। ঐ সকল শব্দ আমাদের কর্ণ ব্যতীত চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক্—এই চারটি পরীক্ষকের পরীক্ষার পাত্রত্বে পরিণত হইয়াছে। ইতরব্যোম হইতে যখনই কোন শব্দ আগত হয় তখনই ঐ চারিটি পরীক্ষক ঐ শব্দের সত্যতা-নিরূপণে নিযুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু পরব্যোমাগত শব্দ ঐ সকল পরীক্ষকগণের অধীন নহেন। তাঁহার ব্যক্তিগত এমন একটি স্বতন্ত্রতা আছে, যাহা ঐ শব্দ সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষণ করিয়া শব্দ-শ্রবণকারীর যাবতীয় ইন্দ্রিয়কে নিয়মিত করিয়া দিতে পারেন। ইতরব্যোমের শব্দ অপরের ভোগের জন্য কল্পিত।

কিন্তু পরব্যোমের শব্দ স্বয়ং ভোক্তা ও সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র এবং পরিপূর্ণ শক্তিমান্। সেই বৈকুণ্ঠ শব্দোচ্চারণই কৃষ্ণসংকীর্ত্তন, তাহা কৃষ্ণেতর সংকীর্ত্তন নহে। শ্রীকৃষ্ণনাম—পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণসৎ ও পূর্ণআনন্দস্বরূপ। অতএব শ্রীকৃষ্ণনামের সহিত জড়জগতের মলিনতা মিশ্রিত করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিতে হইবে না। কৃষ্ণনামের প্রভুত্বের বৈশিষ্ট্য আমাদিগের যাবতীয় জ্ঞানের আকরসমূহের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত যে-সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান আছে, তাহাতে আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রবেশাধিকার নাই। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন ব্যতীত অন্যান্য সাধন-প্রণালিগুলি আরোহবাদের অহমিকার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অধোক্ষজ বস্তুর সমীপে উপনীত হওয়ার প্রণালী একমাত্র শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনে প্রতিষ্ঠিত। জড়মিশ্র শব্দ কখনই আমাদিগকে অধোক্ষজ শব্দের নিকট লইয়া যাইতে পারে না। যখন জড়মিশ্র শব্দের সহিত অবিমিশ্র পূর্ণসচ্চিদানন্দ শব্দের একাকার করিবার চেষ্টা প্রদর্শিত হইবে, তখন সেইরূপ অবৈধ প্রাকৃত মতবাদকে আমরা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিব। অধোক্ষজ অবিমিশ্র শব্দ আমাদিগের ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়মিত, সংযমিত এবং পূর্ণ সচ্চিদানন্দের সেবার যোগ্য করিয়া তুলিবে। আমরা তখন পরা বিদ্যায় প্রতিষ্ঠিত হইব।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন—চেতনের আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনকারী। আমরা অনেক সময়ই ক্ষণিক অকিঞ্চিৎকর এবং পরিণামে দুঃখদায়ক সুখের মায়ামৃগ হইয়া পড়ি।

কিন্তু আমাদের চেতনের আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদাই নিত্য, পূর্ণ, অখণ্ড চিদানন্দ-সমুদ্রের জন্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। একমাত্র কৃষ্ণনামই আমাদিগকে নিত্যানন্দসাগরের সন্ধান-প্রদান এবং আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করাইতে পারেন। অন্য সাধন-প্রণালী বাস্তব আনন্দ-প্রদানে অসমর্থ। ইতর সাধনের দ্বারা সাময়িক দুঃখনিবৃত্তি বা দুঃখের স্তব্ধ ভাবমাত্র আমাদের নিকট উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু কেবল স্তব্ধভাব বাস্তবতার পর্য্যায়ে পরিগণিত হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণনাম আমাদিগকে প্রতি পদে পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন করাইয়া থাকেন। অমৃত কঠিন বস্তু নহে; তাহা তরল, সুস্বাদু, সঞ্জীবক ও অমরত্ব-সাধক। শ্রীকৃষ্ণনাম—অখিলরসময়। শ্রীকৃষ্ণনামে পঞ্চবিধ মুখ্য চিন্ময়রস ও সপ্তবিধ আগন্তুক গৌণ-চিন্ময়রস পরিপূর্ণ-মাত্রায় রহিয়াছে। জাগতিক অভিধানগত নাম বিরস ও কুরস বহন করিয়া থাকে। এমন কি, ব্রহ্ম. পরমাত্মা, নারায়ণাদি নামেও অখিল চিদ্‌রস নাই। ঐ সকল অসম্যক্, আংশিক ও তটস্থ-বিচারে অখিলরসের ন্যূনতা-জ্ঞাপক। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনামরস শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের ন্যায় অখিলরস-বিগ্রহ। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ রসের এইরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন :—'ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকার ভারভূঃ। হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥' প্রাকৃত ভাবনার পথ বা তথা-কথিত আধ্যাত্মিক ভাবনার পথ অতিক্রম-পূর্ব্বক অপ্রাকৃত চমৎকারাতিশয়ের আধার-স্বরূপ যে স্থায়িভাব শুদ্ধ, সত্ত্ব,

পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বল হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই 'রস' বলিয়া বিবেচিত। রস—আস্বাদনের বস্তু। সেই আস্বাদন—চিদাস্বাদন; চিদাস্বাদন তখনই সম্ভব, যখন আমরা জাগতিক আবর্জ্জনাগুলি সম্পূর্ণভাবে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি। যখন আমরা শ্রীগুরু-কৃপায় আবর্জ্জনা বা অবরণ-মুক্ত হই, তখনই অখিলরসামৃতবিগ্রহ শ্রীনাম আমাদিগের নির্ম্মল চেতন-স্বরূপে তাঁহার অপ্রাকৃত রসময় স্বরূপ প্রকটিত করেন। আমরা তখন অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় অপ্রাকৃত নামরস আস্বাদন করিয়া শ্রীনাম-প্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে পারি। আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-ব্যাপারটি—আস্বাদন নহে, তাহা 'ভোগ' বা 'কাম'। অপ্রাকৃত নামপ্রভু জীবের কাম সহ্য করেন না। যাহারা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকে 'আস্বাদন' বলিয়া মনে করে, তাহাদের নিকট অপ্রাকৃত রসনিকেতন শ্রীনাম তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন না। তাহারা নামাপরাধকেই 'নাম' মনে করিয়া মনঃকল্পিত বিকৃত রসের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের সপ্তম ফল—সর্ব্বাত্ম-স্নপন। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বাঙ্গদ্বারা অপ্রাকৃত কাম-দেবের সেবার উপায় ও উপেয়। ব্রজবধূগণ—ব্রজবধূ শিরোমণি শ্রীবার্ষভানবী সর্ব্বাঙ্গ-দ্বারা অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীনন্দনন্দনের যে অপ্রাকৃত কামসেবা করেন, সেই অপ্রাকৃত কামসেবা যাঁহারা ব্রজবধূগণের আনুগত্যে লালসা করেন, শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন তাঁহাদেরই মুখ্যসাধন ও সাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে তাঁহাদের সর্ব্বাত্মস্নপন বা সর্ব্বাত্মা-দ্বারা শ্রীকাম-

দেবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ সুষ্ঠুরূপে সাধিত হয়। কৃষ্ণকামসেবা-রসামৃতসিন্ধুতে, যাঁহার সর্ব্বাত্মস্নপিত হইয়াছে, সেই মুকুন্দ-প্রেষ্ঠা বার্ষভানবীর কুণ্ডে সর্ব্বাত্মস্নপন যাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনকেই একমাত্র সাধনরূপে বরণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ব্যতীত পৃথগ্‌ভাবে স্মরণ-প্রযত্নাদি দ্বারা শ্রীবার্ষভানবীর কুণ্ডে এবং অখিলরসামৃত সিন্ধুতে কাহারও সর্ব্বাত্মস্নপন হয় না। পৃথগ্‌ভাবে স্মরণ প্রযত্নাদি—প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাযুক্ত কৃত্রিম ও আনুকরণিক অবৈধ চেষ্টা-মাত্র। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনেই সর্ব্বাত্মা স্নপিত হয়। সর্ব্বাত্মস্নপনসিদ্ধিতে কেবলমাত্র সম্ভ্রম-বিচারে নাভির ঊর্দ্ধ্বদেশ হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত উত্তমাঙ্গের দ্বারাই ভগবানের সেবা চেষ্টা প্রদর্শিত হয় না। নাভির নিম্ন হইতে পদনখ পর্য্যন্ত সর্ব্বচিদঙ্গ-দ্বারা অর্থাৎ সর্ব্বাত্মা-দ্বারা অপ্রকৃত কামদেবের অপ্রাকৃত কামসেবায় যোগ্যতা লাভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণনামের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণই আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সুযোগ প্রদান করিবে। আমরা সেই একমাত্র উপায় ও উপেয়কেই গ্রহণ করিব। তাহার কারণ, স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব কীর্ত্তন করিয়াছেন,—"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥" ভগবানের নিজ সর্ব্বশক্তি অপ্রাকৃত ভগবন্নামেই নিহিত রহিয়াছে। "নিজশক্তি" বলায় তাঁহার বহিরঙ্গা মায়ার শক্তি বা ক্রিয়া অপ্রাকৃত শ্রীনামে নাই, ইহাই সূচিত হইতেছে। কৃষ্ণের

নিজস্ব যতকিছু শক্তি, তাহা অপ্রাকৃত নামে পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। সুতরাং পূজা-ধ্যানাদির জন্য শ্রীনামগ্রহণকারীর পৃথক্ প্রযত্ন নাই। শ্রীহরি-নামে স্থান, কাল, পাত্রেরও বিচার নাই। পূজা, ধ্যান প্রভৃতি সাধনের স্থান, কাল, পাত্রের বিচার রহিয়াছে। যে পরম উপায় ও উপেয়ের স্থান-কাল-পাত্রের বিচার নাই, তাঁহাকে স্থান-কাল-পাত্রের বিচারাধীন অন্যান্য সাধনের সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত করা দুর্দ্দৈবের লক্ষণ। অপ্রাকৃত নামকে ইতরসাধনের দ্বারা সম্পূর্ণ (?) করিবার চেষ্টাও দুর্দ্দৈবের অন্যতম চিহ্ন। অপ্রাকৃত নামকে প্রাকৃত শব্দের সহিত সমজ্ঞান-পূর্ব্বক অন্যান্য কর্ম্মাড়ম্বর, জ্ঞানাড়ম্বর, যোগাড়ম্বর ও ব্রতাড়ম্বরের জন্য আগ্রহও দুর্দ্দৈবের লক্ষণ।

কৃষ্ণ—অখিল রসামৃতমূর্ত্তি; পঞ্চমুখ্যরস ও তাহাদের পরিপোষক সপ্ত আগন্তুক গৌণ-রস কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াই পূর্ণরূপে অবস্থিত। এই জড়জগতেও নশ্বর জড়ীয় সম্বন্ধে ঐ সকল রসের হেয় প্রতিফলন দৃষ্ট হয়। প্রাকৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রেও এই সকল রসের আলোচনা শ্রুত হয়। আমাদের প্রত্যেকেই উক্ত মুখ্য পঞ্চ রসের কোন না কোন একটীতে অপরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। যেখানে জাগতিক সম্বন্ধ, সেখানেই বিশ্রম্ভ-বিচার হেয়তা সংশ্লিষ্ট করিবে। কিন্তু যেখানে প্রাকৃত সম্বন্ধের বা প্রাকৃত বিষয়-আশ্রয়ের সমাবেশ নাই, যেখানে প্রাকৃত বিভাব, অনুভাবাদি সামগ্রীর কোন প্রসঙ্গ নাই, যেখানে অস্থায়ীভাব বা বিরতি

নাই, সেখানে কখনই হেয় রসের প্রসঙ্গ উত্থাপিতই হইতে পারে না। বিম্বে যে বস্তু যত উন্নত, প্রতিবিম্বে সেই বস্তুই তত অবনত। বিম্বে যে বস্তু যত উপাদেয় ও চমৎকার, প্রতিবিম্বে সেই বস্তুই তত অনুপাদেয় ও অশোভন। সুতরাং স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তমের সহিত যেখানে সম্বন্ধ, সেখানে বিকৃত প্রতিবিম্বজাত কোন হেয় রসের প্রসঙ্গ নাই। বিকৃত প্রতিফলিত প্রতিবিম্বে যাহা অত্যন্ত অবনত, তাহাই অবিকৃত অপ্রাকৃত বিম্বে উন্নত উজ্জ্বলরূপে সম্প্রকাশিত। যদি প্রাকৃত সম্বন্ধে পঞ্চবিধ রসের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়, তবে অপ্রাকৃত সম্বন্ধে মাত্র আড়াই প্রকার সম্বন্ধ স্বীকার করিলে অপ্রাকৃতের বিচিত্রতা অপেক্ষা প্রাকৃতের বিচিত্রতার সংখ্যাধিক্য মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু ইহা শ্রুতির বিরুদ্ধ কথা। অখণ্ড, অনন্ত, নিত্য নবনবায়মান অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যের খণ্ড, শান্ত, অনিত্য, একঘেয়ে প্রতিফলন মাত্র—প্রাকৃত বৈচিত্র্য। বিম্বে যাহা নাই, প্রতিবিম্বে তাহা প্রতিফলিত হইতে পারে না। বিম্বে যাহা আছে, প্রতিবিম্বে তাহাই বিকৃতরূপে প্রতিফলিত হয়, ইহাই নিত্যসিদ্ধ সত্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন যে, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণের দ্বারাই অখিল রসামৃত-মূর্ত্তি নামীর রসসিন্ধুতে সর্ব্বাত্মস্নপন হয়।

আমাদিগকে অবিমিশ্র চেতনের সংস্পর্শ ও সন্ধান লাভ করিতে হইবে—যে চেতনের জগতের সহিত কোন মিশ্রন নাই—যে চেতন আবরণ-রহিত হইয়া তাঁহার নিত্যসিদ্ধা বৃত্তিতে জাগরুক আছেন—যে চেতন বিশ্রম্ভভাবে পূর্ণ চেতনের

পূর্ণসেবায় তৎপর হইয়াছেন; কিন্তু যদি কেবল আমরা কৃত্রিম অনুকরণপ্রিয় হই, তবে কোন দিনই মঙ্গলের পথে আরূঢ় হইতে পারিব না। যাঁহাদের সার্ব্বকালিকী সর্ব্বাঙ্গময়ী চেষ্টা পূর্ণতম চেতনের সুখতাৎপর্য্যে অবিচ্ছিন্ন-অহৈতুকভাবে নিযুক্ত, তাঁহাদের অনুসরণের দ্বারাই মঙ্গল লাভ হইবে। অপ্রাকৃত রস ভাবনার পথ মনকে অতিক্রম-পূর্ব্বক শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল চেতনে চমৎকারাতিশয়ের ভাণ্ডারস্বরূপ স্থায়ী ভাব-রূপে সঞ্চারিত হয়। তাহা কৃত্রিমতা বা অনুকরণের দ্বারা লাভ করা যায় না। অনুকরণকারী বিনাশপ্রাপ্ত হয়। আত্মাকে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের সহিত একাকার করিয়া ফেলিতে হইবে না। পাশ্চত্য দেশের অনেকেই এবং ভারতীয় কর্ম্মজড়-সম্প্রদায়ের অনেকে মনকে আত্মার সহিত একাকার করিয়াছেন, নির্ভেদজ্ঞানী আবার মন হইতে চেতনকে পৃথক্ করিতে গিয়া আত্মার অস্তিত্বই একেবারে অস্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন।

জীব—সনাতন অর্থাৎ নিত্য। মুক্ত দশায় জীব সম্পূর্ণরূপে ভগবদাশ্রিত ও প্রকৃতি-সম্বন্ধশূন্য। বদ্ধদশায় জীব স্বীয় উপাধিরূপ প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়—এই ছয়টী ইন্দ্রিয়কে স্বকীয় তত্ত্ববোধে আকর্ষণ করিয়া থাকে। আমাদের স্বরূপ-নির্ণয় হইলে অর্থাৎ আমরা যে পূর্ণ চেতনের বিভিন্নাংশ, ইহা উপলব্ধি হইলে আমাদের অবস্থান অটুট হয়। তখন আমরা আমাদের নিত্য জীবনের পথে অগ্রসর হইতে পারি।

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু জগৎকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনর্পিতচরী বাণী প্রতি-চেতনে সঞ্চারিত হউন, প্রত্যেক ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য-বাণী স্বরাজ্য-সিংহাসন লাভ করুন। এতদিন শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী লোকে সুষ্ঠুরূপে তাঁহাদের পূর্ণতমা বৃত্তিতে বুঝিতে পারিতেন না, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণীতে ভাগবতী বাণীর মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তি—স্ফোটের পূর্ণতম-বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জীব-হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া বলিয়াছেন, সমস্ত প্রাকৃত বিচারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া একমাত্র উদ্বুদ্ধ নির্ম্মল চেতনস্বরূপের অপ্রাকৃত সহজ-প্রীতিময় সর্ব্বাঙ্গীন ভজনের দ্বারাই অখিলরসামৃত-মূর্ত্তির নিকটতম প্রদেশে যাইতে হইবে। অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রাকৃত রাজ্যের চিন্তাস্রোত বা আনুমান বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে না। নতুবা আস্তিকতার প্রথম সোপানের দ্বারেও প্রবেশা-ধিকার পাওয়া যাইবে না। যখন দণ্ডকারণ্যবাসী ষষ্টিসহস্র ঋষি শ্রীরামচন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলিঙ্গন-কামনা করিয়াছিলেন, তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। ইহা হইতেও জানা যায় যে, সর্ব্বপ্রকার নৈতিক উপদেশ জগতের গণ্ডিমধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে। অপ্রাকৃত চেতনরাজ্যে প্রাকৃত নীতি ও দুর্নীতির স্থান নাই। দুর্নৈতিক তাহার পশুত্ব-ভাব লইয়া ধর্ম্মরাজ্যের—পরমার্থ-রাজ্যের দ্বারেই প্রবেশ করিতে পারে না। দণ্ডকারণ্য-বাসী ঋষিগণ তাঁহাদের মাতা-পিতা হইতে যে শরীর লাভ

করিয়াছিলেন, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র তাহা গ্রহণ করিলেন না। পূর্ণচেতন পরমেশ্বর-বস্তু প্রাকৃত পুরুষ ও প্রাকৃত স্ত্রী-দেহ আকাঙ্ক্ষা করেন না। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ 'স্ত্রীভেক' গ্রহণ করিতে পারিতেন, স্ত্রী-সজ্জায় সজ্জিত হইতে পারিতেন, কিন্তু ঐরূপ কৃত্রিমতা-দ্বারা কখনও পূর্ণচেতনের প্রীতির সঞ্চার হইতে পারে না। ভগবান্ অপ্রাকৃত বস্তু—পূর্ণচেতনবস্তু—অপ্রাকৃত চেতন জীবের অপ্রাকৃতা প্রীতিময়ী সেবায়ই তাঁহার আদর। অক্ষজ কখনও অধোক্ষজের প্রীতির বা আকর্ষণের বস্তু হইতে পারে না। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম অধোক্ষজ বস্তু। "অধঃকৃতং অক্ষজং বদ্ধজীবানাং ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানং যেন স এব অধোক্ষজঃ।" যিনি বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ সর্ব্বতোভাবে নিরস্ত করেন, তিনিই 'অধোক্ষজ' বাস্তব বস্তু।

ইন্দ্রিয়-সমূহ বহির্জগতের কার্য্যোপযোগী করণবিশেষ। তাহাদের গতির নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। বহির্ম্মুখিনী ইন্দ্রিয়-বৃত্তি কখনও অপ্রাকৃত সন্ধান করিতে পারে না। বহির্ম্মুখিনী মেধার দ্বারা যাহা চিন্তনীয় বিষয় হয়, যাহা ধ্যান করা যায়, যাহা স্থির-সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা সকলই প্রাকৃত—মনোধর্ম্ম-বিশেষ। একমাত্র অপ্রাকৃতের চরণে সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণই ইন্দ্রিয়কে উন্মুখ করিবার উপায়। সেইরূপ সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত শ্রীনাম স্বয়ংই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন এবং সেবোন্মুখতার বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে অপ্রাকৃত শ্রীনাম তাঁহার অপ্রাকৃত রূপ, অপ্রাকৃত গুণ, অপ্রাকৃত পরিকর ও অপ্রাকৃত

লীলাসমূহ প্রকাশিত করিয়া থাকেন। যাবতীয় জাগতিক সিদ্ধান্ত-সঙ্গতি অপ্রাকৃত রাজ্যে প্রবেশের মহা বিঘ্ন-স্বরূপ হয়। জাগতিক ধারণা, ন্যায়, সিদ্ধান্ত প্রভৃতিকে অপ্রাকৃত রাজ্যে চালনা করার নামই—তর্কপথ। আর অপ্রাকৃত কথার অবতরণ হইলে তাহাতে কর্ণ-নিয়োগ করা এবং ঐরূপ সেবোন্মুখতার দ্বারা অর্থাৎ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত অপ্রাকৃত রাজ্যের বার্ত্তার অনুসন্ধান করাই শ্রৌতপথ। শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন,—"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥" দ্বিতীয় অভিনিবেশের রাজ্যে—বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের বিচারপথে যাহা ভাল বা মন্দ বিচার করা যায়, তাহা সকলই মনোধর্ম্ম। এই জড়জগতে আমরা সকল বস্তুকেই সম্ভ্রমযুক্ত আধারে স্থাপন করিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করি, কাজেই যখন আমরা দেখি সেই সম্ভ্রমযুক্ত অবস্থা অতিক্রম করিয়া বিশ্রম্ভ-ভাবের অবতারণা হয়, তখনই আমরা তাহাতে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার রক্ষা করিতে পারি না; মনে করি, অপ্রাকৃতবস্তুও বোধ হয় সম্ভ্রমতা-রহিত হওয়ায় শ্রেষ্ঠত্বের পদবী হইতে বিচ্যুত হইলেন। যাবতীয় কুণ্ঠধর্ম্ম নিরস্ত বৈকুণ্ঠ কখনই জাগতিক ধারণা ও ধৃতির কবলে কবলিত হইতে পারেন না। জাগতিক তৃতীয়-মানের রাজ্যের অন্তর্গত ধারণা চতুর্থমানের ধারণাকে আক্রমণ করিতে পারে না। যাঁহারা বৈকুণ্ঠ-বিচিত্রতা স্বীকার করেন না, তাহারা নাস্তিক কপিল ও বৌদ্ধের পতাকাবাহক।

পরব্রহ্ম নিত্যশক্তিযুক্ত। তাঁহার শক্তির বিচিত্রতা আছে।

তিনি পুরুষোত্তম। বিষ্ণুতেই পূর্ণ বাস্তব জ্ঞান বিরাজিত তাঁহাকে পূর্ণতম প্রতীতির প্রীতিময়ী উপাসনা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী কোন দেশগত, জাতিগত, সমাজগত বা কালগত নহে। তাহা সকল দেশের, সকল কালের, সকল চেতনের জন্য একমাত্র অমোঘ কল্যাণকর। এই বাণী-শ্রবণে অনুক্ষণ কোটী ইন্দ্রিয় নিযুক্ত করা আবশ্যক। তদ্দ্বারা অপ্রাকৃত শ্রীনামেই সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বসৌন্দর্য্য ও সর্ব্বচিদ্‌বিলাস দর্শন করিতে পাইব। দুর্দ্দৈব-বশতঃ মনোধর্ম্মে ধাবিত বলিয়াই একমাত্র অপ্রাকৃত নামে সর্ব্বসিদ্ধি সন্নিহিত থাকিলেও সেই প্রচুর কৃপার ভাণ্ডার পরিত্যাগ করিয়া আমরা অন্যান্য কল্পিত নশ্বর মন্দোদয়-দয় সাধন ও সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" শ্লোকে শ্রীনাম-গ্রহণের বা হরিকীর্ত্তনের প্রণালী বর্ণন করিয়াছেন। বাদবায়ণ-সূত্রের একমাত্র ব্যাখ্যা—সমস্ত শ্রুতির একমাত্র ব্যাখ্যা—ভাগবতের একমাত্র ব্যাখ্যা—"তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোক; অথবা "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকের যদি ভাষ্য ও টীকা হয়, তাহা হইলে সমস্ত উপনিষদ, সমস্ত সূত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবত ঐ শ্লোকেরই ব্যাখ্যাস্বরূপ হইতে পারে।" তৃণাদপি শ্লোকার্থ বুঝিতে হইলে বৈষ্ণব গুরুর চরণে প্রপন্ন হইতে হইবে। বাহিরে কৃত্রিম আঁকুপাঁকু-ভাব, শরীরের ও চেহারার ভঙ্গি এবং অন্তরে নিজেকে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, গোস্বামী প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করিবার জন্য লালায়িত

থাকা; এইরূপ কপট দৈন্যের কস্‌রতকে কখনই 'তৃণাদপি সুনীচতা' বলা যাইতে পারে না। তৃণ জগতের যাবতীয় বস্তু হইতে নীচ। গো, গর্দ্দভ, কুক্কুরাদি জন্তু পর্য্যন্ত তৃণের উপর পদক্ষেপে উহাকে বিমর্দ্দিত করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু তৃণের তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই! নামভজনকারীর সেই তৃণ হইতেও সুনীচ হইতে হইবে। অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের অতিনীচ বস্তুর অভিমানও ত্যাগ করিতে হইবে। যথা, ভাঃ ১১।২৮।৪—"কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ। বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ॥" দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম॥ চৈঃ চঃ॥ অর্থাৎ যেখানে অদ্বয়জ্ঞান বাধা প্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় বস্তু মায়ার প্রতীতি উপস্থিত হইয়াছে, সেখানে ভাল, মন্দ, ছোট, বড় যাহা কিছু সব ভুল। যেমন স্বপ্নমধ্যে রাজা হওয়া ও কুটীরবাসী দরিদ্র বলিয়া অনুভব করা একই প্রকারের অমূলক কল্পনা। উভয়ই সমান। তদ্রূপ প্রাকৃত জগতের বস্তুজ্ঞানে নিজকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বর্ণ বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য বা ঐশ্বর্য্যবান্ মনে করা কিংবা নিজকে নিকৃষ্ট শূদ্রাদিবর্ণে অভিমান করা একই কথা। যিনি তৃণাদপি সুনীচ তিনি নিজকে ইহ জগতের বা চতুর্দ্দশ ভুবনের কোনও প্রাকৃত জীব জ্ঞান করেন না। তিনি নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ তাঁহার উক্ত চতুর্ব্বিধ অভিমানের কোনও একটীও তাঁহার হৃদয়ে নাই। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণবর্ণে শোভিত থাকিয়াও জন্মাদি অভিমান-রহিত। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের অভিমান এই—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধের্গোপীভর্ত্তুঃ পাদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥" অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী বর্ণ বা আশ্রমের অন্তর্গত কেহই নহি। আমি একমাত্র পরমানন্দসাগর গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস-গণের অনুদাস।

যিনি জন্ম কর্ম্ম বা বর্ণাশ্রম জাতি প্রভৃতি দ্বারা দেহে অহংভাব সম্পন্ন নহেন তিনিই হরির প্রিয়। (ভাঃ ১১।২।৫০) তৃণাদপি শ্লোকে সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়া অভিধেয় হরিকীর্ত্তনের প্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছে। চৈঃ চঃ সনাতন শিক্ষায়,—"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'। কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি' 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'॥ ইহাতে সম্বন্ধ জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে। সেই সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত হইয়া অর্থাৎ নিজকে প্রাকৃত জগতের কোনও ক্ষুদ্রতম বস্তুর অভিমানও না রখিয়া অপ্রাকৃত নিত্যবাস্তব-বস্তু ভগবানের নিত্যদাসানুদাস অভিমানে হরিকীর্ত্তন করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শিক্ষাষ্টকের পঞ্চম শ্লোকে—"কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়" অর্থাৎ জীবের স্বরূপ বিভ্রান্ত অবস্থায় জীব নিজকে ইহ জগতের মধ্যে ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত কোনও না কোনও একটী বস্তুর অভিমানে ব্যস্ত, কিন্তু ভগবানের কৃপায় অবিদ্যা বিদূরিত হইলে জীব নিজকে বিভুচিৎ ভগবানের পাদপদ্ম-স্থিত ধূলী অর্থাৎ তদীয় বস্তু বা বিভিন্নাংশ চিৎকণ জীব বলিয়া উপলব্ধি করেন।

তখনই জীব "তৃণাদপি সুনীচ" হন এবং সর্ব্বদা ভগবৎ পাদ-পদ্মে স্থিত হইয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনের যোগ্যতা লাভ করেন।

সৎকুলে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও সৌন্দর্য্যদ্বারা যে সকল পুরুষের প্রাকৃত অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহাদের মুখে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তিত হন না, কারণ হরিকীর্ত্তন একমাত্র অকিঞ্চনগণেরই গোচরীভূত। "তৃণাদপি" শ্লোক দ্বারা পদ্ম-পুরাণোক্ত দশবিধ নামাপরাধ নিরস্ত হইয়াছে। হরিনাম মুক্তকুলের উপাস্য বস্তু, অকিঞ্চনগণের একমাত্র বিত্ত, পরম-নির্ম্মৎসর সাধুগণের সর্ব্ববিধ কৈতব-বিনির্ম্মুক্ত পরমধর্ম্মসম্পদ সুতরাং উহা কপট ভোক্তা বা কপট দৈন্যযুক্ত ব্যক্তির অধিগম্য নহে। সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত জড়ীয় ছোট বড় যাবতীয় অভিমান নির্ম্মুক্ত, ভগবানের অনন্য শরণাগত পুরুষই তৃণাদপি সুনীচ, তিনিই একমাত্র সতত নাম ভজনকারী বৈষ্ণব, বৃক্ষ অপেক্ষা সহ্যগুণ সম্পন্ন, জড় প্রতিষ্ঠায় উদাসীন এবং অপরের প্রতি মানদ।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বাইশ বাজারে প্রহার তরু অপেক্ষা সহনশীলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বৃক্ষগণ জড়ধর্ম্ম প্রযুক্ত সহ্য করিতে বাধ্য। কিন্তু সম্প্রস্ফুটিত চেতনে এই প্রকার সহন-শীলতা শ্রীনামপ্রভুর কৃপাব্যতীত সম্ভবপর নহে। জাগতিক কোন প্রকার ক্লেশ শ্রীনামপ্রভুর সেবা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। "খণ্ড খণ্ড যদি হই যায় দেহ-প্রাণ। তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥" এই উক্তি দ্বারা শ্রীনামভজনে নিষ্ঠার জন্য সহনশীলতা প্রকাশ করিতেছে।

জাগতিক কোন প্রকার সম্মান বা জ্ঞানলাভের পিপাসা থাকিলে জড়ীয়সাধনে ও জড়ীয়বস্তু সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত থাকিতে হয়। যাঁহার জড়জগতের বহিরঙ্গা মায়াকৃত কোন বস্তু বা সম্পত্তি লাভের আশা থাকে অথবা মায়িক কোন প্রকার কর্ত্তব্য আছে বলিয়া জ্ঞান থাকে ততদিন তাহার অপ্রাকৃত-সাধন—নামভজনের অধিকার হয় না। অতএব নাম ভজন-কারী অমানী।

শ্রীনাম ভজনকারী মানদ—কারণ স্বাভাবিক দৈন্য বশতঃ জগতের সকলকে শ্রেষ্ঠ দর্শন করেন—শ্রীহরির সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট ও সেবকজ্ঞানে সম্মান করিয়া থাকেন। "তৃণাদপি সুনীচ" শ্লোকে মধ্যমাধিকারী ভক্তের ও কীর্ত্তনে অধিকার লাভের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে। কনিষ্ঠাধিকারী প্রাকৃত-ভক্ত, স্বরূপোপলব্ধি না হওয়াতে তাঁহার ভক্তজনে পূজ্য-বুদ্ধি উদিত হয় নাই। সুতরাং তিনি নামভজনে অধিকারী হইতে পারেন নাই। কিন্তু মধ্যমাধিকারীর স্বরূপ-জ্ঞানোদয় হইয়াছে, তিনি ভগবানের সেবা, ভক্তের প্রতি মৈত্রী, অতত্ত্বজ্ঞ বালিশ-জনে' হরিকথা উপদেশ দানরূপ কৃপা, বিদ্বেষী জনে উপেক্ষাদি করিতেছেন। তিনি নিজের ভোক্তার অভিমান দূর করিয়া সেবা ও সেবকের প্রতি নিষ্ঠা-বিশিষ্ট। আর মহাভাগবত বা উত্তমাধিকারী অকিঞ্চন। সর্ব্বতোভাবে তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ। তিনি আত্মারাম হইয়াও সতত নাম ভজনানন্দে বিভোর। তাঁহার বস্তু-দর্শন—হরিসম্বন্ধি-দর্শন,

ঈশাবাস্য-দর্শন। তিনি নিজে ভগবানের সেবক থাকিয়া জগতের সর্ব্বজীবকে সেবায় নিযুক্ত দেখিতে লালায়িত। তিনি সকলকে নামভজনে উদ্বুদ্ধ করেন। বিদ্বেষীকেও প্রভুর ব্যতিরেকভাবে সেবা পুষ্টিকারক বলিয়া সম্মান দান করেন। আমি প্রভুর সেবা করিতে পারিলাম না বলিয়া সর্ব্বদা বিপ্রলম্ভভাবে বিভোর। এই অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভভাবই তৃণাদপি সুনীচতার, তরোরপি সহিষ্ণুতার, অমানিত্ব ও মানদানের চরম উৎকর্ষ। ইহাতে সম্ভোগবাদীর আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নাই, একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত। তখন তিনি দেখেন "গাছ-পালা, ঘর-বাড়ী, পশু-পক্ষী সকলেই ভজন করিতেছে। কেবল আমিই ভজন করিতেছি না।

স্ফোট যখন শ্রীগুরুচরণে প্রপন্ন জীবের উপর নিজ শক্তি প্রকাশ করেন সেই শক্তি প্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র—'তৃণাদপি সুনীচাদি'। স্ফোট স্ফূটিত হইয়া নামরূপে হ্লাদিনীশক্তির প্রভাব বিস্তার করিয়া স্বরূপশক্তির ক্রিয়া প্রকাশ করেন। তখন তৃণাদপি শ্লোক রূপধারণ করিয়া নিজসৌন্দর্য্যে শ্রীকৃষ্ণকেও আকর্ষণ করেন এবং তটস্থ জীবকে মায়ার বহিরঙ্গা বৃত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে নিম্মুক্ত করিয়া স্বরূপশক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত করেন। ক্রমশঃ উত্তরোত্তর হ্লাদিনীর কৃষ্ণ-সুখানুসন্ধানস্পৃহাকে নামভজনকারীর উপর আবেশ করাইয়া সুদর্শনের কৃপায় মহারূপবতী করিয়া রূপানুগ মধ্যে পরিগণিত করেন। যতই স্ফোটশক্তি তাঁহার অসমোর্দ্ধ কৃপা প্রকাশ

করেন ততই ক্রমে আলম্বনের বিষয়াশ্রয় বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত করান। তখন বহির্জ্জগতের বস্তুর প্রার্থনা একেবারেই আত্মোভোগ বা ত্যাগের অভিসন্ধি শূন্য হইয়া প্রার্থনা করেন—"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।" অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণার্থ ধন, জন, সুন্দরী কামিনী, কবিতা—এমন কি, জগতের ধার্ম্মিক-সম্প্রদায় যে মুক্তির জন্য আকাঙ্ক্ষিত. তাহা কিছুই চাই না। হে জগদীশ, আমি চাই তোমাতে অহৈতুকী ভক্তি। তোমার ষোলআনা সুখ যাহাতে তাহারই ইন্ধন করিয়া লও—তোমার সুখেই আমার সুখ হউক। তোমার সেবা করিতে গিয়া যদি অপরের দৃষ্টিতে অসংখ্য দুঃখ এবং অসুবিধাও আমাকে বরণ করিতে হয়, তাহাতেই আমার সুখ। সর্ব্বক্ষণ সকল ইন্দ্রিয়ে তোমার সুখের অনুসন্ধান ছাড়া আমার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, আমার আত্মসুখকে যেন আমি তোমার সুখ বলিয়া মনে করিয়া আত্মবঞ্চনা না করি। বহির্ম্মুখ মায়িক গুণোত্থ সত্ত্বগুণের প্রকাশ দান, ব্রত ও সত্য-ধর্ম্মাদি যেন কোন প্রকারে আমার প্রতি প্রভুত্ব বিস্তার না করিয়া আমাকে 'নামভজনেই যে তোমার সুখ, ইহাতে অবিশ্বাস উৎপাদন করাইয়া নামাপরাধী না করে। এই সকল ব্যতীরেকী প্রার্থনার উদয় হয়। আর অন্বয়ভাবে আলম্বনবিজ্ঞানে পারঙ্গত হইয়া ভগবত্তত্ত্বে সুবিজ্ঞ হইয়া ভগবত্তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম সত্ত্বা শ্রীব্রজদেবীগণের আরাধ্য নন্দ-তনুজের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং ব্রজদেবীগণের আনুগত্যে

নিত্যকিঙ্করী অভিমানে সেবা প্রার্থনার উদয় হয়। তৎসহ স্বরূপশক্তি প্রকাশের স্বাভাবিক অচ্ছেদ্য লক্ষণ দৈন্যের উদয় হয়। তখন "আমি পতিত কৃষ্ণসেবা হইতে বিচ্যুত হইয়া ভবার্ণবে পতিত হইয়া বদ্ধ হইলেও আমি তোমার আশ্রয়াভিলাষী" বলিয়া প্রার্থনা হয়। (শ্রীলপ্রভুপাদ)

"স্ফোট তখন স্বরূপশক্তির মহাসৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আস্বাদন করাইয়া পরম পরিশুদ্ধ অবস্থায় স্থিত করেন। সাধক তখন নামসংকীর্ত্তনের মহাশক্তি ও কৃপালাভ করিয়া তীব্র উৎকণ্ঠা ও বিপুল দৈন্যে ব্যাকুল হইয়া হ্লাদিনীর কৃপাশক্তির আবেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। তখন তাঁহার স্ফোটের কৃপায় সাধুসঙ্গে হরিকীর্ত্তনই একমাত্র কৃত্য হইয়া পড়ে। বহু ভাগ্যক্রমে রাগানুগীয় ভক্তজনের কৃপায় ক্রমশঃ অনর্থ-নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি এবং আসক্তির পর প্রেম-ভূমিকায় আরূঢ় হন। তখন সেই রাগনুগীয় ভজন প্রণালীতে নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর সমন্বিত শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজনোচিত উৎকণ্ঠারাশিকে প্রাপ্ত হন। সাধক-দেহে প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। প্রেমের সাত্বিক বিকার প্রকাশিত হইতে থাকে। স্ফোটের যতই সুষ্ঠুও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ হইতে থাকে ততই দৈন্য ও তীব্র উৎকণ্ঠা পরিপক্কাবস্থা লাভ করিলে অনুরাগরূপ স্থায়ীভাবের জন্য লালসা জন্মে। কিন্তু সাধকদেহে অনুরাগের আবির্ভাবের সম্ভাবনা নাই। ব্রজে গোপীকা-গর্ভে জন্মলাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধা ব্রজদেবীগণের সঙ্গপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ এবং তৎপরিকরগণের দর্শন শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি দ্বারা ক্রমশঃ স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ,

অনুরাগ এবং মহাভাবও সেই গোপিকা-দেহে প্রাদুর্ভূত হয়। যেহেতু পূর্ব্বজন্মে সাধক-দেহে উক্ত ভাব-সমূহের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় ভক্তগণের কৃপায় তাঁহাদের মহাবদান্যতার পরাকাষ্ঠা-দান-স্বরূপে গৌরলীলায় প্রদত্ত হইয়াছিল; তাহাই অনর্পিতচর কৃপা-বৈশিষ্ট্য। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সীগণের অসাধারণ লক্ষণ বর্ণিত আছে—"যেসকল ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত, ক্ষণকালও যুগশতের মত বোধহয়, সেই গোপীগণের গোবিন্দ-দর্শনে পরমানন্দ জন্মিয়াছিল।" ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে উক্তি—"তোমাকে দর্শন না করিয়া আমাদের এক-নিমেষও যুগবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।" ক্ষণকাল শত শত যুগের ন্যায় বোধ হওয়া মহাভাবের লক্ষণ।

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রেমভূমিকাপ্রাপ্ত সাধকের দেহভঙ্গ হইলেই গোপীগর্ভে জন্ম ব্যতীতই অপ্রকট-প্রকাশে গোপিকাদেহ প্রাপ্ত হউক, তদনন্তর সেই দেহেই নিত্যসিদ্ধ গোপিকাগণের সঙ্গপ্রভাবে প্রাদুর্ভূত স্নেহাদিভাবের প্রাপ্তি হইলে দোষ কি? তদুত্তরে—গোপীগর্ভে জন্মব্যতীত এই সখীটী কাহার কন্যা, কাহার বধূ, কাহার স্ত্রী ইত্যাদি নর-লীলোচিত স্ত্রী-কন্যাদি ব্যবহার-সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারে না।

অপ্রকট-প্রকাশে জন্ম হইলে ক্ষতি কি? তদুত্তরে—"প্রাকৃত জগতের অতীত দেশের শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকাশ-বিশেষে সাধক কিম্বা প্রাকৃতজনের, গমন করিতে দেখা যায় না; শুধু

সিদ্ধব্যক্তিরাই প্রবেশ করিতে পারেন। কারণ উক্তধাম কেবল সিদ্ধভূমি। অতএব তথায় স্ব-স্ব সাধন দ্বারাও স্নেহাদি ভাবসমূহ শীঘ্র ফলপ্রদ হইতে পারে না। অতএব সেই প্রপঞ্চগোচর শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকাশে উৎপত্তির পর শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গের পূর্ব্বেই সেই স্নেহাদিভাব সিদ্ধির জন্য, যোগমায়া, যাঁহাদের প্রেম প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাদৃশ ভক্তগণকে শ্রীকৃষ্ণাবতারসময়ে প্রাকৃত-জনগোচর শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকাশে লইয়া যায়েন। সাধকভক্ত, কর্ম্মী এবং সিদ্ধ-ভক্তগণের সেই প্রপঞ্চগোচর শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিতে দেখা যায় বলিয়া উক্ত ধাম সাধক ও সিদ্ধভূমিরূপে অনুভূত হয়। আবার জাতপ্রেম পরমোৎকণ্ঠাবান্ ভক্ত, সাধকদেহভঙ্গানন্তর গোপীদেহ-প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোথায় থাকেন? তদুত্তরে—সাধকদেহ-নাশের পরই যিনি বহুকাল অবধি সাক্ষাৎ সেবালাভের অভিলাষে উৎকণ্ঠাশীল, সেই প্রেমবান্ ভক্তকে ভগবান্ কৃপা পূর্ব্বকই সপরিকর স্বীয় দর্শন এবং উক্ত ভক্ত, স্নেহাদি প্রেমবিলাস সকল লাভ না করিলেও তাঁহাকে তদীয় অভিলষণীয় সেবাদি কিঞ্চিৎ দান করিয়া থাকেন। যেমন পূর্ব্বজন্মে নারদকে দর্শনাদি দিয়াছিলেন। আর চিদানন্দময়, গোপীদেহও দান করিয়া থাকেন। সেই দেহই যোগমায়া, শ্রীকৃষ্ণ পরিকরগণের আবির্ভাব-সময়ে শ্রীবৃন্দাবনীয় প্রকট-প্রকাশে গোপীগর্ভ হইতে প্রাদুর্ভুত করান—এ বিষয়ে নিমিষমাত্রও কালবিলম্ব করেন না। যেহেতু অনবরত প্রকটলীলা চলিতেছেই, তাহার কখনও বিচ্ছেদ নাই। সেই সময়ে যে ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনীয় লীলার

প্রকটন ; সেখানেই, এই ব্রজভূমিতেই, গোপীগর্ভে উৎপত্তি বুঝিতে হইবে। সুতরাং সাধক প্রেমবান্ ভক্তের দেহভঙ্গের সমকালেও সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের প্রাদুর্ভাবও সততই আছে। অতএব মহানুরাগী উৎকণ্ঠাশীল ভক্তগণের ভয় নাই। (রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা)

ইহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ভজনকৌশল মধ্যে বিপ্রলম্ভভাবের প্রচুর প্রকাশ দেখা যায়। ইহার পরে অর্থাৎ শিক্ষাষ্টাকের শেষ অষ্টমশ্লোকে শ্রীরাধার ভাববৈশিষ্ট্যের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা। যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥" অর্থাৎ এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্ব্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন দ্বারা মর্ম্মাহতাই করুন, তিনি—লম্পট পুরুষ, আমার প্রতি যেরূপেই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নন, আমারই প্রাণনাথ।" "না গণি আপন-দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ, তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য্য। মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ, সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥" এই সকল প্রেম-পরাকাষ্ঠার কথা শ্রীমন্মহা-প্রভুর প্রকটিত অনর্পিত স্বভক্তি-সম্পত্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় স্ফোটশক্তি দ্বারাই প্রকশিত হইয়াছে।

দশম ক্রম

সেই স্ফোটশক্তি বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তদীয় সেবার্থে নানা প্রকারে ও নানাভাবে নানাস্থানে প্রকাশিত।

যখন স্বরূপ-শক্তিরসন্ধিতে স্ফুটিত তখন বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে কৃষ্ণের সেবার্থে স্থানাদিরূপে ও সেবোপকরণরূপে প্রকটিত। যখন স্বরূপ-শক্তিরসম্বিতের প্রতি প্রস্ফুটিত তখন 'কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিদের সার'-রূপে ভক্তে ও ভগবানে পরস্পরের মাহাত্ম্যজ্ঞান প্রকাশক রূপে প্রকটিত। যখন স্বরূপশক্তির হ্লাদিনীতে স্ফুটিত যখন প্রেমানন্দ রূপে ভক্ত ও ভগবানের লীলাবিলাসে তৎপর। তটস্থ-শক্তি জীবে স্ফুটিত হইয়া রূঢ়ি বৃত্তিদ্বারা জীব সত্তা, জীব-জ্ঞান ও জীবানন্দ রূপে প্রকাশিত। আবার যখন বহিরঙ্গা মায়া শক্তিতে স্ফুটিত হন, তখন অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিতে জড়ীয় স্থানাদি, জড়ীয় জ্ঞান ও জড়ানন্দ-রূপে প্রকাশিত। তাহার প্রত্যেকটীই বহু প্রকারে প্রকাশিত হওয়ায় তাহার দিগ্দর্শন কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি মাত্র আলোচিত হইল। আর একটি স্ফোটের প্রধান প্রকাশ—সঙ্গীতরূপে। ইহা শ্রীকৃষ্ণের রাসে নিত্য মহামাধুর্য্যময়ী মহাশক্তি প্রকটিত করিয়া ভগবৎসুখতৎপরা।

সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক এই সঙ্গীত ব্রহ্মা পুরাকালে চারিবেদের সার গ্রহণ করিয়া সঙ্গীতবেদ নামক এই পঞ্চম বেদ রচনা করিয়াছিলেন। ঋক্‌সূক্তসকলের আবৃত্তি হইতে পাঠ্য বা আবৃত্তির, সামগান হইতে গানের, যজুর্ব্বেদ হইতে অভিনয়ের এবং অথর্ব্ববেদ হইতে রসের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া কথিত। ব্রহ্মা, শিব, নন্দী, ভরত, দুর্গা, নারদ, কোহল, রাবণ, বায়ু, রম্ভা প্রভৃতি সঙ্গীতের প্রচারক বলিয়া বিদিত।

সঙ্গীতপারিজাতে—গীত-বাদ্য-নৃত্য এই তিনের সমষ্টিকে

সঙ্গীত বলা হয়। তন্মধ্যে গীতের প্রাধান্যবশতঃ উহারা সঙ্গীত বলিয়া কথিত। সঙ্গীতশিরোমণিতে—গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটী সঙ্গীত বলিয়া কথিত। গীত ও বাদ্য এই দুইটীই সঙ্গীত—এইরূপও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। এই সঙ্গীত পশু, পক্ষী, মনুষ্য, দেবতা-প্রভৃতির চিত্তহারি বালিয়া প্রসিদ্ধ। সঙ্গীতসারে—মার্গ ও দেশী দুই প্রকার সঙ্গীত। তন্মধ্যে মার্গস্বর্গে ও দেশী ভূলোকে আনন্দ-প্রদাতা। ব্রহ্মা ভরতকে, ভরত অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ দ্বারা মহাদেবের সম্মুখে উহা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গীত দেশভেদে নানাদেশীয় বলিয়া কথিত হয়। নাদঃ—নাদ ব্যতীত গীত, ষড়জাদি স্বর ও রাগ-রাগিনী হয় না। অতএব এই জগৎ নাদময়। সঙ্গীতদামোদরে—নাদতত্ত্ব ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞানের পৃথক্ সত্তা নাই, নাদজ্ঞান ব্যতীত শিবকে জানা যায় না, জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম নাদময়, স্বয়ং হরিও নাদরূপী বা শব্দ ব্রহ্মস্বরূপ। হনুমন্মতে—সরস্বতীও নাদ সমুদ্রের পরপার এখনও পৌছিতে পারেন নাই। তাই ঐ সমুদ্রে নিমগ্ন হইবার ভয়ে বক্ষে বীনার তুম্ব বহন করিতেছেন। সঙ্গীত-সারে—ন-কারের অর্থ প্রাণবায়ু, দ-কারের অর্থ অগ্নি, যেহেতু এই দুই হইতে উৎপন্ন হয়, সেইজন্য ইহাকে নাদ বলে। অর্থাৎ নাদ প্রাণ ও অগ্নি হইতে উৎপন্ন। সঙ্গীত-মুক্তাবলীতে—যাহা আকাশ-অগ্নি-বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়া নাভির উৰ্দ্ধস্থানে বিচরণপূর্ব্বক মুখে প্রকাশিত হয় তাহা নাদ বলিয়া কথিত। সেই নাদ প্রাণিজাত, অপ্রাণিজাত ও উভয়জাত হয়। প্রথম জীবদেহজাত, দ্বিতীয় বীণাজাত এবং

তৃতীয় বংশাদি-জাত, এইরূপে নাদ তিন প্রকার। প্রয়োগ-স্থলে পণ্ডিতগণ এই নাদকে তিন প্রকার বলিয়া থাকেন। 'মন্দ্র' হৃদয়ে, 'মধ্য' কণ্ঠে এবং 'তার' তালুতে অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে পরবর্ত্তীটী তৎপূর্ব্ববর্ত্তীটী হইতে দ্বিগুণ সময়বিশিষ্ট। যাঁহারা শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি, সাহিত্য ও নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইয়াও সঙ্গীত-বিদ্যা জানেন না, তাঁহারা দ্বিপাদ পশু। জ্ঞান, যজ্ঞ, স্তব প্রভৃতি সকল সাধনই ধর্ম্ম-অর্থ-কা মরূপ ত্রিবর্গফল প্রদান করে। একমাত্র সঙ্গীত-বিজ্ঞান ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ-ফল প্রদান করে। সঙ্গীতদামোদরে বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে—রম্য সঙ্গীতে যাহার চিত্তে সুখের উদয় হয় না, সে এই সংসারে মনুষ্য মধ্যে গো-সদৃশ এবং বিধাতা কর্ত্তৃক বঞ্চিতই। হরিণ, পক্ষী এবং সর্পও গানের দ্বারা বলপূর্ব্বক বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়, শিশুগণও রোদন করে না, গান অতীব বিপুলানন্দবর্দ্ধক, অভীষ্টফলদায়ক, বশীকরণ, সর্ব্বচিত্তহারী ও মুক্তির বীজস্বরূপ। সঙ্গীতসারে—ধাতু-মাতু-সহিত গীত চিত্তরঞ্জক হয়। গীতের অবয়বকে 'ধাতু' এবং গীতের রাগাদিকে 'মাতু' বলে। নারদসংহিতায় গীত ধাতু-মাতু বিশিষ্ট হয়—এইরূপ কথিত হয়। তার মধ্যে নাদাত্মক গীতকে 'ধাতু' বলা হয়। নাদ হইতে শ্রুতি জন্মে, শ্রুতি হইতে ষড়্‌জ্‌ প্রভৃতি স্বর, সেই সকল স্বর হইতে মূর্চ্ছনা এবং মূর্চ্ছনা হইতে গ্রাম-সম্ভূত তাল বা তান উৎপন্ন হয়। নাদ, শ্রুতি, স্বরগ্রাম, মূর্চ্ছনা, তাল, বর্ণ, গ্রহস্বর, ন্যাসস্বর, অংশস্বর ও জাতি এই ক্রমে উপদিষ্ট

হইয়াছে। সেই নাদ বায়ুসঞ্চালিত হইয়া দ্বাবিংশ শ্রুতিতে পরিণত হয়। দ্বাবিংশ নাড়ী বক্র ও ঊর্দ্ধভাবে হৃদয় স্থানকে আশ্রয় করিয়াছে; যতসংখ্যক নাড়ী শ্রুতিও ততসংখ্যক বলিয়া কথিত। সেই সকল শ্রুতি ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া বীণা প্রভৃতি যন্ত্রেই লক্ষিত হয়, কেন না, কফ প্রভৃতি দোষযুক্তকণ্ঠে তাহাদের প্রকাশ হয় না। ষড়্‌জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বরে প্রত্যেকটীতে চারিটী করিয়া শ্রুতি; ঋষভে ও ধৈবতে তিনটী করিয়া এবং গান্ধীর ও নিষাদে দুইটী করিয়া শ্রুতি আছে। ষড়্‌জস্বরে—নান্দী, বিশালা, সুমুখী, বিচিত্রা এই চারটী; ঋষভে—চিত্রা, ঘনা ও চালনিকা এই তিনটী; গান্ধারে—সরসা ও মালা এই দুইটী; মধ্যমে—মাধবী, শিবা, মাতঙ্গিকা ও মৈত্রেয়ী এই চারিটী; পঞ্চমে—বালা, কলা, কলরবা, শাঙ্গ´রবী এই চারটী; ধৈবতে—জায়া, রসা ও অমৃতা এই তিনটী; নিষাদে—মাত্রা, মধুকরী এই দুইটী; এইরূপে দ্বাবিংশতি শ্রুতি স্বরের উৎপাদিকা বলিয়া কথিত হয়। কোহলীতে আছে, প্রজাপতির মুখ হইতে বিনির্গত সিদ্ধি, প্রভাবতী, কান্তা, সুভদ্রা এই মনোহারিণী শ্রুতিচতুষ্টয় ষড়্জ স্বর উৎপাদন করে। ব্রহ্মাও শ্রুতিস্থানে হৃদয়াভ্যন্তরে উৎপন্ন স্বরসকল তত্ত্বতঃ বলিতে অসমর্থ। গভীর জলে বিচরণকারী মৎস্যের গতি লক্ষিত হয় না।

যাহা শ্রুতিস্থানে হৃদয়াভ্যন্তরে ধ্বনিত হইয়া চিত্তরঞ্জক হয় তাহার নাম 'স্বর'। এই ব্যাখ্যানুসারে স্বরশব্দের যোগরূঢ়ত্ব নির্দ্দিষ্ট হয়। অথবা—যেহেতু ইহারা শ্রোতার মনোরঞ্জন করে

অতএব তাহাদের 'স্বর'-সংজ্ঞা। এইস্থলে ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ—এই সপ্তস্বর কথিত হয়। ইহাদের স-রি-গ-ম-প-ধ-নি এইরূপে নামান্তরও আছে। মন্দ্র-মধ্য-তার-ভাব আশ্রয়ে ইহারা তিন প্রকার। মন্দ্র হৃদয়ে, মধ্য কণ্ঠে এবং তার মস্তকে উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে পর-পরটী পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অপেক্ষা দ্বিগুণ উচ্চ। যেহেতু এই স্বর নাসিকা, কণ্ঠ, বক্ষঃ, তালু, জিহ্বা, দন্ত—ইহাদিগকে স্পর্শপূর্ব্বক এই ছয় স্থান হইতে উৎপন্ন হয়, অতএব ইহা ষড়্‌জ বলিয়া কথিত। কিন্তু দামোদরের মত অন্যপ্রকার, যথা—নাভি, হৃদয়, পার্শ্বদ্বয়, নাড়ী ও মস্তক এই ছয়স্থানের বায়ু সংমূর্চ্ছিত হইয়া ষড়্‌জ স্বর উৎপন্ন করে। যখন বায়ু নাভিমূল হইতে উত্থিত হইয়া বৃষভের ন্যায় ধ্বনি উৎপাদন করে এবং সহজে মুখবহির্গত হয় তখন তাহা ঋষভ-স্বর বলিয়া কথিত হয়। যে হেতু নাভি হইতে উত্থিত বায়ু নাসিকা ও কর্ণকে সঞ্চালিত করিয়া সশব্দে নির্গত হয়, সেইজন্য তাহা "গান্ধার" বলিয়া কথিত। 'মধ্যম'-স্বর স্বভাবতঃ গম্ভীর ও কিছু উচ্চ। ইহা শরীরের নাভিমূল ও মধ্যস্থান হইতে উৎপন্ন হয়। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পঞ্চ প্রাণ, ইহাদের সম্মিলনে পঞ্চম-স্বরের উৎপত্তি হয়। এই পঞ্চ প্রাণের স্থান নির্দেশ এইরূপ—হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যদেশে অপান, নাভিস্থলে সমান, কণ্ঠদেশে উদান এবং সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া ব্যান অবস্থিত। যে স্বর নাভির অধোভাগে গিয়া বস্তিদেশ স্পর্শ করতঃ পুনরায় উর্দ্ধগতি হইয়া যেন সবেগে কণ্ঠস্থানে উপস্থিত হয় তাহা ধৈবত-স্বর।

যেহেতু এই সকল ষড়জ প্রভৃতি মনোহর স্বর এই স্বরে অবস্থান করে, সেই কারণে এই স্বর জগতে নিষাদ বলিয়া কথিত। ময়ূর ষড়জ, চাতক ঋষভ, ছাগ গান্ধার, বক মধ্যম, কোকিল পঞ্চম, ভেক ধৈবত, হস্তী নিষাদ স্বর প্রকাশ করে। ইহা ব্রহ্মা প্রভৃতির সম্মত। দামোদর বলেন—ময়ূর, বৃষভ, ছাগ, কোকিল, অশ্ব ও হস্তী—ইহারা ক্রমান্বয়ে এই সকল অতি ত্বরায়ত্ত স্বর উচ্চারণ করিয়া থাকে।

সেই সকল স্বর বাদি-সম্বাদি-বিবাদ্যনুবাদী এই চারি নামে আবার চারি প্রকার। তন্মধ্যে যে স্বর কার্য্যকালে প্রচুরভাবে প্রযুক্ত হয় এবং রাগের স্বরূপ নির্দ্দেশ করে তাহা 'বাদী'। পঞ্চমের সমান শ্রুতিবিশিষ্ট স্বর 'সম্বাদী'; তাদৃশ স্বর কখনও বা সম্বাদী হয় না। গান্ধার ও নিষাদ ঋষভ-ধৈবতের বিবাদী এবং ঋষভ-ধৈবতও উহাদের বিবাদী। এতদবশিষ্ট অনুবাদী। ইহা দন্তিলাচার্য্যের অভিমত। বাদী স্বর—রাজা, সম্বাদী স্বর—পাত্র, বিবাদী স্বর—শত্রু এবং অনুবাদী স্বর রাজাও পাত্রের অনুচর। স্বরসকলের অতিসূক্ষ্মভাবে সংযোজনের নাম 'গ্রাম'। উহা স্থান ও শ্রেণীভেদে ত্রিবিধ। ষড়্‌জ ও মধ্যম গ্রাম পৃথিবীতে এবং গান্ধার গ্রাম দেবলোকে প্রচলিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্বরসমূহাত্মক তিনটি গ্রাম। তাহাদের ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধার এই তিন সংজ্ঞা। ইহারা মূর্চ্ছনার আধারস্বরূপ। গ্রামত্রয়মধ্যে ষড়্‌জ গ্রাম উত্তম। অন্যেও বলেন,—স-রি-গ-ম-প-ধ-নি—ইহা ষড়্‌জ গ্রামের মূর্চ্ছনা, ম-প-ধ-নি-স-রি-গ—ইহা মধ্যমগ্রামের মূর্চ্ছনা এবং

গ-ম-প-ধ-নি-স-রি—ইহা গান্ধার গ্রামের মূর্চ্ছনা। জাতি ও শ্রুতি প্রভৃতির সহিত স্বর 'গ্রাম' সংগঠন করে। যখন স্বর সংমূর্চ্ছিত হইয়া রাগে পরিণত হয়, ভরতাদি মুনিগণ সেই গ্রামোৎপন্ন রাগকে 'মূর্চ্ছনা' নামে অভিহিত করেন। গ্রামোৎপন্ন, সপ্তস্বরবিশিষ্ট সেই মূর্চ্ছনা তিন গ্রামে সংখ্যায় মোট একবিংশতি। ললিতা-মধ্যমা-চিত্রা-রোহিনী-মতঙ্গজা-সৌবীরা-বর্ণমধ্যা-যড়্জমধ্যা-পঞ্চমী-মৎসরী-মৃদুমধ্যা-শুদ্ধান্তা-কলাবতী-তীব্রা-রৌদ্রী-ব্রাহ্মী-বৈষ্ণবী-খেচরী-বরা-নাদবতী-বিশালা এই একুশটী মূর্চ্ছনা গ্রামত্রয়ে প্রসিদ্ধ—মহাদেব এইরূপ বলেন। শিবের সম্মুখে মূর্চ্ছনা গান করিয়া ব্রহ্মঘাতীও পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

স্বরের আরোহণ-মুখে মূর্চ্ছনাসকলই শুদ্ধ "তাল" হয়। এই বিষয়ে দামোদর অন্যরূপ বলেন, যথা—যাহার দ্বারা মূর্চ্ছনার শেষভাগের আশ্রয়ে স্বরপ্রয়োগের বিস্তার হয় তাহারাই সপ্তস্বরসমুদ্ভূত উনপঞ্চাশৎসংখ্যক 'তান'। তান হইতেই পৃথক্ পৃথক্ কূটতান সকলের উৎপত্তি। সে-সকল কূটতানের ভেদ অনেক প্রকার। গ্রাম, মূর্চ্ছনা ও তানের বহু ভেদ তাহা অপ্রাসঙ্গিক ও অজ্ঞেয় বলিয়া কথিত হইল না। উক্ত কারণে তালাধিকারে উক্ত হইয়াছে যে, ঐ সকল তাল সংখ্যায় পাঁচ হাজার তেত্রিশ। অগ্নিষ্টোমিক তালে শিবের স্তব করিলে শিবত্বপ্রাপ্তি হয়। শাস্ত্রে শুদ্ধ তালের অগ্নিষ্টোমাদি ভেদ কথিত আছে। কিন্তু প্রয়োগাভাবহেতু উল্লিখিত হইল না। তাহারা মূর্ত্তিমান হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে বিলসিত।

গানকার্য্য-সম্পাদনে ব্যবহৃত স্বরকে "বর্ণ" কহে। সেই বর্ণ স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী ভেদে চারি প্রকার। তাহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ কথিত হইতেছে—একই স্বরের যদি থাকিয়া প্রয়োগ হয় তাহা হইলে তাহার নাম—স্থায়ী। পরবর্ত্তী দুইটী—নামের অনুরূপ অর্থ বিশিষ্ট। অর্থাৎ যাহা আরোহণ করে তাহা আরোহী, যাহা অবরোহণ করে তাহা অবরোহী। এক একটী স্বরে থাকিয়া থাকিয়া পুনঃ প্রয়োগ হইলে সে স্বরকে স্থায়ী বর্ণ জানিবে। পরবর্ত্তী দুইটী সার্থক-নামা। ইহাদের অর্থাৎ স্থায়ী আরোহী অবরোহীদের মিশ্রণে সঞ্চারী বর্ণ হয়। রচনার বৈশিষ্ট্যে বর্ণ সকল অলঙ্কার হয়। স্থায়ী বর্ণের ছাব্বিশ, আরোহীর দ্বাদশ, সঞ্চারীর দ্বাদশ, অবরোহীর দ্বাদশ—মোট বাষট্টি প্রসিদ্ধ অলঙ্কার কথিত আছে। স্বরজ্ঞান হইলে অভ্যাস দৃঢ় ও আনন্দ লাভ হয়। অলঙ্কারের প্রয়োজনে বর্ণজ্ঞানের বৈচিত্র্য প্রয়োজনীয়। অতএব সঙ্গীতপারিজাতে কথিত আছে—অলঙ্কার ব্যতীত রাগ বিস্তার লাভ করিতে পারে না। সঙ্গীতপারিজাতে—যাহাতে এক স্বরে আরম্ভ করিয়া অগ্রবর্ত্তী স্বরে যাইয়া পুনঃ পূর্ব্ব-স্বরের আলাপ হয়, তাহাকে সঙ্গীতবিশারদ হনুমান্ 'ভদ্র' নামক অলঙ্কার বলিয়াছেন। এই অলঙ্কারে এক একটী স্বরের হানি করিয়া ক্রম সম্পাদিত হয়। যেমন—সরিস, রিগরি, গমগ, মপম, পধপ, ধনিধ, নিসনি সরিস ॥

যাহাতে মূর্চ্ছনার আদিস্বর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক স্বরকে অবস্থিতি পূর্ব্বক দীর্ঘ করিয়া ক্রমে আরোহণ হয় তাহা

'বিস্তীর্ণ' নামে অভিহিত হয়। যথা—সা রী গা মা পা ধা নী সা। সর্ব্বজ্ঞ হনূমান্ পূর্ব্ব দুই স্বরকে হ্রস্ব এবং তৃতীয় স্বরকে দীর্ঘ করিয়া 'সন্ধিপ্রচ্ছাদন' নামক অপর এক অলঙ্কার বলিয়াছেন। যথা—সরিগা, রিগমা, গমপা, মপধা, পধনী, ধনিসা॥ আদি স্বর চারিবার, দ্বিতীয় স্বর দুইবার, তৃতীয় ও চতুর্থ স্বর একবার মাত্র আলাপ করিয়া হনূমান্ 'উদ্বাহিত'-নামক অলঙ্কার বলিয়াছেন। যথা—স স স স রি রি গ ম, রি রি রি রি গ গ ম প; গ গ গ গ ম ম প ধ, ম ম ম ম প প ধ নি, প প প প ধ ধ নি স। এই দ্বাদশটী আরোহীর অলঙ্কার স্বরের অবরোহণক্রমে অবরোহি বর্ণের অলঙ্কার হইয়া থাকে। যেহেতু সর্ব্বত্র সঞ্চারিত অতএব 'সঞ্চারী' বলিয়া কথিত। প্রথম স্বরদ্বয় তিনবার আবৃতি করিয়া তারপর ক্রমে তৃতীয় ও দ্বিতীয় স্বর উল্লেখ করিয়া পণ্ডিতগণ 'প্রসাদ'-নামক অলঙ্কার বলিয়াছেন। যথা—সরি সরি সরি গরি, রিগ রিগ রিগ মগ, গম, গম গম পম, মপ মপ মপ ধপ, পধ পধ পধ নিধ, ধনি ধনি সনি॥ যাহাতে প্রথম হইতে তিনিটী স্বরের ক্রমান্বয়ে উল্লেখ হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে 'আক্ষেপ' অলঙ্কার বলিয়াছেন। যথা—"সরিগ রিগম, গমপ, মপধ, পধনি, ধনিস॥ "সরিগ, সরিগম—এইরূপ স্বরবিন্যাসে 'কোকিল' অলঙ্কার হয়। যথা—সরিগ, সরিগম, রিগম রিগমপ, গমপ গমপধ, মপধ, মপধনি, পধনি পধনিস॥ সে স্বর গীতের প্রারম্ভে প্রযুক্ত হয় তাহাকে 'গ্রহস্বর' বলে (সং পাঃ)। যে স্বর গানে রাগপ্রকাশক, অপর স্বর সকল যাহার অনুগামী, যাহা গ্রহস্বরের কারণ, ন্যাসাদি

স্বরের প্রয়োগ অপেক্ষা সর্ব্বত্র যাহার আধিক্য সেই রাজতুল্য স্বর অংশী ও বাদী। 'বাদী'—রাগাদির নিরূপক। যাহা স্বয়ং গ্রহভাব প্রাপ্ত—ইহা দ্বারা গ্রহস্বরের কারণত্ব সূচিত। সঙ্গীত-পারিজাতে, যথা—রাগ সকলের জীবন-স্বরূপ স্বরকে পণ্ডিতগণ 'অংশস্বর' বলেন। অন্যত্রও—প্রয়োগে যাহার বাহুল্য তাহাকে 'অংশস্বর' কহে। যাহা:গীতের সমাপ্তি করে তাহা 'ন্যাসস্বর'। যাহা হইতে রাগের জন্ম, সঙ্গীতশাস্ত্রে তাহা রাগের জাতি, তাহা রাগের মাতাও বটে। শুদ্ধ, বিকৃত, এই দুইয়ের মিলনে সঙ্কীর্ণ—সেই জাতির এই তিন প্রকার আখ্যা। শুদ্ধা জাতি সাতটী; ষড়্‌জাদিস্বরে তাহাদের সংজ্ঞা হয়। শুদ্ধা জাতিই বিকৃতজাতি হয়, বিকৃত জাতির মিশ্রণ হইতে সঙ্কীর্ণ-জাতির উদ্ভব হয়। এই প্রকারে জাতি দুই প্রকার—ইহা কাহারও অভিমত। হরিনায়ক তাই বলেন—শুদ্ধ ও বিকৃতের মিলনে জাতি অষ্টাদশ প্রকার বলিয়া কথিত এবং তাহারাই রাগসকলের উৎপত্তিরকারণ। এই মতই প্রধান বলিয়া প্রতীত হয়। কারণ, প্রাচীন আচার্য্যগণ ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

ষাড়্‌জ, আর্ষভী, গান্ধারী, মাধ্যমী, পাঞ্চমী, ধৈবতী, নৈষাদী,—এই সাতটী শুদ্ধা জাতি। ষড়্‌জ কৈশিকী, ষড়্‌জ-মধ্যমা, গান্ধারপঞ্চমাদ্ধী, ষড়্‌জা, ধৈবতী, কার্ম্মারবী, নন্দয়ন্তী, গান্ধারোদীচ্চরা, মধ্যমোদীচ্চরা, রক্তগান্ধারী ও কৈশিকী—এইরূপ একাদশ বিকৃত জাতি ভরতাদি বলিয়াছেন। অনন্তর শুদ্ধ, সিদ্ধ ও বিকৃত জাতির উৎপত্তিহেতু কহিতেছি,—ষড়্‌জ-

গান্ধারের যোগে ষড়্জকৈশিকী, ষড়্জ-মাধ্যমের যোগে ষড়্জমধ্যমা, গান্ধার পঞ্চমের যোগে গান্ধারপঞ্চমী উৎপন্ন। এইরূপে হেতু নির্দ্দিষ্ট হয়। শ্রুতি হইতে জাতি পর্য্যন্ত বীণাতেই জ্ঞাত হওয়া যায়, অন্যত্র নহে। ত্রিজগতবাসী জীবের চিত্ত যাহার দ্বারা রাগযুক্ত হয়, তাহাকে 'রাগ' কহে।

নারদপঞ্চমসংহিতায় আছে—শ্রীকৃষ্ণ রাসে মুরলীর শব্দে সকলের মোহ উৎপাদনপূর্ব্বক সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বস্থিত ষোল হাজার গোপিনী প্রত্যেকে গান আরম্ভ করিলেন। সেই গান হইতে ষোল হাজার রাগের উৎপত্তি হইল। এই সকলের মধ্যে ছত্রিশটী রাগ এই জগতে প্রসিদ্ধ আছে। সেই সকলও মেরুর চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান আছে—ইহা কেহ কেহ বলেন। ভৈরব, বসন্ত, মালবকৌশিক, শ্রীরাগ, মেঘ, নটনারায়ণ—এই ছয়টী রাগ ও ইহারা পুরুষ। ভৈরবী, কৌশিকী, বিভাষ, বেলাবলী, বঙ্গালী—এই রাগিণীগণ ভৈরব-পত্নী। আন্দোলিতা, দেশাখ্যা, লোলা, প্রথমমঞ্জরী, মল্লারী —ইহারা বসন্তের অনুগত রাগিণী। গৌরী, গুণকরী, বরাড়ী, ক্ষমাবতী ও কর্ণাটী—এই সকল রাগিণী মালবকৌশিকের প্রিয়া। গান্ধারী, দেবগান্ধারী, মালবশ্রী, আশাবরী, রামকিরী—ইহারা শ্রীরাগের প্রিয়া রাগিণী। ললিতা, মালসী, গৌরী, নাটী, দেবকিরী—ইহারা মেঘরাগের প্রিয়তমা রাগিণী। তারামণী, সুধাভীরী, কামোদী, গুর্জ্জরী ককুভা—এই রাগিণীগণ নট-নারায়ণের প্রিয়তমা। ছয় রাগ ও ছয়ত্রিশ রাগিণী সুন্দর দেহবিশিষ্ট। শিবশক্তির মিলিতরূপই রাগ। ইহা পরম

প্রেমরসের সমুদ্র। ইহার শ্রবণে শ্রীহরি প্রেমবিগলিত হয়েন।

মালব, মল্লার, শ্রীরাগ, বসন্ত, হিন্দোল, কর্ণাট—এই ছয়টী পুরুষ রাগ বলিয়া কথিত। ধানসী, মালসী, রামকেরী, সিন্ধুড়া, আশাবরী ও ভৈরবী—ইহারা মালব-রাগের পত্নী। বেলাবলী, পূরবী, কানড়া, মাধবী, কোড়া, কেদারিকা—ইহারা মল্লার রাগের পত্নী। বেলোয়ারী, গৌড়ী, গান্ধারী, সুভাগা, কৌমারীও বৈরাগী—ইহারা শ্রীরাগের প্রিয়তমা। তোড়ী, পঞ্চমী, ললিতা, পঠমঞ্জরী, গুর্জ্জরী ও বিভাষা—ইহারা বসন্তরাগের প্রিয়তমা। মায়ূরী, দীপিকা, দেশকারী, পাহিড়া, বরাড়ী, মারহট্টা—ইহারা হিন্দোলরাগের স্ত্রী। নটিকা, ভূপালী, রামকেরী, গড়া, কামোদী ও কল্যাণী—ইহারা কর্ণাটরাগের প্রিয়তমা। নানাদেশে পৃথক্ পৃথক্ নামে প্রসিদ্ধ রাগসকলের যথাযথ স্বরূপনির্দ্দেশ করিতে বীণাপাণি আদি কেহই সমর্থ নহে। তন্মধ্যে সেই সকল রাগ তিন প্রকার—সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব। যে সকল রাগ সাতটী স্বরে উৎপন্ন হয় তাহারা "সম্পূর্ণ"। শ্রীরাগ, নট, কর্ণাট, গুপ্তবসন্ত, শুদ্ধভৈরব, বঙ্গালী, সোমরাগ, আম্রপঞ্চম, কামোদ, মেঘরাগ, দ্রাবিড়, গৌড়, রবাটী, গুর্জ্জরী, তোড়ী, মালবশ্রী (মালসী), সৈন্ধবী (সিন্ধুড়া), দেবক্রী, রামক্রী, প্রথমমঞ্জরী (পঠমঞ্জরী), নাট, বেলাবলী, গৌরী—ইত্যাদি রাগ সম্পূর্ণ বলিয়া কথিত। সঙ্গীতসারে কথিত আছে—নাট, ঘটরাগ, নটনারায়ণ, ভূপতি (ভূপালী), শঙ্করাভরণ—ইহারা পূর্ণরাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কোহল বলেন—পূর্ণরাগের

গানে আয়ুঃ, ধর্ম্ম, যশঃপ্রচার, বুদ্ধি, সুখ, ধন ও রাজ্যের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যে সকল রাগ ছয়টী স্বর হইতে উৎপন্ন তাহাদিগকে 'ষাড়ব' কহে। গৌড়, কর্ণাটগৌড়, দেশী, ধন্নাসিকা (ধানশ্রী), কোলাহলা, বল্লালী, দেশ, শাবরী (আশাবরী), খম্বাবতী (ক্ষমাবতী), হর্ষপুরী, মল্লারী, হুংচিকা—ইত্যাদি রাগ হরিনায়কের মতে ষাড়ব বলিয়া কথিত। সঙ্গীতসারে ষাড়বগণনায় শ্রীকণ্ঠ, ভৌলী, তারা, ষালগ, গৌড়, শুদ্ধাভীরী, মধুকরী, ছায়া নীলোৎপলা—ইহাদের উল্লেখ আছে। পূর্ব্বাচার্য্যগণ সংগ্রামে বীরত্ব, রূপ, লাবণ্য ও গুণের খ্যাতি ষাড়বরাগের গানফল বলিয়া কহিয়াছেন। যাহারা পঞ্চ স্বরে উৎপন্ন তাহারা 'ঔড়ব' নামে খ্যাত। মধ্যমাদি, মল্লার দেশপাল, মালব, হিন্দোল, ভৈরব, নাগধ্বনি, গোণ্ডক্কতি (গুণকিরী), ললিতা, ছায়া, তোড়ী, বেলাবলী, প্রতাপসিন্ধু—ইত্যাদি লোকচিত্তরঞ্জক রাগসকল ঔড়ব। (আদিপদের দ্বারা তুরস্ক, গৌড় প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে। ইহার ফল বিষয়ে কোহল বলেন—ব্যাধিনাশ কার্য্যে, শত্রুনাশে, ভয়শোক দূর করিতে, গ্রহশান্তির প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত ব্যাপারে প্রধানতঃ ঔড়ব রাগসকল গান করিবে। এই বিষয়ে হরিনায়ক বলেন—এই তিন শ্রেণীর রাগসকলের পরস্পর মিশ্রণে বহুপ্রকার নাম হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শ্রুতিমধুর কতকগুলিকে 'সঙ্কীর্ণ' বলা হয়।

দেশ-নামিকা ও মল্লারী-নামিকার অংশদ্বয় হইতে এই "পৌরবী" সংজ্ঞা হইয়াছে। বারাটী ও নাটকর্ণাট হইতে এই

'মধুর কল্যাণী' নাম উৎপন্ন হইয়াছে। তোড়ী ও ধন্নাসী হইতে 'সারঙ্গ' উৎপন্ন। শ্রীরাগ ও গৌড়রাগ হইতে 'গৌরী'র উৎপত্তি। নাট ও মল্লারের অংশদ্বয় হইতে 'নটমল্লারিকা' উৎপন্ন হইয়াছে। দেশও শাবরীর যোগে 'বল্লবীর' উৎপত্তি কথিত। কর্ণাট ও ভৈরবের অংশদ্বয় হইতে সকম্পা 'কর্ণাটিকা'র উদ্ভব। সৌন্ধবী ও তোড়ীর যোগে 'সুখাবরী' উৎপন্ন। মল্লার, সৈন্ধবী ও তোড়ীর যোগে 'আশাবরীর' উৎপত্তি। গুর্জ্জরী ও দেশীর যোগে 'রামকেলি' উৎপন্ন। সঙ্কীর্ণ লক্ষণের আরও বহু আছে। যে-দেশে যে-সকল সঙ্কীর্ণরাগ যেরূপ শ্রুত হয়, বিজ্ঞগণ তাহাদিগকে সেইরূপই জানিবেন। গানে রাগিণীসকলের নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যতিক্রমে নিশ্চিতই সর্ব্বনাশ আনয়ন করিয়া থাকে। কিন্তু সম্মিলিতভাবে গানে, রাজার আদেশক্রমে ও রঙ্গস্থলে ঐরূপ ব্যতিক্রম দোষকর হয় না। যাহারা অর্থলোভে, অজ্ঞাতবশতঃ ও শোকে কাল ব্যতিক্রমপূর্ব্বক গান করে সুরসা গুর্জ্জরী রাগিণী তাহাদের সেই দোষ নষ্ট করে বলিয়া কথিত হয়। বসন্ত, রামকেলি ও সুরমা গুর্জ্জরী সর্ব্বকালেই গীত হইয়া থাকে। তাহাতে কোন দোষই উৎপন্ন হয় না। রাত্রিতে দশদণ্ডের পরবর্ত্তিকালে সকল রাগিণীরই গানের বিধি আছে।

অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ—গান এই দুইপ্রকার কথিত হয়। রাগের আলাপ মাত্রকে অনিবদ্ধ কহে। বন্ধন বা রচনাহীন বলিয়া আলাপকে অনিবদ্ধ বলা হয়। রাগের প্রকাশকার্য্যকে 'আলাপ' বলিয়া থাকে। নারদসংহিতায়—যেমন হুঙ্কার হইতে ওঙ্কাররূপে বেদের প্রকাশ, সেইরূপ হুঙ্কার হইতে তা-না-

প্রভৃতি শব্দ ধীরে ধীরে উত্থিত হয়। তা-শব্দে গৌরী, না-শব্দে হর, আ-শব্দে হরি, রি-শব্দে ব্রহ্মা কথিত হন। এইরূপে আ-ত-না-রি-শব্দে হর প্রভৃতি সকলেরই প্রকাশ উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। হরিনায়ক বলেন—সঙ্গীতজ্ঞগণ স-রি-গ-মাদি সমন্বিত গমকের বিচিত্রতাযুক্ত ও নানা ভঙ্গির দ্বারা মনোহর রাগ-প্রকাশকে 'আলাপ' কহেন।

বর্ণালঙ্কার দুইপ্রকার—অর্থহীন হুঙ্কারাদি শব্দ এবং সঙ্গীত শাস্ত্রোক্ত স-রি-গ-ম প্রভৃতি বর্ণালঙ্কার। আলাপের বহুপ্রকার ভেদ আছে। ধাতু ও অঙ্গে বদ্ধ গীতকে 'নিবন্ধ' কহে। সেই নিবন্ধ শুদ্ধ, ছায়ালগ ও ক্ষুদ্র—এই তিন প্রকার। আলাপ, ধাতু ও অঙ্গের সংযোগে 'শুদ্ধ' কথিত হয়। এ স্থলে সাম্প্র-দায়িকগণ বলেন—আলাপ-অর্থে 'সার্থকপদ'। হরিনায়ক কিন্তু অক্ষরবর্জ্জিত গমকের আলাপকে আলাপ কহিয়াছেন। শুদ্ধ, শালগ্ ও সঙ্কীর্ণভেদে গীত ত্রিবিধ বলিয়া কথিত। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র গীতই সঙ্কীর্ণশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

হরিনায়ক বলেন—প্রবন্ধ, বস্তু ও রূপক—নিবন্ধের এই তিন প্রকার সংজ্ঞা আছে। যে বন্ধন চারিধাতু ও ছয় অঙ্গে রচিত হইয়া প্রকৃষ্ট হয় তাহাকে 'প্রবন্ধ' কহে। ইহাতে 'শুদ্ধ' গীতই প্রবন্ধ বলিয়া কথিত হইল। তিন ধাতু ও পঞ্চ অঙ্গে রচিত বন্ধকে 'বস্তু' এবং দুই ধাতু ও দুই অঙ্গে রচিত বন্ধকে 'রূপক' বলে। প্রবন্ধ অর্থাৎ গীতের অবয়বকে ধাতু কহে। উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব ও আভোগ এই ক্রমে সেই ধাতু

চারি প্রকার। প্রথমভাগ—উদ্‌গ্রাহ, তারপর—মেলাপক, তারপর স্থিরত্বহেতু—ধ্রুব, শেষ ভাগ—আভোগ বলিয়া কথিত। শিরোমণিতে আছে—পূর্ব্বাচার্য্যগণ গীতের প্রথম পাদকে উদ্‌গ্রাহ, মধ্যপাদকে নিশ্চলতাহেতু ধ্রুব এবং শেষপাদকে আভোগ কহিয়াছেন। হরিনায়ক বলেন—ধ্রুব ও আভোগের মধ্যে অবস্থিত অপর ধাতুর নাম—অন্তরা। আভোগে কবির ও নায়কের নামের উল্লেখ হয়।

প্রবন্ধ বা গীতের ছয়টি অঙ্গ, যথা—স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাঠ, তাল। স-রি-গ-ম প্রভৃতিকে 'স্বর' কহে; যাহা গুণের উল্লেখ করে তাহাকে 'বিরুদ' কহে; গুণব্যতীত অন্যবাচক যাহা তাহা 'পদ' বলিয়া কথিত হয়; তেনা—ইহার দ্বারা 'তেন'-শব্দ, ইহা মঙ্গলবাচক বলিয়া নিরূপিত; ধাং ধাং ধুগ ধুগ প্রভৃতি বাদ্যাক্ষর সমূহকে 'পাঠ' বলে; আদি যতি প্রভৃতিকে 'তাল' বলে। সঙ্গীতপারিজাতে—পদ, তাল, স্বর, পাঠ, তেন, বিরুদ—এই ছয়টিকে মনীষিগণ গীতের অঙ্গ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে বাচকশব্দ পদ, চচ্চৎপুটাদি তাল, ষড়্‌জ-প্রভৃতি—স্বর, বাদ্য হইতে উদ্ভূত অক্ষর—পাঠ; মঙ্গলার্থ—তেন এবং গুণনামযুক্ত শব্দ বিরুদ। প্রবন্ধ বা গীতের ভরতমুনি-সম্মত পাঁচটীমাত্র জাত হয়—মেদিনী, নন্দিনী, দীপনী, পাবনী ও তারবলী। এই সকল জাতির লক্ষণ কথিত হইতেছে। প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞগণ ছয় অঙ্গবিশিষ্ট গীতকে মেদিনী, পাঁচ অঙ্গবিশিষ্টকে নন্দিনী, চারি অঙ্গবিশিষ্টকে দীপনী, তিন অঙ্গবিশিষ্টকে পাবনী এবং অঙ্গদ্বয়যুক্তকে

তারাবলী বলিয়াছেন। একাঙ্গ প্রবন্ধ হয় না। সঙ্গীত-পারিজাতে উক্ত প্রকার বর্ণন করিয়াছেন।

উত্তম কবি এক তালে, দুই, তিন বা বহু বাদ্যের সহিত ইচ্ছানুরূপ গীতসকল নিশ্চয়ই রচনা করিতে পারেন। বহুতালবিশিষ্ট প্রবন্ধ এক বা বহু রাগে বাদ্যাক্ষর প্রভৃতির বিধানপূর্ব্বক রচনা করিবে। উহার ভেদ বহুতর। কথিত আছে যে, রাগের, তালের, বাদ্যের বিশেষতঃ প্রবন্ধগীতের অবধি এই জগতে নাই।

ভরতমুনি-কথিত এলা প্রভৃতি দুঃসাধ্য প্রবন্ধসকল আছে। তন্মধ্য হইতে পণ্ডিত হরিনায়ক ছাব্বিশটী বলিয়াছেন। যথা,—পঞ্চতালেশ্বর, বর্ণস্বর, অঙ্গচারিণী, স্বরার্থমাতৃকা রাগ-কদম্বক, স্বরাদ্যকরণ' তালার্ণব, শ্রীরঙ্গ, শ্রীবিলাস, পঞ্চভঙ্গি, পঞ্চানন, মাতিলক, সিংহনীল, ত্রিভঙ্গি, হংসনীল, হরিবিলাস, সুদর্শন, স্বরাঙ্গ, শ্রীবর্দ্ধন, হর্ষবর্দ্ধন, বীর, শ্রীমঙ্গল, লাহড়ী, নবরত্ন, সরভনীল, কণ্ঠাভরণ—এই ছাব্বিশটী। চন্দ্রপ্রকাশক প্রভৃতি আরও অন্য ছয় প্রকার আছে।

যে প্রবন্ধে স-রি-গ-ম প্রভৃতি স্বরাক্ষরদ্বারাই ইষ্টার্থ ব্যক্ত হয় তাহাকে স্বরার্থ কহে। শুদ্ধ ও মিশ্রভেদে উহা দুই-প্রকার। যাহা শুদ্ধ-প্রবন্ধের ছায়াতে সংলগ্ন হয় তাহাকে 'ছায়ালগ' বলে। তাল, বাদ্য প্রভৃতির যোগে শূড়রচিত হইয়া উহা চিত্তরঞ্জক হয়। বহুতালের একত্র গুম্ফনকে 'শূড়' কহে। ছায়াতে সংলগ্ন হয় অর্থাৎ শুদ্ধ প্রবন্ধের যৎকিঞ্চিৎ লক্ষণান্বিত হইয়া ইহা উৎপন্ন হয়। উক্ত শুদ্ধপ্রবন্ধের রূপের

ছায়ামাত্রও যদি কোন প্রবন্ধে থাকে, তাহাকে ভরত প্রভৃতি মুনিগণ 'ছায়ালগ' বলিয়া থাকেন। ইহার 'সালগ' এই নামান্তরও আছে। তাই হরিনায়ক বলেন—যাহা ছায়লগ-শূড় তাহাই সাগল। সঙ্গীত দামোদর ও পঞ্চমসার-সংহিতার আছে—ধ্রুবক, মণ্ঠক, প্রতিমণ্ঠ, নিশারুক, বাসক, প্রতিতাল, একতালী, যতি, ঝুমরি—ইহারা সাগল-শূড়ের ভেদ। ধ্রুবক ষোল প্রকার, মণ্ঠক ছয় প্রকার, প্রতিমণ্ঠ পাঁচ, নিশারুক সাত, বাসক চারি, প্রতিতাল চারি একতালী তিন, যতি চারি, এবং ঝুমরি এক প্রকার। কেহ কেহ বলেন—চর্চ্চরীকাদি অপর দশ প্রকার সালগ আছে। এইরূপে উনবিংশতি প্রকার সালগ প্রসিদ্ধ। আদি, যতি, নসারু, অড্ড, ত্রিপুট, রূপক, ঝম্প, মণ্ঠ, ও একতালী—এই নয় প্রকার তাল কথিত আছে। এই নয় তালে রচিত হইলে তাহাকে 'শূড়' কহে। এই প্রকার শূড় —গানে বাদ্যে ও নৃত্যে চিত্তরঞ্জক হয়।

তাল ঃ—যেমন কর্ণধার ব্যতীত নৌকার শুদ্ধগতি হয় না। তদ্রূপ তাল ব্যতীত গীতাদির গতি শুদ্ধি হয় না। সেই তাল-শব্দের বহু প্রকার ব্যুৎপত্তি আচার্য্যগণ বলিয়াছেন। তাল সম্বন্ধে হরিনায়ক বলেন -যেহেতু ইহা সময়ের সমতা বিধানপূর্ব্বক ও অধিক রঞ্জকতাদ্বারা সঙ্গীতের স্থিরতা সম্পাদন করে, অতএব ইহা 'তাল' বলিয়া কথিত। সঙ্গীতসারে আছে—ত-শব্দে শিব এবং ল-শব্দে শক্তিকে বুঝায়। অতএব শিবশক্তির যোগে তালের উৎপত্তি। তলি-ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়াও তাল-শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। অথবা ত-কার ও ল-কারের যোগে

তাল-শব্দ হইয়াছে। রত্নমালায়—ত-কার কার্ত্তিকেয়কে, অ-কার বিষ্ণুকে, ল-কার বায়ুকে নির্দ্দেশ করে। অতএব তালে ঐ সকল দেবতা অবস্থিত আছেন। বাচস্পতি বলেন—হস্তাঙ্গুলির প্রসারণ ও আকুঞ্চন প্রভৃতি যে কার্য্য তাহার দ্বারা কালের পরিমাণ হয় বলিয়া উহা শাস্ত্রে তাল বলিয়া কথিত। একাধিক শত তালের নাম—চঞ্চৎপুট, চাচপুট, ষট্ পিতা-পুত্রক, সম্পক্কেষ্টক, উদ্ঘট্ট, আদিতাল, দর্পণ, চর্চ্চরী সিংহনীল, কন্দর্প, সিংহবিক্রম, শ্রীরঙ্গ, রঙ্গলীল, রঙ্গতাল, পরিক্রম, প্রত্যঙ্গ, গজলীল, ত্রিভিন্ন, বীরবিক্রম, হংসলীল, বর্ণলীল, রাজচূড়ামণি, রঙ্গদ্যূত, রাজতাল, সিংহবিক্রীড়িত, বনমালী, বর্ণতাল, রঙ্গপ্রদীপ, হংসনাদ, সিংহনাদ, মল্লিকামোদ, শরভনীল, রঙ্গাভরণ তুরগলীল, সিংহনন্দন, জয়শ্রী, বিজয়ানন্দ, প্রতিতাল, দ্বিতীয়ক, মকরন্দ, কীর্ত্তিতাল, বিজয়, জয়মঙ্গল রাজবিদ্যাধর, মঠ, জয়তাল, কুডুক্কক, নিঃশারুক, ক্রীড়া, ত্রিভঙ্গি, কোকিলপ্রিয়, শ্রীকান্ত, বিন্দুমালী, সমতাল, নন্দন, উদীক্ষণ, মল্লিকা, ঢেঙ্কিকা, বর্ণমষ্ঠিকা, অভিনন্দ, অন্তরক্রীড়া, লঘুতাল, দীপক, অনঙ্গতাল, বিষম, সান্দীকুন্দ, মুকুন্দ, একতালী, কঙ্কাল, চতুস্তাল, খংখুড়ী, অভঙ্গ, রাজঝঙ্কার, লঘুশেখর, প্রতাপশেখর, জগঝম্প, চতুর্ম্মুখ ঝঙ্কার, প্রতিমঠ, তৃতীয়ক, পার্ব্বতীলোচন, সারঙ্গ, নন্দিবর্দ্ধন, লীলাবিলোকিত, ললিতাপ্রিয়, জনক, লক্ষ্মীশ, রাগবর্দ্ধন এবং উৎসব। সঙ্গীতদামোদর প্রভৃতি কোন কোন গ্রন্থে অন্যরূপ নামও দেখা যায়। ঋষিগণের নানামতবশতঃ নামের বিকল্পে কি ক্ষতি ?

অনুদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত—এই ক্রমে তালের পাঁচটী অঙ্গ আছে। অনুদ্রুত ব্যতীত অপর সকলের সাঙ্কেতিক সংজ্ঞা যথাক্রমে দ, ল, গ ও প। তন্মধ্যে লঘু একমাত্রাবিশিষ্ট, গুরু দুইমাত্রা, প্লুত তিন মাত্রা, দ্রুত অর্দ্ধ মাত্রা অনুদ্রুত দ্রুতের অর্দ্ধ-মাত্রা। অনুদ্রুতের অপর নাম 'বিরাম'। অনুদ্রুতাদির আকারিক চিহ্ন যথা,—লঘু (i) গুরু (৬) প্লুত (iii)। উক্ত চারি অঙ্গুলিতে দ্রুত হয়। অষ্টাঙ্গুলেতে লঘু, ষোল অঙ্গুলিতে গুরু এবং চব্বিশ অঙ্গুলিতে প্লুত হয়। কিঞ্চিৎ করসঞ্চালনে অনুদ্রুত হয়। 'সশব্দ' ও 'নিঃশব্দ'-ভেদে তালের দুইপ্রকার 'ধরণ' আছে। উচ্চ আঘাতকে 'সশব্দ' কহে। লঘুতালাঙ্গে একটীমাত্র 'নিঃশব্দ'। গুরুতালাঙ্গের দুইটী আঘাত—একটী সশব্দ, অপরটী নিঃশব্দ। লঘুর সেই নিঃশব্দটীও অর্দ্ধ হয়, তখন অর্দ্ধনাদহেতু তাহাকে'দ্রুত' কহে। প্লুততালাঙ্গে একটী আঘাত 'সশব্দ' তারপর দুইটী আঘাত 'নিঃশব্দ'। তন্মধ্যে একটী ঊর্দ্ধে ও অপরটী অধোভাগে পতিত হয়। তালের প্রভেদ অনন্ত প্রকার শ্রীরাসমণ্ডলে সকলে মূর্ত্তিমন্ত হয়।

তাল-ধাতুযুক্ত বাক্যমাত্রকে 'ক্ষুদ্র' বলা হয়। সেই ক্ষুদ্র-গীত চারিপ্রকার। সেই সকল ভেদমধ্যে প্রথম চিত্রপদা, তারপর চিত্রকলা, ধ্রুবপদা ও পঞ্চালী। যে ক্ষুদ্রগীতে কেবল পদের বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, ধাতু প্রভৃতির বিচিত্রতা নাই, তাহাকে চিত্রপদা-নামে জানিবে। এস্থলে পদবৈচিত্র্যশব্দে কেবল অনুপ্রাস ও প্রসাদাদিগুণবিশিষ্টতা বুঝিতে হইবে। যদি উদ্গ্রাহ ও আভোগে মাত্রা সমান কিন্তু [illegible] হয় এবং

তিন হইতে আট পর্য্যন্ত পাদসংখ্যা হয়, তাহাকে 'চিত্রকল'। বলিয়া জানিবে।

গীত—দিব্য, মানুষও দিব্য-মানুষ, এই তিনপ্রকার। সংস্কৃত-ভাষায় রচিত গীত—দিব্য ; প্রাকৃতভাষায় রচিত গীত—মানুষ ; সংস্কৃত-প্রাকৃত-মিশ্রিত ভাষায় রচিত গীত—দিব্য-মানুষ। কেহ কেহ দেশবিশেষজাত ভাষার রচিত গীতকে 'মানুষ' বলিয়া থাকেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ, দেশী ভাষার উৎপত্তিস্থল। যে যে দেশে যে ভাষা সকলের বিশেষ প্রিয়, তাহা সেই সেই দেশবাসী লোকের কথা হইতে সংগ্রহ করিয়া গাতে সংযোজন করিবে।

কোহলীয়ে—সম, অর্দ্ধসম ও বিষম—এই ভাবে গীত ত্রিবিধ। সমান মাত্রাযুক্ত চারি চরণে গীতের 'সম'-সংজ্ঞা হয়। যে গীতের প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ সমান তাহাকে 'অর্দ্ধসম' কহে। যাহার চারি চরণই মাত্রাসংখ্যায় পৃথক্ পৃথক্ হয়, ভরতাদি মুনিগণ তাহাকে 'বিষম' কহিয়া থাকেন।

গীতের গুণঃ—গ্রহ, লয়, যতি, বিচিত্রমান, ধাতুর পুনরুক্তি, নবনবতা, মাতুর অনেকার্থতা, রাগের সুরম্যতা, গমক, অর্থের বিশুদ্ধতা, তেন্না, পাঠ ও স্বরের বিবিধভাবে সংযোজন। গুণ-অলঙ্কার-রসযুক্ত বাক্যের সমাবেশ-বিধান ইহাই পূর্ব্বোক্ত সক গুণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। তাল গানের গতির সমতা বিধানকারক। তাহার তিনটী 'গ্রহ'। তাহারা সকল গীত-শাস্ত্রে অনাগত-অতীত-সমনামে অভিহিত। যখন গীতারম্ভের

পূর্ব্বে দুইটী অক্ষর উচ্চারণ করিয়া তালের স্থাপন হয়, তখনই 'অনাগত-গ্রহ' কথিত হয়। এ স্থলে গীতের আদিতে যে অক্ষর অধিক উচ্চারিত হয়, তাহা 'অনাগত'। অর্থাৎ তাহা তাল মধ্যে কখনও গৃহীত হয় না। যখন গীতের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তালের সঙ্গতি হয় তখন সমকালে উদয়হেতু 'সমগ্রহ' কথিত হয়। তা্লের যে অংশ পরে পড়িবে, যদি তাহা পূর্ব্বে স্থাপন করিয়া তাল গৃহীত হয়, তখন 'তালগ্রহ' হয়। বাচস্পতি বলেন—গীত ও বাদ্যের পদস্থাপন-কার্য্যের, তদ্রূপ ক্রিয়া ও তালের পরস্পর সমতা—লয়,—পণ্ডিতগণ এইরূপ বলেন। হরিনায়ক বলেন—গানক্রিয়ার মধ্যে বিশ্রামকে 'লয়' বলেন। দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত-ভেদে উহা তিনপ্রকার বলিয়া প্রাজ্ঞগণ বলেন। দ্রুতলয়ের একমাত্রা, দ্বিগুণ বিশ্রামে মধ্য-লয়, দ্রুতের দ্বিগুণে বিলম্বিত-লয়। এই সকল লয় সকল তালেই—অবস্থিত। লয়প্রবর্ত্তনের নিয়মই 'যতি'। স্রোতোবহা, সমা ও গোপুচ্ছিকা—এই তিন প্রকার যতি হয়।

সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশ্রান্তিকারিণী তালক্রিয়াকে 'মান' কহে। তালের বিশ্রামকারক বলিয়া মান তালের সমাপ্তিজ্ঞাপক। যখন মান ধ্রুবপদে দ্বিতীয় কলায় পড়ে তখন সেই তালের তালজ্ঞসম্মত 'বর্দ্ধমান আবর্ত্ত' সংজ্ঞা হয়। যখন মান ধ্রুবপদে শেষ কলায় পড়ে তখন মনীষিগণ উহাকে 'হীয়মান আবর্ত্ত' বলিয়া থাকেন। কর্ণপ্রিয়, যতিস্থ, ভঙ্গযুক্ত, সুখাবহ, মন্দ্রমধ্য, অতারাঢ্য—এই সকল রাগরম্যতার গুণ॥

শ্রোতৃবর্গের চিত্তের আনন্দপ্রদ স্বরের কম্পন—'গমক'।

তাহার পঞ্চদশ প্রকার ভেদ কথিত হইতেছে। যথা—তিরিপ, স্ফুরিত, কম্পিত, নীল, আন্দোলিত, বলি, ত্রিভিন্ন, কুবল, আহত, উন্নামিত, প্লাবিত, হুঙ্কৃত, মুদ্রিত, নামিত ও মিশ্রিত। গমকসকলের লক্ষণ কথিত হইতেছে—ডমরুধ্বনির লঘুতম কম্পনের অনুকরণে সুন্দর এবং দ্রুতমাত্রার চতুর্থাংশবেগে তিরিপ-গমক' হয়। দ্রুতমাত্রার তৃতীয়াংশে বেগ হইলে 'স্ফুরিত-'গমক' হয়। দ্রুতমাত্রার অর্দ্ধপরিমাণে গান হইলে উহাকে 'কম্পিত-গমক' বলে। দ্রুতমাত্রায় বেগ হইলে 'নীল-গমক', লঘুমাত্রার বেগে 'আন্দোলিত-গমক' হয়। রাগবশে নানাপ্রকার বক্রতাযুক্ত হইলে 'বলি-গমক' হয়। তিনটী ভিন্নস্থানে অবিশ্রান্ত ঘনভাবে স্বর হইলে 'ত্রিভিন্ন-গমক' হয়। বলি-গমক কোমল-কণ্ঠে গ্রন্থিযুক্ত হইলে 'কুবল-গমক' হয়। পূর্ব্ব স্বরকে আঘাত করিয়া নিবৃত্ত হইলে 'আহত-গমক' হয়। যে গমক উত্তরোত্তর স্বরসকলে ক্রমে সঞ্চারণ করে তাহার নাম 'উন্নামিত-গমক'। উচ্চগানে কম্পনকে 'প্লাবিত-গমক' কহে। মনোজ্ঞ হুঙ্কার-গর্ভ গমকের নাম 'হুঙ্কৃত'। মুখ বন্ধ করিয়া যাহার উদ্ভব তাহা 'মুদ্রিত-গমক'। স্বরের নীচুভাবে 'নামিত-গমক' কথিত হয়। ইহাদের মিশ্রণে 'মিশ্র-গমক' হয়। মিশ্র-গমকের অনেক ভেদ আছে। উক্ত গমকের অভ্যাস প্রকার এইরূপ—মাঘ ও পৌষ মাসের রাত্রিতে শেষ প্রহর মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে সাধক জলমধ্যে থাকিয়া এই সকল গমকের সাধন করিবে।

বাক্যের উচ্চারণে সুখতা-অদোষ-রসযুক্ত সম্যক্ অর্থ-বোধ হইলে তাহাকে 'অর্থনৈর্ম্মল্য' কহে। তাহাতে তেন

পাঠ-স্বরের বিচিত্রভাবে সন্নিবেশ কর্ত্তব্য। পাঠ ও স্বরের পরে তেনের প্রয়োগ বিহিত, কখনও পূর্ব্বে নহে। তালহীনে কায়রোগ এবং ধাতুহীনে ধনক্ষয় হয়। যে গানে ধাতু-মাতু-পদ নাই সেই গীতকে রিপু কহে'। কথার স্খলন, 'তালরহিত ভাবে রচনা, ধাতুমাতু প্রভৃতির অভাব, কটূক্তি, রসাদিহানি শ্রুতিকর্কশতা প্রভৃতি গীতের দোষ। যদিও গীতে উক্ত বহু দোষ আছে, তথাপি তাহাদের বিশেষ উল্লেখ হইল না। গানে যদি তাহারা প্রকাশ পায় সেই স্থলে তাহা লক্ষ্য করিবে। 'গায়ক' উত্তম, মধ্যম ও অধম—এই তিনপ্রকার। যে গায়ক মার্জ্জিতস্বর, সুগঠিতদেহ, বিবিধ রাগিণীর ভেদজ্ঞাতা, গ্রহ-মান-লয়ে অধিকার সম্পন্ন, তালজ্ঞ, ক্লান্তিরহিত, ত্রিভিন্নাদি গমকে সহজ ও সাবলীল গতিবিশিষ্ট, প্রবন্ধগানে নিপুণ, গান ক্রিয়াতে সাবধান, আয়ত্তকণ্ঠ, স্থায়িজ্ঞ, দোষরহিত ও মেধাবী—সে 'উত্তম'। তন্মধ্যে কতিপয় গুণান্বিত গায়ক 'মধ্যম', গুণযুক্ত হইলেও বহুদোষসম্পন্ন গায়ক—'অধম'। গীতজ্ঞগণ পাঁচ প্রকার গায়নের কথা বলিয়া থাকেন—শিক্ষাকার, অনুকার, রসিক, রঞ্জক ও ভাবক। সমগ্র শিক্ষাদানে দক্ষ গায়ক সর্ব্বসম্মত—'শিক্ষাকার'; পরের ভঙ্গির অনুকারী—'অনুকার'; রসাবিষ্ট গায়ক—'রসজ্ঞ'; শ্রোতৃগণের আনন্দবিধানকারী—'রঞ্জক'; গীতের অধিক আধানহেতু—'ভাবক'। অন্য প্রকারে গায়ক আবার তিন প্রকার—একল, যমল (যুগ্ম), বৃন্দ। যে একাকীই গান করে, সে 'একল' গায়ক; অপর একজনের সহিত গানকারী—'যমল'; বহুর সহিত গানকারী—'বৃন্দ' গায়ক।

গায়ক এইরূপ দোষযুক্ত হয়—ভীত, কথার অস্পষ্টতা, মস্তক-সঞ্চালন, ফুৎকারযুক্ত, স্বরের বিকৃতি, দন্ত দৃষ্ট হওয়া, চক্ষু মুদ্রিত করা, সমারব্ধগ্রামে স্থির থাকিতে না পারা, গলা বাঁকাইয়া গান, স্বরের হ্রস্বতা (দমের অল্পতা), এক রাগিণীর সহিত অন্য রাগিণীর মিশ্রণ, অঙ্গসঞ্চালন, অন্যমনস্কতা, বৈরস্যোৎপাদন, কর্কশস্বর, দ্রুততা। আরও—বেতালা, গানের মাত্রার দীর্ঘতাকরী, ভীষণাকার; ছাগবৎ কণ্ঠধ্বনিবিশিষ্ট, চঞ্চল, গণ্ড স্ফীত করিয়া গানকারী, নাকি-স্বরে গায়ক,—গায়ক এইরূপ দোষযুক্ত হয়। আরও বহুপ্রকার দোষ আছে, তাহা বাহুল্য ভয়ে কথিত হইল না।

বাদ্যঃ—যে হেতু গীত এবং তাল বাদ্য ব্যতীত শোভা পায় না, অতএব এস্থলে মঙ্গলবিধায়ক বাদ্যের বিষয় কথিত হইতেছে। তত, আনদ্ধ, শুষির ও ঘন—এই চারিপ্রকার বাদ্য। বীণাপ্রভৃতি তারের যন্ত্রকে 'তত', মুরজপ্রভৃতি চর্ম্মের আবরণযুক্ত যন্ত্রকে 'আনদ্ধ', মুখবায়ুর দ্বারা বাদিত বংশী প্রভৃতিকে 'শুষির' এবং কাংস্য-করতাল প্রভৃতিকে 'ঘন' কহে। সঙ্গীতদামোদরে—অলাবনী, ব্রহ্মবীণা, কিন্নরী, লঘুকিন্নরী, বিপঞ্চী, বল্লকী, জ্যেষ্ঠা, চিত্রা, ঘোষবতী, জয়া, হস্তিকা, কুব্জিকা, কূর্ম্মী, শারঙ্গী, পরিবাদিনী, ত্রিশরী, শতচন্দ্রী; নকুলৌষ্ঠী, কংসরী, ঔড়ম্বরী, পিনাকী, নিবন্ধ, পুষ্কল, গদাবারণহস্ত, রুদ্রবীণা, শরমণ্ডল, কপিলাস, মধুস্যন্দী, ঘোণা প্রভৃতি তত বা তন্ত্রীযন্ত্রের বিধি প্রকার ভেদ। আর এক প্রকার—কচ্ছপী বীণা, উহাই রূপবতী বীণা। মর্দ্দল, মুরজ,

ঢক্কা, পটহ, চাঙ্গু, পণব, কুণ্ডলী, ভেরী, ঘন্টাবাদ্য, ঝর্ঝর, ডমরু, টমকি, মন্থ, হুড়ুকা, মড্ডু, ডিণ্ডিম, উপাঙ্গ, দর্দ্দুর ইত্যাদি আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র আনদ্ধ মধ্যে মর্দ্দল শ্রেষ্ঠ।

সঙ্গীত দামোদরে—মৃদঙ্গ—মৃত্তিকানির্ম্মিত। তদ্রূপ মর্দ্দল সকল উত্তম বাদ্যের মধ্যে উত্তম। ইহার সঙ্গলাভে অপর সকল বাদ্য শোভন হয়। সঙ্গীতপারিজাতে—মৃদঙ্গের মধ্যাংশে ব্রহ্মা সর্ব্বদা অবস্থান করেন। যেমন দেবগণ ব্রহ্মালোকে বাস করেন তদ্রূপ এইস্থলেও দেবগণ আছেন। যেহেতু মৃদঙ্গ সর্ব্বদেবময়, অতএব ইহা সর্ব্বমঙ্গল। উমাপতি রচিত সেই সকল পাঠবর্ণ বিংশতিসংখ্যক। মৃদঙ্গবাদক ধীর, বাদননিপুণ, বাক্‌পটু, বাদ্যাক্ষর বা বোলপ্রকাশক, নানাভাবে বাদ্যের পরিবর্ত্তন, ভঙ্গির সহিত নৃত্যে কুশল, গানের গতির সহিত সঙ্গীতে উত্তম অভ্যস্ত, সন্তুষ্টচিত্ত, অনায়াসে বাদনকারী, লঘুহস্ত—এই সকল লক্ষণবিশিষ্ট বলিয়া কথিত। বংশ, পারী, মধুরী, তিত্তিরী, শঙ্খ, কাহল, তোড়হী, মুরলী, বুক্কা, শৃঙ্গিকা, স্বরনাভি, শৃঙ্গ, লাপিকবংশ এবং চর্ম্মবংশ—শুষির বাদ্যে এই সকল ভেদ পূর্ব্বসূরিগণ বলিয়াছেন। বংশী সুন্দর, সরল ও গ্রন্থিদোষ-রহিত। ইহা বেণুনির্ম্মিত, খদিরকাষ্ঠনির্ম্মিত, রক্তচন্দন নির্ম্মিত, শ্বেতচন্দননির্ম্মিত, সুবর্ণনির্ম্মিত বা হস্তিদন্তনির্ম্মিত হইবে। ইহার গর্ভচ্ছিদ্র কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমিত হইবে। বংশী ন্যূনপক্ষে পঞ্চাঙ্গুল দীর্ঘ হইতে পারে। এক এক অঙ্গুলি বৃদ্ধি-ক্রমে আঠার অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া ইহার ষড়ঙ্গুল প্রভৃতি নাম হয়। মহানন্দ, নন্দ, বিজয় ও জয়—মতঙ্গমুনির মতে এই

চারি প্রকার বংশী উত্তম। তন্মধ্যে দশাঙ্গুল পরিমিত বংশীর নাম মহানন্দ, একাদশাঙ্গুলপরিমিতের নাম নন্দ, দ্বাদশাঙ্গুল-দীর্ঘের নাম বিজয়। চতুর্দ্দশাঙ্গুলদীর্ঘ বংশীকে জয় বলা হয়। করতাল, কাংস্যবল, জয়ঘণ্টা, শুক্তিকা, কম্পিকা, ঘটবাদ্য, ঘণ্টাতোদ্য, ঘর্ঘর, ঝঞ্ঝাতাল, মঞ্জীর, কর্ত্তরী, উস্কুর—এই দ্বাদশটী ঘনবাদ্যের ভিন্ন প্রকার—ভরতমুনি বলিয়াছেন। বীণা প্রভৃতি তত যন্ত্র দেবগণের, বংশী প্রভৃতি শুষির যন্ত্র গন্ধর্ব্বগণের, ঢাক প্রভৃতি আনদ্ধ যন্ত্র রাক্ষসগণের এবং করতাল প্রভৃতি ঘন-যন্ত্র মানব বা কিন্নরগণের বাদ্য বলিয়া কথিত। সঙ্গীতপারিজাতে—ডমরু দ্বিমুষ্টি পরিমাণ, দুই মুখ যুক্ত এবং মধ্যস্থলে সূক্ষ্ম। ইহার মুখ মুষ্টিপরিমাণ সূক্ষ্ম চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত। সেই মুখে সংলগ্ন সূত্রের দুইটী গ্রন্থির দ্বারা ইহা বাজান হয়। এই বাদ্য মহাদেবের হস্তে নিত্য শোভিত।

নর্ত্তন ঃ—নর্ত্তন তিন প্রকার—নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত। নানা অবস্থাভেদযুক্ত লোকের যে স্বভাব তাহা আঙ্গিক অভিনয়-যুক্ত হইলে অর্থাৎ তাহার আঙ্গিক অনুকরণ হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে নাট্য বলিয়া থাকেন। বাক্যার্থ ও পদার্থের অনুকরণ-রূপ দ্বিবিধ অভিনয় নাটকে আছে। রসাশ্রয় বাক্যার্থ-অভিনয় ও ভাবাশ্রয় পদার্থাভিনয়—এই উভয়ই পূর্ব্বে ভরতমুনি নাটকাদিতে প্রয়োগ করিয়াছেন। দেশপ্রচলিত রীত্যনুসারে প্রসিদ্ধ তাল-মান-লয়ের অনুসারী যে সবিলাস অঙ্গবিক্ষেপ, পণ্ডিতগণ তাহাকে নৃত্য বলেন। প্রিয়তমের দর্শন প্রভৃতি কার্য্যে নায়িকার শৃঙ্গার-চেষ্টাযুক্ত যে বৈশিষ্ট্য তাহাই বিলাস।

অঙ্গাভিনয়ে কথিত প্রকারানুসারে সর্ব্বপ্রকার অভিনয়রহিত কেবল গাত্রবিক্ষেপকে নৃত্যবিদ্‌গণ 'নৃত্ত' বলিয়া থাকেন। নাট্য—সাত্বিকবহুল রসাশ্রয়, বাক্যার্থাভিনয়াত্মক। নৃত্য—আঙ্গিকবহুল, ভাবাশ্রয়, পদার্থাভিনয়াত্মক। নৃত্ত—কেবল তাল-লয়ের অপেক্ষাযুক্ত, অভিনয়শূন্য অঙ্গবিক্ষেপ। এই তিনটী 'মার্গ' ও 'দেশী' ভেদে দুই প্রকার। যেহেতু ব্রহ্মা-প্রভৃতি এই নৃত্য, গীত, বাদ্য শম্ভুর নিকট প্রার্থনা করিয়া লাভ করিয়াছিলেন, পরে তাহা হইতে শিক্ষা করিয়া ভরতমুনি প্রভৃতি জগতে উহাদের প্রয়োগ করিয়াছিলেন সেইহেতু তাহা 'মার্গ' বলিয়া কথিত। যে গান, বাদ্য ও নৃত্য নানাদেশে তথাকার নৃপতিপ্রভৃতির অতিশয় আনন্দজনক হয় তাহাকে বিজ্ঞগণ 'দেশী' বলিয়া থাকেন। নৃত্য ও নৃত্ত তাণ্ডব ও লাস্য ভেদে দুই প্রকার কথিত হয়। মহাদেবের দ্বারপাল তণ্ডু-কথিত উদ্ধতপ্রায় প্রয়োগকে 'তাণ্ডব' বলে। পুরুষের নৃত্যকে তাণ্ডব এবং স্ত্রীলোকের নৃত্যকে লাস্য বলে। প্রেরণী ও বহুরূপ—ভেদে তাণ্ডব দুই প্রকার। যে তাণ্ডবনৃত্যে অঙ্গ-বিক্ষেপের আধিক্য, তদ্রূপ অভিনয়হীনতাযুক্ত তাণ্ডবের নাম প্রেরণী। তাহার লৌকিক সংজ্ঞা দেশী। যে তাণ্ডবনৃত্যে ছেদন, ভেদন, নানাপ্রকার মুখভঙ্গি, বাণীগত উদ্ধত, তাহা বহুরূপ-তাণ্ডব। লাস্যনৃত্য সুকোমলাঙ্গ ও কামবর্দ্ধক। তাহাও 'স্ফুরিত' ও 'যৌবত' এই দুই প্রকার বলিয়া কথিত। যে শৃঙ্গাররসপ্রধান অভিনয়ে নায়ক-নায়িকা ভাবভরে রসভরে আলিঙ্গনচুম্বনসহিত নৃত্য করে তাহা স্ফুরিত নামক

লাস্য-নৃত্য। যেথায় নটীগণ মধুরভাবে রচিত নানালীলা-ভঙ্গিতে নৃত্য করে সেই বশীকরণবিদ্যাসমুজ্জল নৃত্যকে যৌবত লাস্য কহে।

নৃত্তেরও তিনটী প্রকার কথিত আছে—বিষম, বিকট ও লঘু। রজ্জুভ্রমণাদিসহিত যে নৃত্ত তাহাকে 'বিষম' কহে। নানাপ্রকার বেশ ও অঙ্গ-ব্যাপারসহিত নৃত্তকে 'বিকট' কহে। অঞ্চিতপ্রভৃতি অল্প করণযুক্ত নৃত্তকে 'লঘু' কহে। অঙ্গাভিনয়-মধ্যে অঙ্গ, উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ সকলের শার্ঙ্গদেবাদিসম্মত নিরূপণ যথাস্থানে প্রদর্শিত হইতেছে। শিরঃ, অংস, বক্ষঃ, পার্শ্ব, হস্ত, কটি, পদ—এই সাতটী অঙ্গ। গ্রীবা, বাহ্বংস, মণি-বন্ধ, পৃষ্ঠ, উদর, উরু, জঙ্ঘা, জানু ও ভূষণ—এই নয়টী প্রত্যঙ্গ। মূর্দ্ধা, চক্ষু, তারা, ভ্রূকুটী, মুখ, নাসিকা, নিশ্বাস, চিবুক, জিহ্বা, গণ্ড, দন্ত, অধর ও মুখরাগ—এই দ্বাদশটী উপাঙ্গ। তন্মধ্যে অঙ্গের প্রাধান্যহেতু তাহাই সংক্ষেপে কথিত হইতেছে—ধূত, বিধূত, আধূত, অবধূত, কম্পিত, আকম্পিত (ঈষৎ কম্পিত), উদ্বাহিত, পরিবাহিত, অঞ্চিত, নিকুঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোমুখ ও লোলিত—এই চতুর্দ্দশ প্রকার শিরঃ অঙ্গের অভিনয়। ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে, বক্রভাবে যে কম্পন তাহাকে 'ধূত-শিরঃ' কহে। ইহা নিষেধে, অনীপ্সিত বিষয়ে, বিষাদে ও বিস্ময়ে সংঘটিত হয়। একোচ্চ, লগ্নকর্ণ, উচ্ছ্রিত, স্রস্ত, লোলিত—এই পঞ্চ প্রকার স্কন্ধ-অভিনয় কথিত হয়। নামমাত্রে উহাদের লক্ষণ পরিস্ফুট। নৃত্যবিদ্‌গণ মুষ্টিপ্রহার ও কুন্তপ্রহারে স্কন্ধাভিনয়ের নাম 'একোচ্চ', অলিঙ্গনে ও শীতে

'কর্ণলগ্ন', হর্ষগর্ব্বাদিতে 'উচ্ছ্রিত', দুঃখে, পরিশ্রমে ও মত্ততায় 'স্রস্ত', মূর্চ্ছা, লম্পটের নর্ত্তন, হাস্য ও হুড্ডুকাবাদ্য-বাজনায় 'লোলিত' কহিয়াছেন। এই প্রকারে স্কন্ধাভিনয় পাঁচ প্রকার।

বক্ষোঽভিনয় পঞ্চ প্রকার, যথা—সম, আভুগ্ন, নির্ভুগ্ন, প্রকম্পিত ও উদ্বাহিত। সৌষ্ঠবযুক্ত, চতুষ্কোণাঙ্গসংশ্রিত, প্রকৃতিস্থ বক্ষোঽভিনয়কে 'সম' কহে ; স্বাভাবিক ভাবের অভিনয়ে 'সম' দৃষ্ট হয়। বিবর্ত্তিত অপসৃত, প্রসারিত, নত ও উন্নত—এই পাঁচ প্রকার পার্শ্বাঙ্গাভিনয়। পার্শ্বপরিবর্ত্তনে ত্রিকের (মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের) বিবর্ত্তন-হেতু বিবর্ত্তিত-সংজ্ঞা হয়। নৃত্যভেদে ও সাধারণতঃ হস্তাভিনয় তিন প্রকার ; যথা—অসংযুত, সংযুত ও নৃত্যহস্ত। যে-সকল হস্তাভিনয়ে এক হস্তে কার্য্য হয় তাহাদিগকে অসংযুত এবং যাহাদের অভিনয়ে হস্ত-দ্বয় দ্বারা কর্ম্ম কৃত হয় তাহাদিগকে সংযুত বলে। যাহারা কেবল নৃত্যকালে অবস্থান করে, কিন্তু কোন বস্তু নির্দ্দেশ করে না, অঙ্গভঙ্গীর সহিত যুক্ত সেই অভিনয়সকলকে নৃত্যহস্তা বলে। ভরত ত্রিবিধ হস্তসঞ্চার বর্ণন করিয়াছেন—উত্তান, পার্শ্বগ এবং অধোমুখ। পতাক, ত্রিপতাক, অর্দ্ধচন্দ্র, কর্ত্তরী-মুখ, অরালমুষ্টি, শিখর. কপিথ, খটকামুখ, শুকতুণ্ড, কাঙ্গুল, পদ্মকোষ, পল্লব, সূচিমুখ, সর্পশিরা, চতুর, মৃগশীর্ষক, হংসাস্য, হংসপক্ষ, ভ্রমর, মুকুল, ঊর্ণনাভ, সংদংশ, তাম্রচূড় ও কবি—এই চব্বিশ প্রকারের অসংযুতহস্তা কথিত হইয়াছে। অন্যে অসংযুতসমূহের মধ্যে উপধান, সিংহমুখ, কদম্ব, নিকুঞ্জক—

এই চারিটী অধিক বলেন। দামোদর ইহার ত্রিশ সংখ্যা বলিয়াছেন। অর্থবশতঃ এই অসংযুতই সংযুত হয়।

যেই অসংযুতের অভিনয়ে অঙ্গুষ্ঠ বক্র এবং তর্জ্জনী মূলাশ্রিত থাকে, অঙ্গুলিসকল সরল ও সংযুক্ত থাকে তাহাকে পতাক বলে। এই পতাকাভিনয় স্পর্শস্থানে ও পেটস্থানে হয়। ইহার অঙ্গুলিসমূহ পতাকাতালিকাদিতে ও জ্বালাতে অর্দ্ধগমনপূর্ব্বক স্বল্প চঞ্চল হয়। পক্ষিপক্ষে পতাকার কটিস্থান ধারাতে অধোগমন করে। উৎক্ষেপাভিনয়ে হস্ত উচ্ছ্রিত-স্থানে ঊর্দ্ধে গমন করে, কিন্তু পুষ্করস্থানে অধোগমন করে এবং কটিস্থানে ঊর্দ্ধগমন করে। কম্পন আভিমুখ্যস্থানে, নিজ-পার্শ্বদিকে, মুখস্থানে আগমন করে এবং পার্শ্ব ও নিষেধস্থানে কম্পন হয়। কিন্তু পার্শ্ব ও বিভজন-স্থানে পৃথক্ কম্পন হয়। ঘর্ষনোন্মর্দ্দনস্থানে ও মার্জ্জনস্থানে ধীরে ধীরে পতাক কর্ত্তব্য। শিলাদিস্থূলবস্তুসমূহের ধারণ ও উৎপাটনাদিস্থানে হস্ত ও কম্প্র পরস্পর সম্মুখীন করিয়া উচ্ছ্রিত ও বিচ্যুত করা কর্ত্তব্য। উচ্ছ্রিততলাঙ্গুলি বায়ু-বেগ ও তরঙ্গবেগে অধোগমন করে এবং ক্ষুদ্রপুষ্করিণীনির্দ্দেশে স্বস্তিক হইয়া বিচ্যুত হয়। গতিস্থানে স্বস্তিকাকারকে বিশ্লেষ করিয়া পতাক করা কর্ত্তব্য। ছেদনস্থানে গোপন-আদর্শ-বাচন ও প্রোঞ্ছনস্থানে অধোমুখ ও উত্তালতলযুক্ত হস্তদ্বয়কে কিঞ্চিৎ প্রসারিত করিয়া বেলা, বিল, গ্রাহ, গৃহ ও গুহা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। যদিও সম্পূর্ণরূপে হস্তপ্রয়োগসকল কথিত হইল, তথাপি লোকপ্রয়োগানুসারে হস্তপ্রয়োগ অভিনয়

করা কর্ত্তব্য। কেন না, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—লোকপ্রয়োগানুসারে ও নাট্যাঙ্গ আশ্রয় করিয়া সেই সেই চেষ্টানুসারে হস্ত প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ঘর্ষণ, ছেদন আদশ-বিভাগাদিস্থানে স্পষ্টরূপে হস্ত-প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইতি পতাকাভিনয় সমাপ্ত।

সংযুক্ত - অঞ্জলি, কপোত, কর্ক ট, স্বস্তিক, দোল, পুষ্পপুটোৎসঙ্গ, খটক, বর্দ্ধমানক, গজদন্ত, অবহিত্থ, নিষধ, মকর ও বর্দ্ধমান—এই তেরটী সংযুত হস্ত। যদি পতাক হস্তদ্বয়তলসংশ্লিষ্ট হয় তাহা হইলে তাহাকে অঞ্জলি কহে। দেবতানমস্কারে এই অঞ্জলি শিরঃস্থ বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু গুরুনমস্কারে মুখস্থানগত হয় এবং বিপ্রনমস্কারে হৃদয়স্থ হয়। ইহা সাধুগণ ইচ্ছা করেন। আর অন্যান্য কপোতাদি-বিষয়ে কোন নিয়ম নাই। ইচ্ছামত যে কোন তিনটীর দ্বারা নমস্কারাদি করা যাইতে পারে। চতুরস্র উদ্বৃত্তাদি ত্রিংশৎপ্রকার নৃত্যহস্ত। কম্পিত, উদ্বাহিত, ছিন্ন, বিবৃত ও রেচিত এই পাঁচপ্রকার কটি-অভিনয় বলিয়া কথিত হয়। নৃত্যবিদগণ সম, অঞ্চিত, কুঞ্চিত, সূচ্যগ্র-তলসঞ্চর, মর্দ্দিত, উদঘাটিত, অগ্রগ, পার্শ্বগ, পার্ষ্ণিগ, তাড়িত, উদঘট্টিত, উচ্ছেধ ও উদ্বাটিত এই তের প্রকার পদনৃত্য। স্বাভাবিকভাবে স্থিত পদদ্বয়কে সম বলে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সঙ্গীত-স্ফোটের মহাশ্চর্য্য ও বিপুল ব্যাপার প্রকটিত করিয়াছেন। পৃথিবীতে যত সঙ্গীত-সাহিত্য প্রচারিত হইয়াছে, সকলই উক্ত গৌড়ীয়-সঙ্গীত-সাহিত্যের

বিকৃত আভাস মাত্র; এমন কি, বৈকুণ্ঠের সঙ্গীত-সাহিত্যও গৌড়ীয়-সঙ্গীত-সাহিত্যের অসম্পূর্ণ প্রকাশমাত্র। কারণ, সঙ্গীত-সাহিত্যের যেখানে চরমসীমা, সেই রাসক্রীড়ার নায়ক গৌড়ীয়-সঙ্গীত-সাহিত্যের দেবতা। একমাত্র সর্ব্বানর্থ-নির্ম্মুক্ত অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-রস-রসিকগণই একথা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। রাসতাণ্ডবী কৃষ্ণের গৌরাবতারে যে সঙ্কীর্ত্তন-রস প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সঙ্গীত-সাহিত্য-বিশ্বে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। এমন নৃত্য-কলা, এমন বাদিত্র-কলা, এমন গীত-কলা আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই—যাহা শ্রীগৌরসুন্দর নিজ-গণ-সঙ্গে জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। সঙ্কীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীবাসঅঙ্গনে, নগরসঙ্কীর্ত্তনে এবং নীলাচলে রথাগ্রে নৃত্যকালে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ আর কোথাও নাই। 'সঙ্গীত-পারিজাত', 'সঙ্গীত-শিরোমণি' প্রভৃতি শাস্ত্র সঙ্গীত-লক্ষণ-বর্ণনে গীত, বাদ্য ও নৃত্য—এই ত্রিবিধ প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছে। এই তৌর্য্যত্রিক নীতি-শাস্ত্রে ব্যসনরূপে পরিগণিত। নৃত্য-নায়ক সেই তৌর্য্যত্রিককেই ভগবৎসেবার পরম অনুকূল করিয়া জগতে প্রদর্শন করিয়াছেন। সঙ্গীত-সাহিত্য পরিপূর্ণরূপে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্ত হইয়াছে —একমাত্র গৌড়ীয়গণের সেবা-নৈপুণ্যে। মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ গন্ধর্ব্বকণ্ঠ-ধিক্কারী শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামী প্রভু সেই অপ্রাকৃত সর্ব্বশ্রেষ্ঠতম সঙ্গীত-স্ফোটকে বিস্ফারিত করিবার মুল মহাজন। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে 'দামোদর' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভু সঙ্গীত-

দামোদর' নামে একখানি সঙ্গীত-সাহিত্য-শাস্ত্র রচনা করিয়া সেই স্ফোট—সঙ্গীত-স্ফোটরূপে জগতের মহাদানরূপে বিতরণ করিয়াছেন। তাহার পর শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল নরোত্তর ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুগণের অভ্যুদয়-কালে রাণীহাটী, মনোহরসাহী ও গরাণহাটী প্রভৃতি গৌড়ীয়-সাহিত্যে সঙ্গীত-স্ফোটের অদ্ভুত প্রকাশ হইয়াছিল। মধুর মৃদঙ্গ-বাদ্যও সঙ্গীত-স্ফোটের এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য প্রকাশ। তদ্দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় পার্ষদ ও অনুগত মহাজনগণ কৃষ্ণভক্তিরস অতি অদ্ভুত ও বিস্তৃত কৌশলে এবং বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে শ্রীগুরুপাদপদ্মানুগত্যের অভাবে সঙ্গীত-সাহিত্য-নায়কের ইন্দ্রিয়তর্পণের পরিবর্ত্তে যখন আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-বৃত্তি জাগিয়া উঠিয়া তাল-লয়-মান-সুরের বাহ্য.মোহ সেবা-চৈতন্যকে আবৃত করিয়া পণ্যদ্রব্য বা বিলাসীর ভোগোপকরণে পর্য্যবসিত হইল।

স্ফোটের পরিপূর্ণতম প্রকাশ পরাকাষ্ঠা শিরোমণি প্রদাতা মূল মহাজন রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় পার্ষদ সঙ্গীগণ। তদীয় অনুগমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু, শ্রীল গোপালভট্টগোস্বামী প্রভু, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, শ্রীল কবিকর্ণপুর, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু: শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীল

নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ইত্যাদি অসংখ্য গৌরপার্ষদগণ। পরবর্ত্তী কালে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোর বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভৃতি। গ্রন্থের বিস্তারও বাহুল্য ভয়ে এবং নিজ অযোগ্যতা নিবন্ধন সকলের নাম উল্লেখ সম্ভবপর না হওয়ায় প্রধান প্রধান মহাজনগণের মধ্যে কতিপয় নাম উল্লেখ মাত্র করিয়া সকলের শ্রীচরণে অহৈতুকী কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। ইতি স্ফোটবাদ বিচার সমাপ্ত।

গ্রন্থকারের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। ভজন সন্দর্ভ :—আনুকূল্য প্রথমবেদ্য ৫.৭৫, দ্বিতীয়-বেদ্য ৫.৭৫, তৃতীয় বেদ্য ৬.০০, চতুর্থ বেদ্য ৬.০০। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বেদ্য (যন্ত্রস্থ)। ২। শিক্ষামৃত নির্যাস—২.৫০। ৩। তীর্থ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন পদ্ধতি—.৫০। মায়াবাদ শোধন—১.৫০। ৫। অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ—২.৫০। ৬। শ্রীগৌরহরির অত্যদ্ভুত চমৎকারী ভৌমলীলামৃত—৪.০০। ৭। শিবতত্ত্ব—.৮০। ৮। শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন—.৭৫। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

(১) শ্রীল অদ্বৈতাচার্যের চরিত সুধা, (২) গীতার তাৎপর্য্য ও (৩) গৌরশাক্ত শ্রীগদাধর। যন্ত্রস্থ।